ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও মানবকল্যাণচেতনা

(Title: Shrichaitanyadeva's Philosophy of Life and Human-welfare Thought)

তত্ত্বাবধায়ক
ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক
অধ্যাপক (অব.)
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
বুলবুল দাস
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা
নভেম্বর ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বুলবুল দাস আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এম.ফিল অভিসন্দর্ভের গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছে। তার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম **'শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও মানবকল্যাণচেতনা' (Shrichaitanyadeva's Philosophy of Life and Human-welfare Thought).** আমার জানামতে ইতঃপূর্বে এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ প্রকাশিত হয়নি। আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। এটি তার নিজস্ব, মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমি অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি এবং গবেষকের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক
অধ্যাপক (অব.)
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

এই মর্মে আমি ঘোষণা করছি যে, অধ্যাপক (অব.) ড. দুলাল কান্তি ভৌমিকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমি আমার এম.ফিল অভিসন্দর্ভের গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছি। আমার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম **'শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও মানবকল্যাণচেতনা' (Shrichaitanyadeva's Philosophy of Life and Human-welfare Thought).** অত্র অভিসন্দর্ভে যে সকল গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি তা অধ্যায় শেষে তথ্যনির্দেশিকায় উল্লেখ করেছি। অভিসন্দর্ভের শেষে একটি গ্রন্থপঞ্জিও দেয়া হয়েছে। আমার জানামতে এই শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। এটি আমার নিজস্ব, মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমি অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

এম. ফিল গবেষক
বুলবুল দাস
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলোর প্রকাশ হলে যেমন অন্ধকার দূর হয় তেমনি জ্ঞানের চর্চা ও সাধনার মাধ্যমে অজ্ঞানতাও দূর হয়। এ কারণে অনন্তকাল ধরে চলছে জ্ঞানের সাধনা। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।' অর্থাৎ, এ জগতে জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছুই নেই। তাই জ্ঞানের এই গভীরতা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে মহান মুনি-ঋষিরা প্রচীনকাল থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করে চলছেন। জ্ঞান আহরণের এই সারস্বত সাধনায় যে যত গভীর মনোনিবিষ্ট, তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারও তত বেশি সমৃদ্ধ। জ্ঞান আহরণের এই তৃষ্ণা থেকে গবেষণাকর্মে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছি।

গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে প্রথমে আমি অবনত চিত্তে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার আচার্য অধ্যাপক (অব.) ড. দুলাল কান্তি ভৌমিকের প্রতি। আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অনেক ঊর্ধ্বে তাঁর স্থান। আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে, ধৈর্য ও কর্তব্যনিষ্ঠায় আমি আমার এম. ফিল অভিসন্দর্ভ সম্পাদন করতে পেরেছি। তিনি সারস্বত সাধনায় মগ্ন থাকার কারণে ও শত ব্যস্ততার মধ্যেও গভীর ধৈর্য ও যত্ন সহকারে অভিসন্দর্ভটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছেন, গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোজন-বিয়োজনের যথাযথ নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে নিরীক্ষণ করেছেন। তাঁর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, দিকনির্দেশনা ও দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধানের কারণেই আমি আমার অভিসন্দর্ভটি সুসম্পন্ন করতে পেরেছি। তিনি শুধু আমার তত্ত্বাবধায়কই নন, তিনি আমার শিক্ষা গুরু। তাঁর স্নেহ, আন্তরিকতা, পরামর্শ, নীতিজ্ঞান ও আদর্শ জীবনে চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে। পিতা-মাতা ও আচার্যের ঋণ পরিশোধ যোগ্য নয়। তাই শুধু কৃতজ্ঞতার ভাষা দ্বারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন নয়, হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে অবনত চিত্তে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করছি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক (অনারারি) ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাসকে। সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. অসীম সরকারকে। তিনি গবেষণাকর্মে সবসময় অনুপ্রেরণা ও পরামর্শ দিয়েছেন। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সংস্কৃত বিভাগের চেয়ারম্যান ড. ময়না তালুকদারকে। তিনি গবেষণাকর্মে নানা বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন। এছাড়া ড. কালিদাস ভক্ত, ড. প্রমথ মিস্ত্রী সহ সংস্কৃত বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকদের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণাকর্মে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক মণ্ডলীর নিকট থেকে পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি।

গবেষণাকর্মে যে সকল লেখক, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থ, পত্রিকা ও পরামর্শ পেয়েছি তাঁদের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণাকর্মে নানা বিষয়ে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে যিনি উপকৃত করেছেন, তিনি হচ্ছেন ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রবীর কুমার সরকার। তাঁকেও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। এছাড়া গবেষণাকর্মে ও বিভিন্ন প্রয়োজনে যাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি, তাদের মধ্যে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা শৈবাল দে সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরি, জগন্নাথ হলের অনুদ্বৈপায়ন লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। সেই সকল গ্রন্থগারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাকর্মে কম্পিউটারের যাবতীয় কার্যে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছে সংস্কৃত বিভাগের অফিস সহকারী কাম কম্পিটার-মুদ্রাক্ষরিক সঞ্জয় কুমার সরকার। অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতার জন্য তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গবেষণাকর্মে আমার পিতা-মাতার আশীর্বাদ অনুভব করছি। শ্রদ্ধাস্পদ গুরুবর্গের প্রতি গভীর ও বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এছাড়া যে সকল শুভাকাঙ্ক্ষী আমার গবেষণাকর্মে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন, তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বুলবুল দাস

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

পরম সত্য হচ্ছেন সমস্ত শক্তির মূল উৎস, এ কারণে পরম সত্য হচ্ছেন পরম পুরুষ। এ জন্যে পরম পুরুষকে পরম ঈশ্বর বলা হয়। তিনি হচ্ছেন পরম চৈতন্যময় ও নিত্য আনন্দময় সত্তা। তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। সেই পরম পুরুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সবকিছু সম্বন্ধে অবগত। উপনিষদ্‌কে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের মুকুটমণি বলা হয়ে থাকে। তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে– "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং।" অর্থাৎ, সত্যস্বরূপ, চিন্ময়, অসীমতত্ত্বই ব্রহ্ম। চিত্তগুহায় অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত তত্ত্বই পরমাত্মা। ঈশোপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে–

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যায়াঽমৃতমশ্নুতে ॥

অর্থাৎ, যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে একসঙ্গে উপাসনীয় বলে মনে করেন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে জয় করে বিদ্যা দ্বারা পরম অমৃত লাভ করে থাকেন। সমগ্র বিশ্বের মহান মনীষিগণ পরম সত্যকে জানার মাধ্যমে অমৃতত্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনন্তকাল ধরে জ্ঞান সাধনার চেষ্টা করে চলছেন। কেননা জ্ঞানই হচ্ছে পরম পবিত্র ও আলোকময়, যা মানুষকে পরম আনন্দময় অমৃত পথের সন্ধান দিতে পারে।

পরম সত্যের প্রকাশকারী শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্বজগতের পরম মঙ্গলের জন্য ১৪৮৬ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমার অপরাহ্নে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি জগতে মানবের পরম কল্যাণ ও মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তিনি জ্ঞানকে প্রেমভক্তিতে রূপান্তরিত করে সমাজের উচ্চ থেকে নিম্নবর্ণের সকল মানুষকে প্রেমদান করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রদত্ত যে তত্ত্ব-দর্শন তা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তা এই যুগের জন্য যথার্থ ধর্মস্বরূপ। এই সহজ ও অনাড়ম্বর ধর্মের মধ্যে পরম মুক্তি ও আনন্দ রয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্বের মহান তত্ত্বজ্ঞানী মনীষীরা একবাক্যে স্বীকার করে গেছেন। এই ধর্ম বিশ্ব-ধর্মরূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত হওয়ার পরম শক্তি সমন্বিত।

তৎকালীন ভারতবর্ষের মহাবৈদান্তিক ও পরম পণ্ডিত শ্রীল বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহামানব শ্রীচৈতন্যদেবের মহত্ত্ব ও যুগের অবদান সম্পর্কে বলেছেন–

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥

অর্থাৎ, যিনি শ্রীচৈতন্যদেব রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন কৃপার সমুদ্র। তিনি বৈরাগ্য-বিদ্যা ও নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা প্রদান করার জন্য জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এছাড়া বারাণসীর বৈদান্তিক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতী, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীল কেশব কাশ্মীরীসহ মহান পণ্ডিতগণ চৈতন্যদেবের দর্শন ও শিক্ষা গ্রহণ করে তা প্রচার করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

চৈতন্যদেব প্রেম ধর্মের প্রাণপুরুষ ছিলেন। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন। তিনি তাঁর প্রেমভক্তির বন্যায় জগতের মানুষকে প্লাবিত করেছেন। ভক্তি আন্দোলনের তিনিই পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার। তিনি আপামর জনগণের মধ্যে প্রেমভক্তি বিতরণের জন্য নিরুপাধি করুণাকারী চৈতন্যদেবরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি পরমহংস অমল জ্ঞানের শিক্ষক। চৈতন্যদেবের অপ্রাকৃত শিক্ষায় নিরুপাধিক জীবনের কর্মাবরণে কোন প্রশক্তি নেই। কিন্তু সুনির্মল শ্রদ্ধা জীবাত্মার সেবাবৃত্তির উন্মেষের কথা রয়েছে। নিজে প্রেমভক্তিধর্মের আচরণ করে জগৎ ও জীবকে আদর্শ শিক্ষা দান করে জগতের আচার্য অভিধায় অভিহিত হয়েছেন। চৈতন্যদেব বিনয়ে, ভক্তিতে, বৈরাগ্যে, পাণ্ডিত্যে, জীব সেবায়, আদর্শে ও নিষ্ঠায় অতুলনীয় ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত দর্শনের নাম হচ্ছে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন।' তাত্ত্বিক দিক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ' বলা হয়ে থাকে।

তাঁর দর্শন অনুযায়ী পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে কৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। *ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে– ' এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' এছাড়া *ব্রহ্মসংহিতার* পঞ্চম অধ্যায়ের ১নং শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে– 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দো বিগ্রহঃ।' তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে কৃষ্ণের রূপ হচ্ছে সচ্চিদানন্দময়। তাই তাঁর দর্শন মতে উপাস্য হচ্ছেন দ্বিভুজ মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। চৈতন্যদেবের দর্শন অনুযায়ী পঞ্চরসের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনা করলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

বাঙালি জাতির ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেব উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ। বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। জাতিভেদ, বর্ণ বৈষম্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদের পৈশাচিক নির্যাতন ও অনাচারে অস্পৃশ্য-নিম্নবর্ণের অগণিত মানুষ যখন আত্মরক্ষার্থে ধর্মান্তরিত হচ্ছিল, তখন সমাজের সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে সমাজসংস্কারক, মানবতাবাদী, চিন্তানায়ক, আদর্শ ধর্মনেতা, সমাজ রক্ষক ও শান্তিদূত হিসেবে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। তিনি মানবতাবাদী কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি স্থাপন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছিলেন। তিনি সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে একজন বিপ্লবী চিন্তকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে চৈতন্যদেব যেমন বিনয়ী, দয়ালু, সহিষ্ণু ও কুসুমের মতো কোমল ছিলেন, তেমনি বজ্রের মতো কঠিনও ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর শিক্ষা ও আদর্শকে ব্যবহারিকভাবে মানুষকে শিক্ষাদান করেছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য চৈতন্যদেবের এই উদার ও মানবতাবাদের শিক্ষা ও আদর্শের পরম প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মঙ্গলের জন্য চৈতন্যদেবের শিক্ষা ও মানবকল্যাণ চেতনা অপরিহার্য। কেননা এই শিক্ষা মানবের প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনবে। আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কারণে মানবের চিন্তা-চেতনা এখন দেশ বা

Dhaka University Institutional Repository

জাতির ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। মধ্যযুগের মানব সমাজ অপেক্ষা আজকের মানব সমাজ অনেক বেশি উন্নত ও প্রগতিশীল। আধুনিক যুগের মানুষের প্রত্যাশা হচ্ছে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে শান্তিময় ও কল্যাণময় একটি মানব সমাজ যেন গড়ে ওঠে। আধুনিক যুগে মানব সমাজের সকল অশান্তি ও বৈষম্যের কারণ হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞানহীন ভগবৎ বিমুখ সভ্যতা। কিন্তু মানব সমাজ যদি চৈতন্যদেবের দর্শন ও শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে সমাজের বৈষম্য দূর হবে এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সমাজ গড়ে উঠবে। তাহলেই সমাজের সকল মানুষের পরম কল্যাণ সাধিত হবে। কেননা চৈতন্যদেব মানুষকে অন্তর্মুখী করে ব্যবহারিক পন্থায় তাঁর দর্শন ও আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষা দান করেছেন, যার ফলে মানুষের অন্তরে বিশুদ্ধভাব ও চেতনা জাগ্রত হয়। এর দ্বারা সে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে।

তৎকালীন সময়ে যে মহান ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন হয়েছিল, তা ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল। শ্রীচৈতন্যদেবই সেই গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে একজন মহান ঐতিহ্য সমন্বিত ব্যক্তি ও মানবতাবাদী এবং সমাজ সংস্কারক বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কেননা চৈতন্যদেব মানব ইতিহাসের সংকীর্ণ গণ্ডির অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন ও শিক্ষা ছিল বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার স্বরূপ। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে প্রেম বিতরণ করেছেন এবং মানবতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর এই পরম কল্যাণ ও শান্তিময় প্রেমধর্ম তৎকালীন সমাজে অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। কেননা তিনি বৈদিক ধর্ম, দর্শন ও শিক্ষার সারবস্তু মানবসমাজে সরল ও অনাড়ম্বরভাবে প্রচার করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন মহাজ্ঞানী। তিনি জ্ঞান ও ভক্তি সাধনায় গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন। তিনি ভক্তি প্রেম দ্বারা জগতের সবাইকে আপন করে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। মানুষের হৃদয়ে শান্তির আলো জ্বালিয়েছিলেন। তিনি যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন সমাজে কঠোর জাতিভেদ প্রথা, বর্ণ বৈষম্য, ব্রাহ্মণ্যবাদের করাল গ্রাসে সমাজ বিপর্যস্ত ছিল। অস্পৃশ্য, পতিত, চণ্ডাল, দরিদ্র, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত মানুষের সমাজে কোন প্রকার অধিকার ছিল না। এমনি পরিস্থিতিতে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে তাঁর দর্শন ও শিক্ষার দ্বারা কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের পতিত মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে মানুষকে মুক্ত করে সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণ বৈষম্য দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম চর্চা ও প্রচারের মূল ভিত্তি হচ্ছে মানবতাবাদ। মানুষকে তিনি অমৃতের সন্তান হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। সমাজ থেকে জাতিভেদ রূপ বিষ বৃক্ষের মূল উৎপাটন করেছিলেন। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টির ঐসকল উপাদানকে মুছে দিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য দুর্বার আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর এই সংকীর্তন শোভাযাত্রারূপ আন্দোলন বাংলার ভাব আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার নিকট তাঁর বাণী ছিল জীবনের পরম মুক্তির পথ নির্দেশ। ধর্মীয় আন্দোলনের দ্বারা সমাজ পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন ঐতিহাসিক শ্রীচৈতন্যদেবের ভাব আন্দোলনকে বাংলার প্রথম নব জাগরণ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ছিলেন সাম্যবাদ ও মানবতার মূর্ত প্রতীক। সমাজের পতিত-নীচ-অস্পৃশ্যদের নিকট তিনি ছিলেন উদ্ধার কর্তা ও প্রভুস্বরূপ।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর প্রেমভক্তি আন্দোলনের দ্বারা বাঙালির সনাতন বিশ্বাস, আদি কৃষ্টি ও ভাষা-সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছেন। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের মূলমন্ত্র ছিল প্রেমের পারস্পরিক আদান-প্রদান। তাহলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কারণে হিংসা-বিদ্বেষ দূর হবে এবং মানুষের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। চৈতন্যদেবের কৃতিত্ব হচ্ছে– ব্রাহ্মণ্যবাদ, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দলাদলির ঊর্ধ্বে তিনি তাঁর ভক্তিপ্রেম ধর্মের প্রচার করেছিলেন।

চৈতন্যদেবের উদারতার জন্য তাঁর প্রবর্তিত প্রেমভক্তি ধর্ম সর্বজনগ্রাহ্য। তিনি অপরাপর ধর্ম সম্প্রদায়কে সম্মান প্রদর্শন করতেন। এই তাঁর বিশেষ মহত্ত্ব। তাঁর উদারতা ছিল সীমাহীন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের পতিত থেকে উচ্চ শ্রেণির সকলেই তাঁর প্রেমধর্মে অংশগ্রহণ করতে পারত। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে– কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার।

তিনি করুণাময় ও দয়াশীল হওয়ার কারণে তাঁকে মহাবদান্য হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছিল। তাঁর দর্শন ও শিক্ষা দ্বারা দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়া যায়। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে মানব সমাজ পারমার্থিক জীবনে জ্যোতির্ময় জ্ঞান লাভ করতে পারে।

তাঁর শিক্ষা অনুসারে সর্বজীবের একমাত্র ত্রাণকর্তা ও পরম মঙ্গলকারী ঈশ্বরের প্রতি অনন্য প্রেমের উন্মেষ মানব জীবনের পরম সিদ্ধি। চৈতন্যদেব এইভাবে কৃষ্ণতত্ত্বের অমৃতময় উপদেশ প্রদান করেছেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা মহাবদান্যের মূর্ত বিগ্রহ। তিনি করুণার সাগর এবং সৌভাগ্যসিন্ধু। তাঁর সংকীর্তন আন্দোলনরূপ প্রেমধর্মে সবার জন্য দ্বার উন্মুক্ত ছিল। তাঁর শিক্ষা হৃদয়ঙ্গমের মধ্য দিয়ে মানব সমাজ মুক্তি পথের সন্ধান পাবে।

চৈতন্যদেবের জীবন দর্শন অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। আচার ও প্রচার করে তিনি শিক্ষা দান করেছেন। চৈতন্যদেবের রচিত শিক্ষাষ্টকের মধ্যে অত্যন্ত সুগভীর তত্ত্বসহ তাঁর জীবন দর্শন ও অন্তিম শিক্ষার সারমর্ম প্রকাশিত হয়েছে। তবে তাঁর এই শিক্ষাষ্টকের মধ্যে মানব ধর্মের কালজয়ী শিক্ষা হচ্ছে–তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। তিনি এখানে মানব ধর্মের শ্রেষ্ঠ কথা বলেছেন যে অমানীকেও সম্মান করতে হবে। পাশাপাশি নিজেকে তৃণের থেকেও নিচু ভাবতে হবে

Dhaka University Institutional Repository

এবং তরুর থেকেও নিজেকে সহিষ্ণু হতে হবে। তাঁর সমগ্র জীবন ও দর্শন শিক্ষার মধ্যে সারাৎসার শিক্ষা হচ্ছে এই মহাবাণীর তাৎপর্য।

তিনি নারী জাতির অধিকার এবং তাদের শিক্ষার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। চৈতন্যদেব সাম্যের নীতিতে ও উদারতার দ্বারা সমাজ সংস্কার করে নব মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চৈতন্যদেব সমাজ থেকে বর্বর ও নিষ্ঠুর জাতবর্ণ স্পর্শের ভেদাভেদ দূর করে সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ করেছেন। চৈতন্যদেবের এরূপ সমাজসংস্কার, সমাজকল্যাণ ও মানবতাবাদের কারণে বিশ্বের বহু মনীষী তাঁর ভূয়শী প্রশংসা করেছেন।

চৈতন্যদেবের মানবতাবাদের ক্ষেত্রে মৌলিক দর্শন হচ্ছে 'জীবে দয়া'। এই সরল নীতির মধ্যে মনুষ্যত্বের ও মানবতার গভীর অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মানুষের সামাজিক মর্যাদাবোধ, প্রাণের মূল্য ও মনুষ্যত্বের মহিমা।

চৈতন্যদেব অস্ত্র ধারণ করে মানুষকে শিক্ষাদান করেননি। তিনি প্রেমের দ্বারা মানবের আসুরিক প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেছেন। তিনি জাতিভেদরূপ বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন করে প্রেমের দ্বারা জগৎবাসীকে প্রেমবৃক্ষের ছায়াতলে শামিল করেছিলেন। ভারতবর্ষে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গঙ্গার পবিত্র ধারার ন্যায় হরিনাম সংকীর্তন দ্বারা প্রেমের প্লাবন ঘটিয়েছিলেন। সেই প্রেমরূপ প্লাবনে সকলে সমঅধিকারে অবগাহন করে আনন্দ লাভ করেছিল। এটি চৈতন্যদেবের মানবতা ও সাম্যবাদ নীতি।

শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ প্রচারে ইসকনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্কে ইসকন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসকনের মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন, দর্শন ও শিক্ষা সম্পর্কিত গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শহরে, নগরে, গ্রামে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচার করা। এইভাবে ইসকন চৈতন্যদেবের আদর্শ প্রচারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সারা বিশ্বে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে চৈতন্যদেবের আদর্শ প্রচারে ইসকনের ভূমিকা অসামান্য।

আজ সারা বিশ্বে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রচারিত হচ্ছে এবং সমগ্র মানব সমাজ তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। তাই সমাজসংস্কার ও মানবকল্যাণে চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও শিক্ষার বিকল্প নেই। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রেমধর্ম, মানবকল্যাণ, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও শিক্ষা বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং মানবকল্যাণে অতীব জরুরী, যা আধুনিক নীতিবিবর্জিত, তমসাচ্ছন্ন সমাজের আলোকবর্তিকা হিসেবে শান্তির পথপ্রদর্শক হতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেব মানবতার মূর্ত প্রতীক, সাম্য ও শান্তির পথপ্রদর্শক ও বিশ্বমানব কল্যাণে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিকনির্দেশক হিসেবে মানুষের হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভটি ৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম হলো– শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে বাংলার সামাজিক অবস্থা। এ অধ্যায়ে তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় অবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে বাংলার শাসন ব্যবস্থা, নারী জাতির শিক্ষা, বিবাহ, খাদ্য, পোশাক, যুদ্ধপ্রণালী, সাহিত্য, ধর্ম-কর্ম, নীতি ও আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়– শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী। এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব থেকে শুরু করে অপ্রকট পর্যন্ত তাঁর জীবনের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনদর্শন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এখানে তাঁর দর্শনের বৈশিষ্ট্য, দর্শনতত্ত্বের কাঠামো, পঞ্চভক্তিরসের সাধনা, রাগানুগা ভক্তি সাধনের শিক্ষা, চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন, ব্যবহারিক জীবনে চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও শিক্ষা বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনার বিষয় হলো– শ্রীচৈতন্যদেবের সমাজসংস্কার ও সমাজকল্যাণ। এখানে চৈতন্যদেবের গণ-আন্দোলন, সমাজের দলিত-পতিতদের উদ্ধারের মাধ্যমে সমাজসংস্কার ও সমাজকল্যাণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো– শ্রীচৈতন্যদেবের মানবতাবাদ। এ অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের সর্বজীবে সাম্য দর্শন, সমাজবিপ্লব ও গণ-আন্দোলনে চৈতন্যদেব, চৈতন্যদেবের মানবপ্রেমের প্রকাশ, চৈতন্যদেবের প্রীতিধর্মে বাঙালির মানবতাবোধ, হিন্দু সমাজের ত্রাণকর্তারূপে চৈতন্যদেবের ভূমিকা ও চৈতন্যদেবের মানবতাবাদ সম্পর্কে দৃষ্টান্ত সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ প্রচারে ইসকনের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের দর্শন, আদর্শ ও শিক্ষা প্রচারের জন্য ইসকন যেসকল গ্রন্থ প্রকাশ এবং প্রচার কার্যক্রম করছে, সে বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, চৈতন্যদেবের জীবনদর্শনের শিক্ষা সমাজের মানুষের মুক্তির আলোকবর্তিকা স্বরূপ। আদর্শে, নীতিতে, চরিত্রে, ত্যাগে, মহানুভবতায়, মনুষ্যত্বের বিকাশে, সমাজ গঠনে ও শান্তি স্থাপনে চৈতন্যদেবের শিক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও শিক্ষাকে জীবনে ধারণ করলে মানবের পরম কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। চৈতন্যদেবের আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণের দ্বারা সমাজে অনৈক্য দূর হোক, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূরে চলে যাক, সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হোক ও সমাজের অবহেলিত সকল মানুষ তার অধিকার ফিরে পাক এবং সমাজে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভূমিকা :		**১-১৫**
প্রথম অধ্যায়:	শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে বাংলার সামাজিক অবস্থা	১৬-৪৫
দ্বিতীয় অধ্যায়:	শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী	৪৬-১২৪
তৃতীয় অধ্যায়:	শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনদর্শন	১২৫-১৫৬
চতুর্থ অধ্যায়:	শ্রীচৈতন্যদেবের সমাজসংস্কার ও সমাজকল্যাণ	১৫৭-১৯১
পঞ্চম অধ্যায়:	শ্রীচৈতন্যদেবের মানবতাবাদ	১৯২-২০৭
ষষ্ঠ অধ্যায়:	শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ প্রচারে ইস্‌কনের ভূমিকা	২০৮-২৪৫
উপসংহার:		২৪৬-২৫৩
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :		২৫৪-২৫৭

ভূমিকা

অনন্তকাল ধরে চলছে সারস্বত সাধনা। এর মধ্যে জ্ঞানী-মনীষীরা এক অপার আনন্দ লাভ করে থাকেন। প্রাপ্তি না থাকলে সারস্বত সাধনার মতো কৃচ্ছ্র সাধনে কেউ ব্রতী হতো না। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে– 'জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।' গীতা ৪/৩৯। অর্থাৎ, জ্ঞান লাভের দ্বারাই পরাশান্তি লাভ করা যায়। সমগ্র বিশ্বের মানুষ শান্তির অন্বেষণে সর্বদা নিরত। কিন্তু মনীষীরা জ্ঞান লাভের জন্য সারস্বত সাধনায় সর্বদা মগ্ন। কারণ এর মধ্যে প্রকৃত শান্তি রয়েছে।[১] সমগ্র পুরাণ শাস্ত্রের রচয়িতা মহামুনি ব্যাসদেব *ভাগবত পুরাণের* প্রথমে জ্ঞান লাভের জন্য পরম সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, যথা– 'সত্যং পরং ধীমহি।' *ভাগবত* ১ম স্কন্ধ/১/১।[২] কেননা পরম সত্যের মধ্যে সমগ্র জ্ঞান বিরাজিত। আর এই জ্ঞানের চর্চা, জ্ঞানের অন্বেষণ, জ্ঞানের আহরণ ও জ্ঞানের সাধনা সবকিছুর মূলে রয়েছে অপার আনন্দ লাভ করা।

শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন মহাজ্ঞানী। তিনিও জ্ঞান সাধনায় গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর জ্ঞানকে জগৎ কল্যাণের জন্য ভক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। জগতের মানুষের যদি প্রকৃত কল্যাণ সাধন না করা যায়, তাহলে সেই জ্ঞানের কি প্রয়োজন আছে? তিনি ভক্তি প্রেম দ্বারা জগতের সবাইকে আপন করে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। মানুষের হৃদয়ে শান্তির আলো জ্বালিয়েছিলেন। তিনি যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন সমাজে কঠোর জাতিভেদ প্রথা, বর্ণ বৈষম্য, ব্রাহ্মণ্যবাদের করাল গ্রাসে সমাজ বিপর্যস্ত ছিল। অস্পৃশ্য, পতিত, চণ্ডাল, দরিদ্র, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত মানুষের সমাজে কোন প্রকার অধিকার ছিল না। এমনি পরিস্থিতিতে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে তাঁর দর্শন ও শিক্ষার দ্বারা কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের পতিত মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে মানুষকে মুক্ত করে সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণ বৈষম্য দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাঙালি জাতির ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেব উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ। তিনি শ্রীচৈতন্যদেব বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। জাতিভেদ, বর্ণ বৈষম্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদের পৈশাচিক নির্যাতন ও অনাচারে অস্পৃশ্য-নিম্নবর্ণের অগণিত মানুষ যখন আত্মরক্ষার্থে ধর্মান্তরিত হচ্ছিল, তখন সমাজের সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে সমাজসংস্কারক, মানবতাবাদী, চিন্তানায়ক, আদর্শ ধর্মনেতা, সমাজ রক্ষক ও শান্তিদূত হিসেবে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। তিনি মানবতাবাদী কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি স্থাপন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছিলেন। তিনি সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে একজন বিপ্লবী চিন্তকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে চৈতন্যদেব যেমন বিনয়ী, দয়ালু, সহিষ্ণু ও কুসুমের মতো কোমল ছিলেন, তেমনি বজ্রের মতো কঠিনও ছিলেন।

পঞ্চদশ- ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যবাদের উৎপীড়নে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। জাতিভেদ, বর্ণ বৈষম্য, কৌলীন্যবাদ প্রভৃতি সামাজিক অনাচারের কারণে নিম্নবর্গের মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ফলে সমাজে মানুষে মানুষে পার্থক্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পতিত, চণ্ডাল, অস্পৃশ্যরা উচ্চ শ্রেণির মানুষের দ্বারা নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও নিষ্পেষিত হতে থাকে। সমাজে ধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে নিম্নবর্ণের পতিতদের শিক্ষা অর্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। পতিত, নীচ, চণ্ডালসহ বিভিন্ন বর্ণের শ্রেণি- পেশার মানুষের ধর্ম সাধনার পথ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এমন এক অমানবিক ও বৈষম্যক্লিষ্ট অশান্তিময় পরিবেশে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে পার্ষদদের নিয়ে আন্দোলন করে সমাজ সংস্কার করেছিলেন। তিনি এক্ষেত্রে ধর্মীয় সংস্কারকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সেজন্য তিনি তাঁর প্রবর্তিত 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব' দর্শন প্রচার করেছিলেন, যাকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন' বলা হয়ে থাকে। তিনি ইসলাম ধর্মসহ অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়কে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন।[৩]

শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম চর্চা ও প্রচারের মূল ভিত্তি হচ্ছে মানবতাবাদ। মানুষকে তিনি অমৃতের সন্তান হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তিনি জন্মকে নয় কর্মের দ্বারা অর্জিত গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন। সমাজ থেকে জাতিভেদ রূপ বিষ বৃক্ষের মূল উৎপাটন করেছিলেন। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টির ঐসকল উপাদানকে মুছে দিয়েছিলেন। মানুষকে প্রেম প্রদানের ক্ষেত্রে ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বিভেদকে মানেননি, জাতি ভেদ ও বর্ণ বৈষম্যকে প্রচণ্ডভাবে তিনি ঘৃণা করতেন। ঈশ্বরের সত্তা মানুষের মধ্যে বিরাজিত থাকায় প্রতিটি মানুষকে স্রষ্টার সন্তান হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করে মূল্যায়ন করেছেন। প্রতিটি জীবের প্রতি তাঁর দয়া ছিল অসামান্য। জীবের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও করুণা প্রদর্শনের তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস তাঁর রচিত বিখ্যাত চরণগুচ্ছ-এ বলেছেন–

শুন হে মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।

তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য দুর্বার আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর এই সংকীর্তন শোভাযাত্রারূপ আন্দোলন বাংলার ভাব আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। কানু ছাড়া কোন গীত ছিল না। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার নিকট তাঁর বাণী ছিল জীবনের পরম মুক্তির পথ নির্দেশ। তাঁর প্রেম ধর্মের স্নিগ্ধতায় সিক্ত হয়ে অনেক মুসলিম কবি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। ধর্মীয় আন্দোলনের দ্বারা সমাজ পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন ঐতিহাসিক শ্রীচৈতন্যদেবের ভাব আন্দোলনকে বাংলার প্রথম নব জাগরণ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ছিলেন সাম্যবাদ ও মানবতার মূর্ত প্রতীক। সমাজের পতিত-নীচ-অস্পৃশ্যদের নিকট তিনি ছিলেন উদ্ধার কর্তা ও প্রভুস্বরূপ।

শ্রীচৈতন্যদেব যে সকল অশাস্ত্রীয় প্রথা, বিধি-বিধান, অমানবিক ও অসামাজিক আচার-আচরণ, সেই সকল সমাজ ধ্বংসকারী বিভেদের বিরুদ্ধে আজীবন কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজও তা সমাজে দৃশ্যমান। এ জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও শিক্ষা বর্তমান সমাজের জন্য অপরিহার্য।[৪]

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর প্রেমভক্তি আন্দোলনের দ্বারা বাঙালির সনাতন বিশ্বাস, আদি কৃষ্টি ও ভাষা-সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছেন। তিনি যদি এসব রক্ষা না করতেন, তাহলে আগ্রাসন ও আধিপত্যের কারণে তা হয়তো হারিয়ে যেত। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের মূলমন্ত্র ছিল প্রেমের পারস্পরিক আদান-প্রদান। তাহলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কারণে হিংসা-বিদ্বেষ দূর হবে এবং মানুষের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন গতিশীল হওয়ার কারণে বৈষ্ণব পদকর্তাগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব ও লীলার উপর বহু পদাবলী সাহিত্য রচনা করে তা সবার সম্মুখে প্রচার করেছিলেন। ফলে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে এবং পরবর্তী সময়ে পদাবলী সাহিত্যের জনপ্রিয়তার কারণে তা স্বর্ণযুগে পরিণত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের কৃতিত্ব হচ্ছে– ব্রাহ্মণ্যবাদ, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দলাদলির ঊর্ধ্বে তিনি তাঁর ভক্তিপ্রেম ধর্মের প্রচার করেছিলেন, যাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বলা হয়ে থাকে। আর এ ধর্মের দার্শনিকগণ বলেন– চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত।[৫]

এই মহামানব শ্রীচৈতন্যদেবের সমগ্র জীবনদর্শন ও শিক্ষা অবলম্বন করে যেসকল গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম ও সর্বাধিক প্রামাণিক গ্রন্থ হচ্ছে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত *'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'*। আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা পর্বে বিভক্ত হয়ে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। আলোচ্য গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন, শিক্ষা, আদর্শ, তত্ত্বদর্শন যেমনি বিশদ, তেমনি সুগভীর অর্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ।
চৈতন্যচরিতামৃতের গুরুত্ব সম্বন্ধে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন– "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মত দার্শনিক পুস্তকের সম্যক্ প্রণিধানের জন্য গুরুর উপদেশ আবশ্যক; *** বলা যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমস্ত মূলতত্ত্ব এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে; ইহাকে সমস্ত গোস্বামিশাস্ত্রের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সম্পুট।"[৬]

চৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে ড. রাধাগোবিন্দ নাথ *চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায়* বলেছেন– চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবের জীবন চরিত্র অপেক্ষা দার্শনিক তত্ত্বের বর্ণনাই বেশি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট এই গ্রন্থ বেদবৎ তুল্য। এটি বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব রত্ন গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কবিত্ব ও দার্শনিক তত্ত্ব এবং রস ও ভাবের অপূর্ব সমাবেশের কারণে গ্রন্থটির সাহিত্যিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এই চৈতন্য লীলা-রস-নিষিক্ত গ্রন্থখানি পাঠে পাঠকের আস্বাদন-মাধুর্য ক্রমশ বর্ধিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করেছেন–

"যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্‌ভূত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণ উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি, শুনিলেই হয় বড় হিত ॥"

চৈ. চ. ২/২/৭৬

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এক বৃহৎ ও মহৎকার্য সম্পাদন করলেও তাঁর বিনয় ছিল আদর্শস্থানীয়, যা সবাইকে বিমুগ্ধ করে–

"জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥"[৭]

চৈ. চ. ১/৫/১৮৩-১৮৪

চৈতন্য শব্দের অর্থ হচ্ছে 'জীবনী-শক্তি', 'চরিত' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'চরিত্র' ও 'অমৃত' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'অমরত্ব'। তাই চৈতন্যচরিতামৃত বলতে সামগ্রিকভাবে বিভু-চৈতন্যের অমৃতময় জীবন-চরিত বুঝায়।[৮] চৈতন্যচরিতামৃত হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের গ্রন্থ। বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থের সার বস্তু নিয়ে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে।[৯] চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি সাহিত্য-রস ও শিল্পের উৎকর্ষ এবং দর্শনের গভীরতার কারণে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠছে।[১০]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে মধ্যমণি হিসেবে অলংকৃত হয়ে আছে।[১১] এই গ্রন্থটি প্রথম বাংলা গ্রন্থ, যা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্য। এখানে দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সঙ্গীত, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব মিলে একাকার হয়ে আছে। তবে চৈতন্যদেবের যে অন্তরঙ্গ জীবনচিত্র ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তাও কৃষ্ণদাসের সুনীপুণ লেখনীতে ধরা পড়েছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় যে কয়টি গ্রন্থের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় সংস্কৃত ভাষায় টীকা রচনার প্রয়োজন হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম চৈতন্যচরিতামৃত। বৃন্দাবনের বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই বাংলা গ্রন্থের প্রথম সংস্কৃত টীকা রচনা করে এর কীর্তিকে স্থায়ী করেন। এটি অনন্য নিদর্শন।[১২]

ড. সুকুমার সেন চৈতন্যচরিতামৃত সম্পর্কে বলেছেন– "এখনকার দিনে আমরা 'বই' (ইংরেজি Book) বলতে সাধারণত যা বুঝি, সে অর্থে প্রথম বাংলা বই হল কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত।" তিনি আরও বলেছেন– "কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃত লিখেছিলেন অনেকটা আধুনিককালের ঐতিহাসিক পণ্ডিতের দৃষ্টি নিয়ে। সর্বত্র তিনি

প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। এমন দৃষ্টি নিয়ে আর কোনো দ্বিতীয় বই বাংলায় লেখা হয়নি ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত।"

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে খণ্ড বিভাগের পর হয়েছে– পরিচ্ছেদ বিভাগ, যা এই গ্রন্থ রচনার পূর্বে বাংলা গ্রন্থের কোথাও দেখা যায়নি। এই গ্রন্থটি ৬২ পরিচ্ছেদে রচিত হয়েছে। এটি তার রচনার এক অভিনবত্ব। এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণভাবে পদ্যে রচিত। এটি পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে রচিত।[১৩] বৈষ্ণব সম্প্রদায় চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটিকে বেদ শাস্ত্রের মতো শিরোধার্য করেছিল। কৃষ্ণদাসের এই গ্রন্থটি চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও শিক্ষার সারাৎসার এবং গোস্বামীদের গ্রন্থের সার সংগ্রহ বলে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। যাঁরা বাঙালি নন তারাও এই গ্রন্থটি নাগরী অক্ষরে লিখিয়ে নিয়ে পাঠ করতেন।[১৪]

চৈতন্যচরিতামৃতের গুরুত্ব সম্বন্ধে ড, সুকুমার সেন বলেছেন– "একজনের মনে মনে পড়বার এবং পাঁচজনকে পড়িয়ে শোনাবার মতো বই বাংলা ভাষায় প্রথম লিখলেন কৃষ্ণদাস। বাংলাভাষায় মনীষার আগাগোড়া স্পষ্ট ছাপ পড়ল সর্বপ্রথম চৈতন্যচরিতামৃতে। এই ধাপের উপরে উঠতে বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্যকে আপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রায় তিনশ বছর।"[১৫]

চৈতন্যদেবের প্রেমদান সম্বন্ধে ড. রাধাগোবিন্দ নাথ *চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায়* বলেছেন– চৈতন্যদেব মহাপাপী জগাই-মাধাই থেকে শুরু করে অগণিত মানুষকে প্রেম প্রদান করেছিলেন। এমনকি ঝাড়িখণ্ড বনের হিংস্র জন্তুকে পর্যন্ত তিনি প্রেম প্রদান করেছেন। কত কোল-ভীল সাঁওতাল, নিচু বর্ণের ম্লেচ্ছ জাতি তাঁর প্রেম লাভ করে ধন্য হয়েছে, তার কোন সীমা নেই। শিবানন্দ সেনের কুকুরকে পর্যন্ত নীলাচলে চৈতন্যদেব প্রেমদান করেছিলেন। তাঁর দিব্য রূপ মাধুর্য দর্শনে এবং অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে গলদশ্রু-ধারা এবং সর্বাঙ্গে পুলক দর্শনে পথিক-দর্শক আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে যেত।[১৬]

চৈতন্যদেবের ভক্তিরস শব্দের মধ্যে রস শব্দের অর্থ হচ্ছে আস্বাদ্য বস্তু। অর্থাৎ- রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ। তবে আস্বাদ্য বস্তু হলেই তাকে রস বলা যায় না। সেখানে চমৎকারিতা থাকতে হয়। কারণ চমৎকারিতাই রসের সার। সর্বদাই চমৎকারিতা সাররূপে পরিগণিত হওয়ার কারণে সব রসই অদ্ভুদ হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে *অলঙ্কার-কৌস্তুভে* বর্ণনা করা হয়েছে– "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ। তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রৈবাদ্ভুতোরসঃ।" অলঙ্কার-কৌস্তুভ ৫/৭

উদাহরণস্বরূপ– দধির নিজস্ব একটা স্বাদ রয়েছে। এই দধির সঙ্গে যদি কর্পূর, ঘৃত, মধু, এলাচ, চিনি প্রভৃতি মিশ্রিত করা হয়, তাহলে তার অপূর্ব স্বাদ ও সৌগন্ধাদির কারণে তার আস্বাদনে এক চমৎকারিতা জন্মে। এইরূপ আস্বাদনকে রস বলা হয়ে থাকে। তাই বিভিন্ন বস্তুর সংযোগে দধি যেমন অপূর্ব আস্বাদন চমৎকারিতা ধারণ করে রসরূপে পরিণত হয় তেমনি ভক্তিও অন্যবস্তুর সংযোগে অপূর্ব আস্বাদন চমৎকারিতা ধারণ করে রসরূপে পরিণত হতে পারে। তবে ভক্তি স্বতঃই আস্বাদ্য। ভক্তির নিজস্ব একটা স্বাদ আছে। ভক্তি আনন্দস্বরূপ বলে নিজেই

আনন্দ দান করতে পারে। তবে এই আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যভিচারী ভাব মিলিত হয়, তাহলে ভক্তের চিত্তে তখন অনির্বচনীয় এক চমৎকারিতা জন্মিবে। অর্থাৎ– বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যভিচারীভাবের একত্র মিলনে কৃষ্ণভক্তি বা স্থায়ীভাব রসরূপে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

প্রেমাদিক স্থায়ীভাব সামগ্রীমিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে ॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব, ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব রস হয়, মিলি এই চারি ॥[১৭]

চৈ. চ. মধ্য/২৩

চৈতন্যদেবের উদারতার জন্য তাঁর প্রবর্তিত প্রেমভক্তি ধর্ম সর্বজনগ্রাহ্য। তিনি অপরাপর ধর্ম সম্প্রদায়কে সম্মান প্রদর্শন করতেন। পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান করতেন। এই তাঁর বিশেষ মহত্ত্ব। তাঁর উদারতা ছিল সীমাহীন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের পতিত থেকে উচ্চ শ্রেণির সকলেই তাঁর প্রেমধর্মে অংশগ্রহণ করতে পারত। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

"নীচু জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥
দীনের অধিক দয়া করে ভগবান।
কুলীন-পণ্ডিত-ধর্মীর বড় অভিমান ॥

চৈ. চ. অন্ত্য/৪/

চৈতন্যদেবের উদারতার দ্বারা হরিদাস ঠাকুর সবার শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন। তিনি শূদ্র রামানন্দকে দিয়ে শাস্ত্র প্রচার করিয়েছেন। কায়স্থ নরোত্তমদাস ঠাকুরও ব্রাহ্মণদের দীক্ষা দান করেছেন। সদ্‌গোপ শ্যামানন্দও বহু ব্রাহ্মণকে দীক্ষামন্ত্র দান করেছেন। চৈতন্যদেবের এই উদারতার জন্য তাঁর ধর্ম সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি মানুষের হৃদয় মন জয় করে নিয়েছেন।[১৮]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় রচিত সনাতন ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করে চৈতন্যদেবের জীবন দর্শন সম্বলিত গ্রন্থ *'চৈতন্যচরিতামৃত'* মাতৃভাষা বাংলায় রচনা করার কারণে চৈতন্যদেবের ধর্ম বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। কেননা সংস্কৃতের দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করা সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মাতৃভাষা অর্থাৎ– বাংলা ভাষায় ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ও চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন এবং শিক্ষা লাভ করতে পেরে বাংলার

অগণিত মানুষ চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিল। দুষ্প্রাপ্য বস্তু একমাত্র ভাষার মাধ্যমে বাঙালি সহজে লাভ করে চৈতন্য প্রেমে অবগাহন করেছিল। এটি বাঙালিদের সৌভাগ্যের বিষয়।[১৯]

শ্রীচৈতন্যদেব বাল্যকালে বিশ্বম্ভর নামে নদীয়ায় পরিচিত ছিলেন। যিনি সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা তিনি হচ্ছেন বিশ্বম্ভর। চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে মানব জাতিকে এক অনুপম শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষকরূপে মানুষের পরম প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেছেন। তিনি করুণাময় ও দয়াশীল হওয়ার কারণে তাঁকে মহাবদান্য হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছিল। কেননা তিনি মহাবদান্য প্রেম-প্রদাতা। চৈতন্যদেবের শিক্ষা মানব সমাজকে অনর্থক ও অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হতে সাহায্য করে। তাঁর দর্শন ও শিক্ষা দ্বারা দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়া যায়। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে মানব সমাজ পারমার্থিক জীবনে জ্যোতির্ময় জ্ঞান লাভ করতে পারে।[২০]

শ্রীল রূপ গোস্বামী চৈতন্যদেবকে তাঁর উদারতার জন্য তাঁকে মহান উদার বলে প্রশংসা করেছেন। কেননা তিনি প্রেমভক্তির উচ্চ শিক্ষা সরলভাবে জনসমাজে দান করে মহত্তম উপকার করেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের থেকেও অধিক উদার বলে নির্বিচারে কৃষ্ণপ্রেম দান করেছেন, যা পূর্বে কখনও কেউ মানব সমাজে দান করেননি। এ জন্য তিনি তাঁকে 'মহাবদান্য' আখ্যা দিয়ে সম্মান নিবেদন করেছেন। এ প্রসঙ্গে রূপ গোস্বামী বলেছেন–

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

চৈতন্যদেব একজন আচার্যরূপে মানুষকে শিক্ষা দান করেছেন যে, প্রতিটি মানুষ স্রষ্টার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রিয় হতে পারে। যেমন– স্রষ্টার সঙ্গে বন্ধু, পিতা-মাতা, কিংবা প্রেমিকা হিসেবে সম্বন্ধ তৈরি করতে পারে। তবে চৈতন্যদেবের মহত্তম দান হচ্ছে কৃষ্ণকে প্রেমিকা রূপে লাভ করা। অর্থাৎ– মাধুর্য রসে সম্পর্ক স্থাপন করা। এটি চৈতন্যদেবের দর্শন ও শিক্ষার মধ্যে অনুপম উপহার এবং ভক্তি ধর্মের অভিনবত্ব দান। কেননা মাধুর্য রসে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক এটি ভগবৎ ভক্তির সর্বোচ্চ পর্যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে একে উন্নত-উজ্জ্বল রস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই মাধুর্য রস একমাত্র চৈতন্যদেবই দান করেছেন। কেননা তিনি মহান দাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে অকাতরে শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেছেন। তাঁর এরূপ দান সর্বোত্তম ও অতুলনীয় । কামনাযুক্ত যে প্রেম তা প্রকৃত প্রেমের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রদেয় প্রেম নিরবচ্ছিন্ন ও চিরস্থায়ী, যাকে অপ্রাকৃত প্রেম বা Transcendental Love বলা হয়ে থাকে। তবে চৈতন্যদেব ব্যবহারিকভাবে মাধুর্যমণ্ডিত ভগবৎ প্রেমের পথ প্রদর্শন করে গিয়েছেন এবং অন্যদেরকে তাঁর শিক্ষা প্রদান করেছেন। এটি তাঁর আচরিত ধর্ম পথ।

সমুদ্রের দিগন্ত থেকে যেভাবে চন্দ্রের উদয় হয় তেমনি মাধুর্য প্রেম আস্বাদনের জন্য চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। সমুদ্র মন্থনের ফলে যেমন চন্দ্র উত্থিত হয়েছিল তেমনি অপ্রাকৃত প্রেম মন্থন করে চৈতন্যদেবের

উদয় হয়েছিল। সত্যিকার অর্থে চৈতন্যদেবের অঙ্গকান্তি ছিল গৌরবর্ণ, অর্থাৎ– চন্দ্র কিরণের মতো তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ। এটি তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে অর্থব্যঞ্জক উপমা।[২১]

চৈতন্যদেবের শিক্ষা অনুযায়ী বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য গ্রন্থ হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ। *শ্রীমদ্ভাগবত* গ্রন্থকে তিনি দিব্যজ্ঞান সমন্বিত অমল পুরাণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর শিক্ষা অনুসারে সর্বজীবের একমাত্র ত্রাণকর্তা ও পরম মঙ্গলকারী ঈশ্বরের প্রতি অনন্য প্রেমের উন্মেষ মানব জীবনের পরম সিদ্ধি। শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনের নাম হচ্ছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন। কিন্তু তাত্ত্বিক দিক থেকে এই দর্শনকে বলা হয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ। তাঁর এই তত্ত্ব দর্শন অনুযায়ী পরম ব্রহ্ম হচ্ছেন শ্রীহরি। তাঁর সমগ্র সৃষ্টি হচ্ছে যুগপৎ এক ও অভিন্ন তত্ত্ব। পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম হলো শব্দ ব্রহ্মরূপ। পরব্রহ্ম যেহেতু পূর্ণ তত্ত্ব সেহেতু তাঁর নাম ও দিব্যরূপ এক ও অভিন্ন। সে কারণে পরম ব্রহ্মের পবিত্র ও দিব্যনাম স্মরণ ও কীর্তনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করা যায়।[২২]

চৈতন্যদেব এইভাবে কৃষ্ণতত্ত্বের অমৃতময় উপদেশ প্রদান করেছেন। তিনি আদর্শ গুরুরূপে মানব জীবনের পরম প্রয়োজন অর্থাৎ– পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির শিক্ষাদান করেছেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা মহাবদান্যের মূর্ত বিগ্রহ। তিনি করুণার সাগর এবং সৌভাগ্যসিন্ধু। তাঁর সংকীর্তন আন্দোলনরূপ প্রেমধর্মে সবার জন্য দ্বার উন্মুক্ত ছিল। এই ধর্ম পথে আসতে কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করলে ঈশ্বরের প্রতিটি জীব সেই পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে মানব জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে পারে। তাই চৈতন্যদেবের শিক্ষা অনুসারে প্রত্যেক মানুষই দিব্য জীবন লাভের অধিকারী হতে পারে। তাঁর শিক্ষা হৃদয়ঙ্গমের মধ্য দিয়ে মানব সমাজ মুক্তি পথের সন্ধান পাবে।[২৩]

চৈতন্যদেব সংস্কৃত ও ন্যায় দর্শনের পীঠস্থান হিসেবে খ্যাত নবদ্বীপের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দীক্ষা লাভের পরে মহান ধর্ম প্রচারক হিসেবে পরিগণিত হন। তাঁর এরূপ পরিবর্তনে নদীয়ার পণ্ডিতগণ বিস্ময়াবিষ্ট হন। তাঁর এরূপ পরিবর্তনে তাঁর মধ্যে পূর্বের তর্কপ্রিয় নৈয়ায়িক, বিতর্ককারী স্মার্ত এবং পাণ্ডিত্যের অভিমান দেখা যেত না। তাঁর হৃদয় ভগবৎ ভক্তিতে পূর্ণ থাকায় কৃষ্ণপ্রেমে তিনি মূর্চ্ছিত হতেন এবং তাঁর দেহে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা যেত। তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে মহান মহান পণ্ডিত চৈতন্যদেবের আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের জীবনের মহান ব্রত ও আদর্শ ছিল সর্বোত্তম ভাবধারায় মানব সমাজকে প্রেম প্রদান করা। চৈতন্যদেব শুধু এক বিশাল বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভাশালী পুরুষই নন, তিনি পরমেশ্বরের অমৃতময় বাণী ও আদর্শ প্রচারের এক মহান বৈকুণ্ঠদূত ছিলেন। চৈতন্যদেব সাম্প্রদায়িকতা ও ভেদাভেদকে মানব ধর্মের অগ্রগতির পথে অন্তরায় হিসেবে মনে করতেন। সৌম্যমূর্তি চৈতন্যদেবের হৃদয় অত্যন্ত কোমল হলেও মানব কল্যাণে তিনি ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তিনি সমাজের পতিত, অস্পৃশ্যসহ বিশ্বজগতের

সকল মানুষের উদ্ধারের নিমিত্তে পরিবার, আত্মীয়স্বজনের মোহমায়ার বন্ধন ছিন্ন করে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন।[২৪]

চৈতন্যদেবের যেমন মাধুর্যমণ্ডিত রূপ ছিল তেমনি তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মধুর। অন্যদিকে তিনি বিনয়ের মূর্ত প্রতীকও ছিলেন। তাঁর অপূর্ব কমনীয় রূপমাধুর্য যে ব্যক্তি দর্শন করত সেই ব্যক্তি তাঁর দর্শনের আনন্দ পেয়ে তাঁর প্রেমে আকৃষ্ট হতো। তবে তাঁর জীবনদর্শন ও শিক্ষা প্রচারের সাক্ষাৎ ফল হচ্ছে বৃন্দাবনের ষড়ুগোস্বামী। তাঁরা চৈতন্যদেবের দর্শন ও শিক্ষার উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এক এক গোস্বামী ভক্তি ও ধর্ম তত্ত্বে এক এক বিষয়ে বিশেষত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। এটি তাঁর শিক্ষা প্রচারের সার্থকতা।[২৫]

চৈতন্যদেবের জীবন দর্শন অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। কেননা এটি ব্যবহারিক। আচার ও প্রচার করে তিনি শিক্ষা দান করেছেন। তিনি পরম পণ্ডিত হয়েও কখনও গর্ব প্রকাশ করেননি। চৈতন্যদেবের রচিত শিক্ষাষ্টকের মধ্যে অত্যন্ত সুগভীর তত্ত্বসহ তাঁর জীবন দর্শন ও অন্তিম শিক্ষার সারমর্ম প্রকাশিত হয়েছে।[২৬] তবে তাঁর এই শিক্ষাষ্টকের মধ্যে মানব ধর্মের কালজয়ী শিক্ষা হচ্ছে–

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

চৈ. চ. অন্ত্য/২০/৫

তিনি এখানে মানব ধর্মের শ্রেষ্ঠ কথা বলেছেন যে অমানীকেও সম্মান করতে হবে। পাশাপাশি নিজেকে তৃণের থেকেও নিচু ভাবতে হবে এবং তরুর থেকেও নিজেকে সহিষ্ণু হতে হবে। তাঁর সমগ্র জীবন ও দর্শন শিক্ষার মধ্যে সারাৎসার শিক্ষা হচ্ছে এই মহাবাণীর তাৎপর্য।[২৭] ড. সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন– "চৈতন্যের ধর্ম এইরূপ কঠিন বৈরাগ্যের ধর্ম। তাঁর নিজের কথায় এই ধর্ম আচরণ করা যায় এইভাবে– 'তরোরিব সহিষ্ণুনা'। এই সামান্য কথাটির অর্থ যে অত্যন্ত অসামান্য, তা কৃষ্ণদাস বলে দিয়েছেন–

'বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে তবু পানি না মাগয়॥'

এ তো চিরকালের বীরের ধর্ম। চৈতন্যের ধর্ম এমনই বৈরাগী বীরের ধর্ম।"[২৮]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* চৈতন্যদেবের পরম মহত্ত্ব ও করুণার কথা বর্ণনা করেছেন। তার নাম প্রেম অমৃতস্বরূপ গুপ্ত সম্পদ। পূর্বে তিনি কাউকে প্রদান করেননি। তিনি অতি উদারতার কারণে আপামর সকল জনসাধারণকে সেই দুর্লভ নামপ্রেম অকাতরে বিতরণ করেছিলেন। এ কারণে আমি তাঁর চরণে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যথা–

চিরাদদত্তং নিজ-গুপ্তবিত্তং স্বপ্রেম-নামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥[২৯]

চৈ. চ. মধ্য/২৩/১

শ্রীল রূপ গোস্বামী *বিদগ্ধমাধবে* চৈতন্যদেবের মহত্ত্ব ও করুণা বিষয়ে তাঁর প্রশস্তি করেছেন যে, পূর্বে যা অর্পিত হয়নি, সেই উন্নত-উজ্জ্বল রস (মাধুর্য প্রেম) অত্যন্ত করুণাবশত কলিযুগের জীবদের প্রদান করেছেন। সুবর্ণকান্তি সমূহ দ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হৃদয়ে স্ফূর্তি লাভ করুন। যথা–

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥[৩০]

বিদগ্ধমাধব ১/২

বৈষ্ণব কবি শ্রীল প্রেমানন্দ দাস ঠাকুর চৈতন্যদেবের মহত্ত্ব ও করুণা সম্বন্ধে বলেছেন– কে উত্তম আর কে অধম, কে যোগ্য আর কে অযোগ্য– এ সব চিন্তা না করে চৈতন্যদেব নির্বিশেষে সবাইকে বুকে ধারণ করে প্রেমালিঙ্গন দিয়েছেন এবং ক্রন্দন করতে করতে বলেছেন– 'আমার বক্ষে এসো, আমার বক্ষে এসো।'[৩১]

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁর রচিত *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে* চৈতন্যদেবের করুণা সম্পর্কে বলেছেন– সে আনন্দ লীলাময় বিগ্রহ স্বর্ণের ন্যায় কমনীয় দিব্যকান্তি এবং মাধুর্যরসস্বরূপ মহাপ্রেম প্রদানকারী চৈতন্যদেবকে পুনঃপুনঃ প্রণতি নিবেদন করি। যথা–

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥[৩২]

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-১১

শ্রীচৈতন্যদেবের করুণা ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে বৈষ্ণব পদকর্তা শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর রচিত *'শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকাতে'* বর্ণনা করেছেন–

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু! দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ সংসারে ॥
পতিতপাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥[৩৩]

'শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা/১৪

চৈতন্যদেবের দয়া ও করুণার কারণে তাঁর প্রবর্তিত প্রেমভক্তিস্বরূপ বৈষ্ণব ধর্ম মানব সমাজে এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, বাঙলার যে কোন স্থানে পদাবলী কীর্তন, নাম কীর্তন ও অষ্টকালীন লীলা কীর্তন শুরু করার পূর্বে এই মহামানব চৈতন্যদেবের উদ্দেশে গৌরচন্দ্রিকা কীর্তন করা হতো। কেননা তিনি সবার হৃদয়ে আসন করে নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ড. দীনেশ চন্দ্র সেন *Chaitanya and his Companions* গ্রন্থে বলেছেন– 'From Orissa to Manipur through a large tract of country covering an area of about 224750 sq.miles Chaitanya was now worshipped in temples, while the streets of cities and village-paths resounded with his praises in popular songs. The country was full of Rādhā-Kṛṣṇa songs, but in a Kirtana, no Rādhā-Kṛṣṇa song could be introduced without a preliminary song in honour of Gaurachandra (Chaitanya) and this preliminary song was called Gaurachandrikā. The love songs of Rādhā-Kṛṣṇa, which had a deep spiritual significance long before the advent of Chaitanya, became now thoroughly idealized and bore another beautiful Symbolic meaning in which the love- ecstasies of Chaitanya formed a charming background. In the midst of the loud muisic of *lambourine and* the shrill clang of cymbals, the Gaurachandrikā sounded the keynote of a new phase of Vaiṣṇavism in which the incidents of Chaitanya's life illustrated in a concrete form the high spiritual philosophy of the sect.'[৩৪]

কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা চৈতন্যদেবের প্রচণ্ডভাবে নিন্দা ও সমালোচনা করতেন। তবুও তিনি তাঁদের নিন্দা সহ্য করে ঈষৎ হাস্য করতেন। বরং তার পরিবর্তে তিনি সেই হতভাগ্যদের প্রেমভক্তি প্রদান করেছিলেন। তাঁদের অপরাধ না নিয়ে বুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তিনি কৃপা প্রদানের জন্য পাত্রাপাত্রের বিচার রাখেননি। এ কারণে তিনি অদ্ভুত ঔদার্য, কারুণ্য ও বদান্য বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন। তিনি স্থাবর-জঙ্গম আদি সকল জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন। [৩৫]

চৈতন্যদেব করুণার অদ্ভুত মহামানব হওয়ার কারণে নির্বিচারে সকলকে প্রেমভক্তি প্রদান করে জগতের মঙ্গল সাধন করেছিলেন। এ বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম দর্শন, যা ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই চৈতন্যদেবের এই অদ্ভুত করুণা লাভের জন্য তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যার দ্বারা মানুষের জীবন পরম কল্যাণময় হতে পারে।[৩৬]

চৈতন্যদেব একজন আদর্শবান ও মহান আচার্য ছিলেন। তিনি আচরণ করে অপরকে শিক্ষা প্রদান করেছেন। যিনি আচরণের মাধ্যমে অপরকে শিক্ষা দান করে থাকেন, তিনিই যথার্থ আচার্য। আচার্য সম্পর্কে *বায়ু পুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে–

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য স্তেন কীর্তিতঃ ॥

অর্থাৎ– যিনি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে অবগত হয়ে অপরের নিকট আচারের মাধ্যমে নিজেকে স্থাপন এবং নিজে শাস্ত্রোপদেশ অনুসারে আচরণ করেন বলে তিনি তত্ত্ববিদ আচার্য হিসেবে কীর্তিত হন। চৈতন্যদেব শুধু অপরকে উপদেশ প্রদান করেননি, নিজ জীবনে আচরণ করেও ব্যবহারিক শিক্ষা দান করেছেন। তিনি কাশীর বেদান্ত সভায় সন্ন্যাসীদেরকে অবনত মস্তকে প্রণাম করেছেন এবং পাদপ্রক্ষালনের স্থানে উপবেশন করে আচরণের মাধ্যমেই শিক্ষা দিয়ে তাঁর বিনয় ধর্মের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।[৩৭]

চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও জীবনকর্ম এবং বাঙালি জাতি, সমাজ, যুগ ও মানুষের প্রতি অবদান সম্বন্ধে ড. আহমদ শরীফ *সাহিত্যতত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্যে* বলেছেন– "বাংলাদেশের ইতিহাসে চৈতন্যদেব একজন চিন্তানায়ক, সমাজনেতা, শাস্ত্র-সংস্কারক, ধর্ম-প্রবর্তক, যুগস্রষ্টা অসামান্য পুরুষ। চৈতন্য ধর্মান্দোলনের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আমরা গ্রাম্যতাদুষ্ট-ভাষায় রচিত পাঁচালী সাহিত্যের পাশে ভাবে-অনুভবে চিন্তা ও চেতনার সূক্ষ্মতায় মনন-উৎকর্ষে অঙ্গে-অন্তরে, ভাষায়-ভঙ্গিতে বৈষ্ণব গীতিকবিতা বৈশ্বিক সম্পদ হয়ে রয়েছে। বাঙলা ভাষায় সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তামূলক তত্ত্ব গ্রন্থও বৈষ্ণবের দান।"[৩৮]

চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্ত অনুগামী ছিল। চৈতন্যদেবের অসামান্য রূপে ও গুণে তাঁরা মোহিত হতো। এ প্রসঙ্গে ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন–'প্রেম একবার মাত্র এই পৃথিবীতে রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল, সে বঙ্গদেশে।' তিনি তাঁকে প্রমূর্ত প্রেম হিসেবেই জানতেন। তাই কবি সতেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।' কেননা চৈতন্যদেব তাঁর প্রেমধর্ম দ্বারা জগতের সর্বশ্রেণির মানুষকে কাছে টেনেছেন, সমান মর্যাদা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন।
ড. আহমদ শরীফ *সাহিত্যতত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্যে* বলেছেন–'শ্রীচৈতন্যের এ প্রেমবাদই আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যের উৎস ও ভিত্তি। এ প্রেমবাদই মধ্যযুগের সাহিত্যের ভাব-ভাষা-ভঙ্গি-বিষয়ের গতানুগতিকতামুক্ত গীতিকবিতা রচনা সম্ভব হয়েছিল।'[৩৯]

আজ সারা বিশ্বে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রচারিত হচ্ছে এবং সমগ্র মানব সমাজ তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। তাই সমাজসংস্কার ও মানবকল্যাণে চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও শিক্ষার বিকল্প নেই। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি,

ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রেমধর্ম, মানবকল্যাণ, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও শিক্ষা বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং মানবকল্যাণে অতীব জরুরী, যা আধুনিক নীতিবিবর্জিত, তমসাচ্ছন্ন সমাজের আলোকবর্তিকা হিসেবে শান্তির পথপ্রদর্শক হতে পারে। একারণেই মানবতার মূর্ত প্রতীক, সাম্য ও শান্তির পথপ্রদর্শক ও বিশ্বমানব কল্যাণে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিকনির্দেশক হিসেবে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও দর্শনকে অভিসন্দর্ভের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটি ৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম হলো– শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে বাংলার সামাজিক অবস্থা। এ অধ্যায়ে তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় অবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে বাংলার শাসন ব্যবস্থা, নারী জাতির শিক্ষা, বিবাহ, নারী জাতির লজ্জাহরণ, খাদ্য, পোশাক, যুদ্ধপ্রণালী, সাহিত্য, ধর্ম-কর্ম, নীতি ও আদর্শ, বর্ণাশ্রমপ্রথা প্রভৃতি বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।
দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়– শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী। এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব থেকে শুরু করে অপ্রকট পর্যন্ত তাঁর জীবনের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনদর্শন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এখানে তাঁর দর্শনের বৈশিষ্ট্য, দর্শনতত্ত্বের কাঠামো, পঞ্চভক্তিরসের সাধনা, রাগানুগা ভক্তি সাধনের শিক্ষা, চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন, ব্যবহারিক জীবনে চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও শিক্ষা দৃষ্টান্তসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনার বিষয় হলো– শ্রীচৈতন্যদেবের সমাজসংস্কার ও সমাজকল্যাণ। এখানে চৈতন্যদেবের সমাজসংস্কার, জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্য চৈতন্যদেবের গণ-আন্দোলন, নব মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা, সমাজের দলিত-পতিতদের উদ্ধারের মাধ্যমে চৈতন্যদেবের সমাজসংস্কার ও সমাজকল্যাণ, চৈতন্যদেবের সমাজ সংস্কার ও সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত দ্বারা আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো– শ্রীচৈতন্যদেবের মানবতাবাদ। এ অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের সর্বজীবে সাম্য দর্শন, সমাজবিপ্লব ও গণ-আন্দোলনে চৈতন্যদেব, চৈতন্যদেবের মানবপ্রেমের প্রকাশ, চৈতন্যদেবের প্রীতিধর্মে বাঙালির মানবতাবোধ, হিন্দু সমাজের ত্রাণকর্তারূপে চৈতন্যদেবের ভূমিকা ও চৈতন্যদেবের মানবতাবাদ সম্পর্কে দৃষ্টান্ত সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ প্রচারে ইসকনের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের দর্শন, আদর্শ ও শিক্ষা প্রচারের জন্য ইসকন যেসকল গ্রন্থ প্রকাশ এবং প্রচার কার্যক্রম করছে, সে বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া ইসকনের গ্রন্থপ্রচার কার্যক্রম, ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চৈতন্যদেবের আদর্শ প্রচারে বহু মন্দির নির্মাণ ও এর শাখাসমূহ স্থাপন, গুরুকুল বিদ্যালয় স্থাপন, সেমিনারের আয়োজন, Mayapur Institute, Daily free meals, Food

for life, Bhaktivedanta Accademy for Culture and Education (BACE). ভক্তিবেদান্ত ন্যাশনাল স্কুল প্রভৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপসংহারে গবেষণাকর্মের সার্বিক আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এর পর এ গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জির তালিকা সংযোজন করা হয়েছে। সবশেষে বলতে পারি যে, চৈতন্যদেবের আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণের দ্বারা সমাজে অনৈক্য দূর হোক, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূরে চলে যাক, সমাজের ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হোক ও সমাজের অবহেলিত সকল মানুষ তার অধিকার ফিরে পাক এবং সমাজে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। সকল শ্রেণির পাঠকের চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও মানবকল্যাণচেতনা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের দ্বারা মানবকল্যাণের পথ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। গবেষণাকর্মের এই প্রত্যাশা।

তথ্যনির্দেশ

১. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, ৬ষ্ঠ সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ২৬০

২. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভাগবত*, ১ম স্কন্ধ, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মুম্বাই, ভারত, ২০তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০১৯, পৃ. ৭৫-৭৬

৩. ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'ধর্মসমন্বয়, চৈতন্যদেব ও মানবমুক্তি', *চৈতন্য প্রভা*, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫১৬তম আবির্ভাব মহোৎসব সংখ্যা-১৪০৮, সম্পাদক, সঞ্জীব সাহা, শ্রীচৈতন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংঘ, জগ. হল, ঢা. বি. মুদ্রণে-উদয় সাইন স্পার্ক, ঢাকা পৃ. ১১-১২

৪. ঐ, পৃ. ১২-১৩

৫. ড. সৌমিত্র শেখর, 'শ্রীচৈতন্যদেবের রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব এবং পদাবলী', *চৈতন্য প্রভা*, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫১৬তম আবির্ভাব মহোৎসব সংখ্যা-১৪০৮, সম্পাদক, সঞ্জীব সাহা, শ্রীচৈতন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংঘ, জগ. হল, ঢা. বি. মুদ্রণে উদয় সাইন স্পার্ক, ঢাকা, পৃ. ১৪-১৮

৬. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪২২ পৃ. সংস্করণ অভিমত

৭. ঐ, পৃ. ৩-৪

৮. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত*, আদিলীলা, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, দ্বাদশ সংস্করণ, ২০১৬,পৃ. ঝ

৯. ঐ, পৃ. চ

১০. ঐ, পৃ. ছ

১১. ড. সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়, *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, কার্তিক, ১৪২৪, সম্পাদকীয় মন্তব্য- পৃ. র

১২. ঐ, সম্পাদকীয় মন্তব্য- পৃ. iv

১৩. ঐ, গ্রন্থ ও গ্রন্থকার- পৃ. v-vii

১৪. ঐ, গ্রন্থ ও গ্রন্থকার- পৃ. xvi

১৫. ঐ, গ্রন্থ ও গ্রন্থকার- পৃ. xxiv

১৬. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা*, ঐ, পৃ. ২৮৫

১৭. ঐ, পৃ. ৩২৪-৩২৫

১৮. ঐ, পৃ. ৪২৪-৪২৫

১৯. ঐ, পৃ. ৪২৬-৪২৭

২০. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত*, আদিলীলা, পৃ. মুখবন্ধ খ-গ

২১. ঐ, পৃ. ভূমিকা ঢ-ন

২২. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, দ্বাদশ সংস্করণ, ২০১৩, প্রস্তাবনা পাতা, আ-ই

২৩. ঐ, প্রস্তাবনা পাতা উ-ঊ

২৪. ঐ, প্রস্তাবনা পাতা এ-ক

২৫. ঐ, প্রস্তাবনা পাতা ছ-জ

২৬. ঐ, প্রস্তাবনা পাতা- ঝ

২৭. ড. সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়, *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ৫০৭

২৮. ঐ, পৃ. গ্রন্থ ও গ্রন্থকার-xxiii

২৯. শ্রীমৎ গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজ কর্তৃক সংকলিত *শ্রীচৈতন্যের দয়া*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২ পৃ. ঢ-ণ

৩০. শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, *শ্রীশ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকং*, শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডেশ্বরী গ্রন্থালয়, মথুরা, ভারত, ২য় প্রকাশ, গৌর পূর্ণিমা, ১৪২৫, পৃ. ৩

৩১. শ্রীমৎ গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজ, *শ্রীচৈতন্যের দয়া*, পৃ. দ-ধ

৩২. শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্ চ*, শ্রীচৈতন্য মঠ, মায়াপুর, নদীয়া, ৩য় সংস্করণ, ২রা জুলাই, ১৯৯২, পৃ. ১০

৩৩. শ্রীমৎ অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর রচিত *শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৬, পৃ. ৩৩৩

৩৩. Dr. Dinesh Chandra Sen, *Chaitanya and his Companions*, Published by Aruna Prakashan, kolkata, 1st Aruna Prakashan edition, October 2011, Page. 1-2

৩৫. শ্রীমৎ গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজ, *শ্রীচৈতন্যের দয়া*, ঐ, পৃ. ভূমিকা-য

৩৬. ঐ, পৃ. স-ঢ়

৩৭. ঐ, পৃ. ৯-১০

৩৮. ড. আহমদ শরীফ, *সাহিত্যতত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্য*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ৩য় প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ২০১৯, পৃ. ১৭২

৩৯. ঐ, পৃ. ১৮৯-১৯০

প্রথম অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে বাংলার সামাজিক অবস্থা

বাংলা ও বাঙালি জাতির ইতিহাস:

কালের ইতিহাস:

কালের প্রবাহে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাম ও ভৌগোলিক সীমা পরিবর্তিত হয়ে আসছে। সেই সাথে সেখানকার ভাষাভাষী মানবের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এটাই চিরন্তন সত্য।

সমগ্র বাংলাদেশের কোন সুনির্দিষ্ট নাম পূর্বে ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন এলাকা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন–উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, বঙ্গাল প্রভৃতি ছিল। পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি ছিল। এছাড়া উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন সময়ে ঐসকল দেশের ভৌগোলিক সীমা বৃদ্ধি ও হ্রাস পেয়েছে। বাংলা বা বাঙ্গালা এই নামে সর্বপ্রথম মুসলিম যুগে সমগ্র দেশ একত্রে পরিচিতি লাভ করে। এই বাংলা হতেই ইউরোপীয়গণের ' বেঙ্গলা' (Bengala) ও 'বেঙ্গল' (Bengal) নামের সৃষ্টি। মুঘল যুগেও 'বাঙ্গালা' চট্টগ্রাম হতে গহি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন লিপি ও গ্রন্থের মধ্যে বঙ্গ ও বঙ্গাল দুটি দেশের একত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী ও তার পূর্বকাল থেকেই বঙ্গ ও বঙ্গাল দুটি পৃথক দেশ ছিল। কালক্রমে বঙ্গাল দেশের নাম থেকেই সমগ্রদেশের বাংলা নামকরণ হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিবাসিগণকে বাঙ্গাল নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আধুনিক যুগে গৌড় ও বঙ্গ-এ দুটি মিলে সমগ্র বাংলাদেশের সাধারণ নামস্বরূপ হিসেবে পরিচিত হয়েছে। [১]

বাংলাদেশের সীমা প্রসঙ্গে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন–"যে স্থানের অধিবাসীরা বা তাহার অধিক সংখ্যায় লোক সাধারণত বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে, তাহাই বাংলাদেশ বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন।" সীমানা বিষয়ে তিনি মনে করেন বর্তমান কালের বাংলাদেশ ও পশ্চিবঙ্গ এবং আসামের অন্তর্গত কাছাড় ও গোয়ালপাড়া, বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া, সিংহভূম ও সাঁওতাল পরগণার কিছু অংশ এবং ত্রিপুরাও হচ্ছে বাংলার অংশ।[২]

ড. নীহাররঞ্জন রায় বাংলা সম্পর্কে বলেছেন– বঙ্গদেশ বা বাঙলাদেশ মুঘল আমলে সুবা বাঙলা নামে পরিচিত ছিল। Gastaldi (1560), Hondivs (1613), Hernann moll (1710), Van den Broucke (1660), Izzak Tirion (1730), F,de Witt (1726) প্রভৃতির নক্শায় মধ্যযুগের ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণীতে সবখানে এই দেশের নাম Bengala। মধ্যযুগের বাঙলা-বাঙ্গালা-Bengal একই নাম। বাঙ্গালা- Bengala-Bangala-বাঙলা নাম বর্তমান বঙ্গদেশের প্রায় সমস্তটারই। প্রাচীন বাঙলাদেশ যে-সব জনপদে বিভক্ত ছিল বঙ্গ ও বাঙ্গাল তার দুটি বিভাগ মাত্র।[৩]

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়-এর উল্লেখ রয়েছে। পতঞ্জলিও গৌড়দেশের সাথে পরিচিত ছিলেন। 'ভবিষ্য-পুরাণে'র মতে গৌড়দেশের উত্তর সীমা হচ্ছে পদ্মা এবং দক্ষিণ সীমা বর্ধমান। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের জৈন গ্রন্থের মতে- বর্তমান মালদহ জেলার প্রাচীন লক্ষ্মণাবতী ছিল গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত। সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে লক্ষ্মণাবতী নগরই হচ্ছে গৌড় এবং এই গৌড় রাঢ় দেশ। মোটামুটিভাবে মুর্শিদাবাদ-বীরভূমই গৌড়জনপদের আদি কেন্দ্র। পরবর্তীকালে মালদহ ও বর্ধমান এর সঙ্গে মিলিত হয়। বিভিন্ন সময়ে গৌড়ের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য বিভিন্নভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। ভারতীয় ঐতিহাসিক ও ধর্মপাল-দেবপালের শাসনামল থেকে জানা যায় পঞ্চগৌড়ের কথা। বাঙলা মানেই হচ্ছে গৌড়। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' থেকে জানা যায় যে–শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়ের রাজা এবং কর্ণসুবর্ণ ছিল রাজধানী। পাল রাজারা 'গৌড়েশ্বর' উপাধি দ্বারা ভূষিত হতেন। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে–পশ্চিমবঙ্গ বলতে যা বোঝা যায় সেটিই ছিল প্রাচীন গৌড়জনপদ। মনে হয় গৌড় বলতে একসময় সমগ্র বাংলাদেশকে বুঝানো হতো।

অষ্টম শতক থেকে পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন, বঙ্গ ও গৌড় এই তিনটি জনপদ সমগ্র বাংলাদেশের সমার্থক হয়ে ওঠে। রাজা শশাঙ্ক, পালরাজারা ও সেনরাজারা গৌড়েশ্বর উপাধি দ্বারা ভূষিত হতেন। 'রাজতরঙ্গিণী' ও 'হর্ষচরিত' এবং নবম শতকের ভিন্ প্রদেশী লিপিগুলো তার প্রমাণ। বাঙলার বাহিরে বাঙালি গৌড়ীয় বা গৌড়বাসী বলে পরিচিত হয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের কালে নবাব শায়েস্তা খাঁ সুবা বাঙলার যে অংশে শাসন করতেন, তাকে গৌড়মণ্ডল বলা হতো। সমগ্র বাঙলাদেশের বঙ্গ নাম নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল আকবরের আমলে, যে সময়ে সমগ্র বাঙলাদেশে সুবা বাঙলা নামে পরিচিত হয়েছিল। তবে ইংরেজদের সময়ে বাঙলা নাম পরিপূর্ণ পরিচয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।[৪]

বাঙালি জাতির ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। মহান মহান রাজারা বাঙালির নেতৃত্ব প্রদান করেছেন, যা আজ ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। বীর বাঙালি গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক কান্যকুব্জ থেকে কলিঙ্গ পর্যন্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একইভাবে ধর্মপাল ও দেবপাল তাঁদের রাজ্যকে পঞ্চনদ অবধি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাল-সম্রাট ধর্মপালকে আর্যাবর্তের সকল রাজন্যবর্গ সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতেন। বাঙালি মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান ছিল। বিশ্বখ্যাত নালন্দা ও বিক্রমশীল বিহার বাংলার বাইরে অবস্থিত হলেও চারশত বছর পর্যন্ত বাঙালির রাজশক্তি, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও ধর্মীয় চিন্তা চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

বাণিজ্য-সম্পদেও বাঙালি এশ্বর্যশালী ছিল। বাংলার সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্প সমূহ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালির দান অপরিসীম। মহাকবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ কাব্য, যা মাধুর্য রসাশ্রিত কোমল কান্ত পদাবলী, সংস্কৃত সাহিত্যে মহামূল্যবান মণির ন্যায় অনন্তকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে। বিভিন্ন সাহিত্য রচনা করে জগতে যারা কীর্তিমান হিসেবে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাঁরা হলেন– বল্লাল সেন, ভবদেবভট্ট, হলায়ূধ, চন্দ্রগোমিন, সর্বানন্দ, গৌড়পাদ, চক্রপাণিদত্ত, শ্রীধরভট্ট, জীমূতবাহন, সন্ধ্যাকর নন্দী, ধোয়ী, উমাপতিধর, অভিনন্দ ও গোবর্ধনাচার্য। এঁরা ছিলেন বাংলার সিদ্ধাচার্য। তাঁদের রচনাকর্ম সর্বত্র সমাদৃত ছিল।[৫]

শিল্পজগতেও বাঙালির স্থান উচ্চ শিখরে ছিল। বাঙালি সোমপুরে যে বিহার ও মন্দির নির্মাণ করেছিলেন সেটিই উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপত্য শিল্পের। রাষ্ট্রীয় সীমানার দ্বারা নয় বরং ভাষাগত দিক দিয়েই বাঙালির পরিচয়। ভাষার ঐক্য ও দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে বসবাস করার ফলে বাঙালি একটি বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হতে পেরেছে। ধর্মীয় ভাবধারা ও সামাজিক প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও শুধু এ দুটি কারণে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের আধিবাসী থেকে পৃথক হয়ে বাঙালি একটি বিশিষ্ট জাতি হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে এক রাজ্যের অধীনে এবং পাশাপাশি বসবাস করার কারণে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তারা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আলাদা হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করেছিল। খাদ্য-খাবার, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, তান্ত্রিক মতবাদ, পূজা-পার্বণ ও ভাষাসহ নানা বিষয়ে তাদের মধ্যে মিল ছিল। এগুলি একক জাতি গঠনে তাদের একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। এই ঐক্যমতের কারণেই বাঙালি একটি জাতিতে পরিণত হয়েছিল। এভাবেই বাঙালি জাতি সত্তার সৃষ্টি হয়।[৬]

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পর্যালোচনা করে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার প্রতিচ্ছবি পাই। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো–

রাজনৈতির অবস্থা:

বাংলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজন্যবর্গ রাজ্য পরিচালনা করেছেন। রাজা শশাঙ্ক গৌড়েশ্বর ছিলেন। ক্রমপর্যায়ে পাল রাজগণ, সেনরাজগণও প্রচণ্ড প্রতাপের সাথে গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করে রাজ্য শাসন করেছেন। এরপর নানা যুদ্ধ বিগ্রহ, হত্যা, লুণ্ঠন ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে রাজাদের পালা বদল হয়েছে। শুধু ক্ষমতা লোলুপ হয়ে রাজসিংহাসন দখল করার জন্য বিভিন্ন কলা-কৌশল অবলম্বন করে রাজপদে আসীন হয়েছিলেন। বাংলার সিংহাসনে বেশিদিন কেউ অধিষ্ঠিত হতে পারেননি। তবে এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ গৌরবান্বিত বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তাঁর সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে আততায়ীদের দ্বারা বেশ কয়েকজন সুলতান নিহত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক এই অস্থিতিশীলতার মধ্যে তিনি রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। বহু রাজ্য তিনি জয় করে রাজ্যের অধীনস্থ করে একক আধিপত্যে দীর্ঘ ২৬ বৎসর এই বাংলায় শাসন করেছেন।

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে নবাব হোসেন শাহ সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে তিনি বাংলার রাজধানী গৌড়ে রাজসিংহাসনে আসীন থেকে রাজ্য পরিচালনা করেছেন। সেই কারণে চৈতন্যদেবের জীবনীকারেরা তাঁদের বিভিন্ন রচনায় নবাব আলাউদ্দিন হোসেন শাহের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর নাম বহুলভাবে প্রচারিত হয়েছে বিভিন্ন লেখনীতে। এসকল কারণে তিনি বাঙালির স্মৃতিপটে চিত্রের ন্যায় অঙ্কিত হয়ে আছেন।[৭]

স্টুয়ার্টের মতে- হোসেন শাহ আরবের মরু ভূমি হতে বাংলায় এসেছেন।[৭(ক)] কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারতে বর্ণনা করেছেন যে, নবাব হোসেন শাহের দেহ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে– তিনি বাঙালি ছিলেন।[৭(খ)] হোসেন শাহের পূর্বে বাংলার সুলতান ছিলেন হাবশী সুলতান মুজাফফর শাহ। তিনি তাঁর প্রভুকে হত্যা করে রাজসিংহাসন দখল করেছিলেন। আবার এই মুজাফফর শাহের উজীর ছিলেন নবাব হোসেন শাহ। তবে নবাব হোসেন শাহ নানা কূট কৌশল ও ষড়যন্ত্রের মধ্যদিয়ে সুলতান মুজাফফর শাহকে হত্যা করে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এইভাবে জঘন্য পরিস্থিতির মাধ্যমে বাংলার রাজসিংহাসনের পালা বদল হয়েছিল। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি মারাত্মক উদ্বেগজনক ছিল।

তবে নবাব হোসেন শাহ বিচক্ষণ ও দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর হতে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যে কোন এক সময়ে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[৮] তবে তিনি অমাত্যদের লোভের বশবর্তী করে সিংহাসনে বসেছিলেন। শর্ত অনুসারে তিনি রাজা নির্বাচিত হবার পরে অমাত্যরা গৌড় নগরের মাটির উপরিভাগের সমস্ত ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে ছিলেন এবং তিনি নিজে মাটির নীচের সম্পত্তি লুণ্ঠন করেছিলেন। নবাব নিজে ১৩০০ সোনার থালা লুট করে নিয়েছেন। কিন্তু অমাত্যদের লুণ্ঠন নবাবের নিষেধ সত্ত্বেও বন্ধ না হলে তিনি (নবাব) বারো হাজার লুণ্ঠনকারীকে বধ করেন। এই রকম বীভৎস অবস্থার কারণে রাজ্যের সর্বত্র আতঙ্ক ও অস্থিরতা বিরাজ করেছিল। নবাব হোসেন শাহ কূটনীতি ও হীন চাতুর্য প্রয়োগে সুদক্ষ ছিলেন।

নবাব হোসেন শাহ রাজ প্রাসাদ রক্ষার জন্য বিশ্বস্ত একদল রক্ষিবাহিনী গঠন করেন। তাঁর শত্রু হাবশীদের রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেন। তিনি সৈয়দ, মোঘল ও আফগানদের উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। যে সকল পাইক পূর্ববর্তী সুলতানদের হত্যাযজ্ঞে জড়িত ছিল, তিনি তাঁর সামরিক দক্ষতা দ্বারা তাদের দলকে ভেঙ্গে চূর্ণবিচুর্ণ করে দেন।[৯]

১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হোসেন শাহ দিল্লীর সুলতান সিকন্দর শাহ লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। সিকন্দর লোদীও হোসেন শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষের সৈন্যরা সম্মুখ সমরে যুদ্ধের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু রাজনৈতিক কূটকৌশলে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়। সন্ধির শর্তানুসারে কেউ কারোর শত্রুকে প্রশ্রয় দিবেন না। দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধির কারণে বাঙলার নবাবের সম্মান ও গৌরব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।[১০]

বাংলার সুলতান হোসেন শাহ রাজসিংহাসনে আসীন হয়ে মুদ্রায় 'কামরূপ-কামতা-জাজনগর-উড়িষ্যা বিজয়ী' বলে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং জয়লাভ করার জন্য সর্বাত্মকভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যান। সংগ্রামের

ফলশ্রুতিতে তিনি কয়েক বছরের মধ্যে কামতাপুর ও কামরূপ রাজ্য জয়লাভ করতে সক্ষম হন। আসাম বুরঞ্জী'র মত অনুসারে কোচের রাজা বিশ্বসিংহ বাংলার নবাব সুলতান হোসেন শাহের অধীনস্থ আটগাঁওয়ের শাসনকর্তা "তুরকা কোতয়াল" কে যুদ্ধে পরাজিত করে এবং তাকে নিহত করে কামতা রাজ্য পুনরধিকার করেন।[১১]

আসাম রাজ্যটি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পরিপূর্ণ ছিল। আসাম জয়ের জন্য সুলতান হোসেন শাহ ২৪০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সহ আসাম আক্রমণ করেন। ফলে সহজেই সুলতান হোসেন শাহ সমতল রাজ্য দখল করেন। পুত্রের উপর যুদ্ধের ভার দিয়ে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলে, পার্বত্য অঞ্চলে লুকিয়ে থাকা আসামের রাজা সেই সুযোগে হোসেন শাহের পুত্রকে বধ করেন এবং বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন। তাই দেখা যায়– বাংলার নবাবের আসাম বিজয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।[১২] তৎকালীন সময়ে উড়িষ্যার রাজা ছিলেন পুরুষোত্তমদেব। তিনি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজা প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি বাংলার সুলতান হোসেন শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। প্রতাপরুদ্রের সাথে বাংলার সুলতানের যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে হয়েছিল।

সুলতান হোসেন শাহের মুদ্রা ও শিলালিপি 'রিয়াজ-উল-সলাতীন' এবং ত্রিপুরার 'রাজমালা'র বর্ণনা অনুযায়ী বাংলার নবাব হোসেন শাহ উড়িষ্যা জয় করেছিলেন। কিন্তু উড়িষ্যার নানা তথ্যমতে প্রতাপরুদ্রই সুলতান হোসেন শাহকে পরাজিত করেছেন।[১৩] রাজা প্রতাপরুদ্রের দীক্ষাগুরু জীবদেবাচার্যের রচিত 'ভক্তিভাগবত' এর বর্ণনানুসারে প্রতাপরুদ্র সুলতান হোসেন শাহকে পরাজিত করেছেন। প্রতাপরুদ্রের তাম্রশাসন ও শিলালিপির বর্ণনা অনুযায়ী বাংলার সুলতান হোসেন শাহ প্রতাপরুদ্রের নিকট পরাজিত হয়ে ক্রন্দন করেছিলেন এবং জীবন রক্ষার্থে কম্পিত কলেবরে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত কটকরাজবংশাবলী ও উড়িয়া ভাষায় রচিত 'মাদলা পাঞ্জী'র বর্ণনা মতে সুলতান হোসেন শাহ উড়িষ্যার রাজার অনুপস্থিতিতে আক্রমণের দ্বারা উড়িষ্যার রাজধানী কটক ও পুরী জয় করেন এবং পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরের বহু দেবমূর্তি নষ্ট করে চরম নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার পরিচয় দেন। প্রতাপরুদ্র প্রবল বিক্রমে প্রতিশোধের জন্য চউমুহিতে হোসেন শাহের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে হোসেন শাহ মান্দারণ দুর্গে আশ্রয় নিলে প্রতাপরুদ্র মান্দারণ দুর্গে অবরোধ করেন। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে হোসেন শাহের উড়িষ্যা বিজয়ের মনোভিলাষ সম্যক রূপে ব্যর্থ হয়েছিল।

যুদ্ধ জয়ের দাবী দু'পক্ষেরই দেখা যায়। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত *চৈতন্যভাগবত*, কবিকর্ণপুর রচিত *চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক* এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত *চৈতন্যচরিতামৃত* থেকে জানা যায় যে–বাংলার সুলতান হোসেন শাহ উড়িষ্যার রাজ্য আক্রমণ করে বহু মন্দির ও দেব বিগ্রহ ভেঙ্গেছিলেন। সুলতান হোসেনের সঙ্গে

উড়িষ্যা রাজার যুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরে চলছিল। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করে জগন্নাথ পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই সময়ে বাংলার নবাব ও উড়িষ্যার রাজার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ ছিল।

১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে শ্রীচৈতন্যদেব বাংলা ভ্রমণ করে পুরী প্রত্যাবর্তনের পরে সুলতান হোসেন শাহ পুনরায় উড়িষ্যা অভিযান করেন।[১৪] তাহলে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ১৪৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বনাম উড়িষ্যা রাজার যুদ্ধ শুরু হয়। মাঝখানে ১৫১২ খ্রিস্টাব্দ- ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতি ছিল। তবে ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে নবাব হোসেন শাহ পুনরায় অভিযান শুরু করেন। দীর্ঘদিন ধরে রাজা যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকার কারণে রাজ্যের অর্থ ও সৈন্য যেমন ক্ষয় হয়, তেমনি রাজ্যে সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা পরিপূর্ণভাবে সম্ভব হয়নি।[১৫]

ত্রিপুরা রাজাদের ইতিহাস নিয়ে রচিত 'রাজমালা' ২য় খণ্ড নামক বাংলা গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায় যে– বাংলার নবাব হোসেন শাহ ও ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ বিগ্রহ চলছিল। ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা ধন্যমাণিক্য হোসেন শাহের বহু অঞ্চল দখল করেছিলেন। কিন্তু নবাব হোসেন শাহ বীর বীক্রমে যুদ্ধ পরিচালনা করে ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ত্রিপুরার অনেক অঞ্চল নিজ শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত মহাভারতের বর্ণনানুসারে বাংলার সুলতান হোসেন শাহ ত্রিপুরা রাজ্য জয় করেছিলেন। শ্রীকর নন্দী তাঁর রচিত মহাভারতে উল্লেখ করেছেন সুলতান হোসেন শাহের বিশ্বস্ত ও অন্যতম সেনাপতি ছুটি খান ত্রিপুরার দুর্গ আক্রমণ করেছিলেন। ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজ্য সুলতান হোসেন শাহের রাজশক্তির কাছে পরাজিত হয়ে বাংলার সামন্ত হয়েছিল।

সুলতান হোসেন শাহ বিহার রাজ্যের অনেক অংশ জয় করেছিলেন। দিল্লীর সুলতান সিকন্দর শাহ লোদীর মৃত্যুর পর পূর্ববর্তী শর্ত ভঙ্গ করে বাংলার সুলতান নবাব হোসেন শাহ লোদীর বিহারের প্রতিনিধির সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কারণে শত্রুতা শুরু করেন।

গোয়ার পুর্তুগীজরা বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন বাংলার সুলতান নবাব হোসেন শাহের আমলে। পুর্তুগীজরা বাংলাদেশে বাণিজ্য আরম্ভ করার জন্য ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে ৪টি জাহাজ প্রেরণ করেছিল। একাধিকবার লুণ্ঠনের ফলে বাংলার রাজধানী গৌড়ের সৌন্দর্য ম্লান হওয়ার কারণে এবং বাংলার সুলতান হোসেন শাহ নিজের নিরাপত্তার জন্য বাংলার রাজধানী গৌড় হতে একডালায় স্থানান্তরিত করেন।[১৬]

তবে সুলতান হোসেন শাহ রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তিনি স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে রাজ্য পরিচালনা করেছেন বিধায় বাংলার রাজ সিংহাসনে দীর্ঘদিন একচ্ছত্রভাবে আসীন ছিলেন। এর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর শাসন থেকে। তিনি মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায় থেকে মন্ত্রী, অমাত্য ও কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। যোগ্যতার ভিত্তিতেই তিনি এরূপ বিবেচনা করেছেন। তাঁর নিযুক্ত মন্ত্রী ও অমাত্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের বর্ণনা করা হলো–শ্রীপাদ সনাতন-যিনি পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেবের একজন বিশ্বস্ত পার্ষদ ছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্মের ষড়ু-গোস্বামীদের অন্যতম ছিলেন। এই সনাতন

ছিলেন বাংলার সুলতান হোসেন শাহের মন্ত্রী ও সভাসদ। তাঁর রাজকার্যে উপাধি ছিল 'সাকর মল্লিক'। সনাতনের অনুজ ভ্রাতা ছিলেন রূপ। নবাব হোসেন শাহ রূপকে মন্ত্রী পদে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং 'দবীর খাস' উপাধি প্রদান করেছিলেন। এছাড়া আরো অনেক হিন্দুকে তিনি বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বল্লভ, শ্রীকান্ত, দামোদর, কবিরঞ্জন, যশোরাজ খান, চিরঞ্জীব সেন, মুকুন্দ বৈদ্য, কেশব ছত্রী খান প্রভৃতিকে উচ্চপদে আসীন করেছিলেন।[১৭]

নাবব হোসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন পরাগল খাঁ। তাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রথম বাংলাভাষায় মহাভারত রচনা করেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকরনন্দী বাংলাভাষায় মহাভারত রচনা করেন।[১৮] হোসেন শাহ বাংলার সুলতানদের মধ্যে দক্ষ প্রশাসক, বিচক্ষণ ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজা ও জ্ঞানীগুণী বর্গের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু তাঁর শাসনামলে রাজ্যে সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই ছিল। তাঁর শাসনামলে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ মহামারী আকার ধারণ করেছিল। যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে রাজ্যে অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক থাকার কারণে জনসাধারণকে সেই মহামারীর প্রকোপ ভোগ করতে হয়েছিল।[১৯]

বাংলার শাসন ব্যবস্থা :

বাংলার শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সুলতানদের প্রাধান্য ও প্রভাব লক্ষ করা যায়। সুলতানরা সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার সমসাময়িক সাহিত্য, মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বর্ণনা করেছেন– সুলতানগণ রাজপ্রাসাদে বসবাস করতেন। রাজপ্রাসাদের মধ্যেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা দরবার কক্ষে সুলতান তাঁর পাত্র-মিত্র নিয়ে বৈঠক করতেন। সুলতানী আমলে বাংলায় এক শ্রেণির রাজকর্মচারীদের 'ছত্রী' উপাধি ছিল। সুলতানদের চিকিৎসক ছিলেন হিন্দু ধর্মের এক শ্রেণির বৈদ্য জাতীয় সম্প্রদায়। তাদের উপাধি ছিল 'অন্তরঙ্গ'। সুলতানদের সভাপণ্ডিত ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু লোক। সুলতানদের ক্রীতদাসও ছিল।

সুলতানের পরই যে সকল রাজ পুরুষগণ ছিলেন, তাদের 'আমীর' হিসেবে সম্বোধন করা হতো। যেমন– সভাসদ, অমাত্য ইত্যাদি। সিংহাসনে আরোহণ করার ক্ষেত্রে এই 'আমীর' দের অনুমোদনের প্রয়োজন হত। সুলতানদের সাম্রাজ্যে বিশিষ্ট পদে যাঁরা আসীন ছিলেন তাঁদের 'উজীর' অভিধায় অভিহিত করা হতো। যুদ্ধকালীন সময়ে রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে যেসব শাসনকর্তা দায়িত্বে থাকতেন, তাদের 'লস্কর-উজীর' বলে গণ্য করা হতো।[২০]

সুলতানদের প্রধানমন্ত্রীকে 'খান-ই-জহান' উপাধিতে ভূষিত করা হতো। এছাড়া বিভিন্ন রাজপদে যেমন-মন্ত্রী, অমাত্য ও পদস্থ রাজকর্মচারিগণের বিভিন্ন উপাধি ছিল। যেমন- 'খান মজলিস', 'মজলিস-অল-আলা', 'মজলিস-আজম', 'মজলিস-অল-মুআজ্জম' প্রভৃতি। বাংলার সুলতানদের সচিবকে বলা হতো 'দবীর' এবং প্রধান সচিবকে

বলা হতো 'দবীর-ই-খাস'।[২১] বাংলা তখন বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। এই বিভাগকে 'ইকলিম' বলা হতো। এর আবার 'অর্‌সহ' নামে উপবিভাগ ছিল। এই উপবিভাগগুলি আবার 'মুলুক' নামে বিভক্ত ছিল। এর শাসনকর্তার নাম ছিল 'মুলুক-পতি' ও অধিকারী।[২২]

এই সময়ে দুর্গ অনুসারে শহরের নামকরণ করা হতো। যেমন-যে শহরে দুর্গ ছিল তাকে 'খিট্‌টাহ্‌' এবং দুর্গহীন শহরকে 'কস্‌বাহ্‌' বলা হতো। সীমান্ত রক্ষার দুর্গকে বলা হতো 'থানা'। এই সময়ে বাংলাকে রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছিল। রাজস্ব দুই প্রকার ছিল 'গনীমাহ' এবং 'খরজ'। বাংলার নবাব সুলতান হোসেন শাহ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে 'খরজ' সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারীকে 'সর-ই গুমাশতাহ' বলা হতো। জলপথে রাজস্ব আদায়ের ঘাটকে 'কুতঘাট' বলা হতো। এছাড়া সুলতানগণ 'হাটকর', 'ঘাটকর', 'পথকর' প্রভৃতি প্রবর্তন করেন।[২৩] রাজ্যের প্রধান হিসেবে যেমন সুলতান ছিলেন তেমনি তিনি সৈন্যবাহিনীরও প্রধান ছিলেন অর্থাৎ সর্বাধিনায়ক হিসেবে ছিলেন। রাজ্যে বিভিন্ন অভিযানকালে অধিনায়কদের 'সর-ই-লস্কর' বলা হতো। অশ্বারোহী বাহিনী, পদাতিক বাহিনী, গজারোহী বাহিনী ও নৌবহর নামে চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল সৈন্যবাহিনী। নৌবহরের প্রধানকে বলা হতো 'মীর বহর'। তবে সৈন্যবাহিনীর শক্তির মূল উৎস ছিল রণহস্তীগুলি। সৈন্যবাহিনীর যিনি বেতন পরিশোধ করতেন তার উপাধি ছিল 'আয়িজ-ই-লস্কর'।[২৪]

এ সময়ে কাজীরা বিচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত হতেন। ইসলামিক বিধান অনুসারে তারা বিচার করতেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাংলার সুলতানই স্বয়ং বিচার করতেন। তবে বিচার ব্যবস্থা বেশ কঠোর ছিল। রাষ্ট্রদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হতো। মুসলিম হয়েও কোন দেবতার নাম উচ্চারণ করলে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হতো। সবকিছু মিলিয়ে বাংলার সুলতানগণ সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন ছিলেন। তবে সুলতানগণ মুসলিমদের পাশাপাশি অনেক যোগ্য হিন্দুদেরকে রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চপদে নিযুক্ত করেছেন।[২৫]

সামাজিক অবস্থা :

বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু-মুসলমান একত্রে বসবাস করে আসছে। ধর্মীয় ও মৌলিক কিছু পার্থক্য থাকলেও ভাষা ও বিভিন্ন বিষয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল ছিল। তবে সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুই ধর্মের লোকেরা পৃথক সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শে জীবন যাপন করত।

মুসলিম সমাজ :

মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মের নাম হচ্ছে 'ইসলাম ধর্ম'। বাংলার পাশাপাশি বিশ্বের সকল স্থানের মুসলমানদের ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। বাংলার তৎকালীন সময়ে নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা নানা প্রকার নির্যাতন সহ্য করত

এবং তাদের নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। কোন প্রকার রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বা নিজ ধর্ম রক্ষা করে উচ্চ পর্যায়ে যাওয়া সম্ভবপর হতো না। তাই বিভিন্ন কারণে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে বাংলায় মুসলিমদের সংখ্যা বেড়ে যায়। তবে কখনো কখনো জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের স্পর্শ করা কোন খাবার খেলে সেই হিন্দুকে জাতিচ্যুত করা হতো। হিন্দু নারীকে স্পর্শ করলে তার পরিবারকে সমাজচ্যুত করা হতো বা পতিত হিসেবে গণ্য করা হতো।

পাল রাজত্বের সময়ে অনেক বৌদ্ধজাতির লোক ছিল। কিন্তু সেন রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব মারাত্মক আকার ধারণ করে। তাদের প্রভাবে বৌদ্ধ সমাজ নিম্নস্তরে পর্যবসিত হয়। সেই কারণে মুসলিম ধর্মের প্রভাব বাংলায় বৃদ্ধি পেলে বৌদ্ধরা মুসলিমদেরকে ত্রাণকর্তা হিসেবে মনে করত। বাংলার সুলতানগণ আদর্শবান, জ্ঞানী-গুণী মুসলমানদেরকে অর্থ ও সম্মান প্রদর্শন করে বিভিন্ন স্থানে ও পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। কালক্রমে ইসলাম ধর্মের অনেক উচ্চশ্রেণির পণ্ডিত বাংলায় আগমন করে ইসলাম ধর্মের প্রসারের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন করেন। ফলশ্রুতিতে আরবী ও ফার্সী সাহিত্যের এবং ইসলাম ধর্মের ক্রমবিকাশ হতে শুরু করে।[২৬]

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মূলনীতি ও আদর্শ ছাড়া অনুমোদিত কিছু সংস্কার ও প্রথা বাংলার মুসলিম সমাজে প্রচলন শুরু হয়। কেননা নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা বিভিন্ন কারণে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে পূর্ববর্তী সংস্কার তারা মনে প্রাণে ত্যাগ করতে পারে নাই। এই সকল ধর্মান্তরিত মুসলিমদের পূর্বের ন্যায় গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি রূপান্তরিত হয়ে মুসলিম পীরের প্রতি ভক্তিতে পরিণত হয়। এদেরকে বলা হয় পঞ্চপীর। যথা- সত্য পীর, মানিক পীর, ঘোড়া পীর, কুম্ভীর পীর ও মদারী পীর। কুম্ভীরের কৃপায় সন্তান লাভ হলে ১ম সন্তান পীরকে দান, বন্ধ্যার পুত্র লাভার্থে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বৃক্ষে সূতা বন্ধন ও মদারীকে ভোজ্য দান প্রভৃতি কুসংস্কার, যা নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের মধ্যে ছিল, তা ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে।

মোল্লা নামের একটি যাজক শ্রেণির সৃষ্টি হয়। তারা হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ন্যায় বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান ও বিবাহের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এখান থেকে তারা অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করত। তারা পীরের ন্যায় ইসলামের অননুমোদিত ধর্ম যাজক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল।

মুসলিম সমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রভাব দেখা যায় হিন্দু সমাজের ন্যায়। কেননা তৎকালীন বাংলার মুসলিম সমাজে কিছু বিশিষ্ট শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছিল। যেমন-আলিম (পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী), শেখ (পীর), সৈয়দ (হযরৎ মুহম্মদের বংশধর)। কাজীরা ছিলেন রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং মোল্লারা জনসাধারণ অপেক্ষা উচ্চস্তরে ছিল।[২৭] এছাড়া তাদের মধ্যে পাঠান, মোঘল, তুর্কী, প্রভৃতি শ্রেণির মুসলিমদের প্রবেশ ঘটে। তবে হিন্দুদের ন্যায় কঠোর জাতিভেদ প্রথা তাদের মধ্যে ছিলনা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের নমনীয় ভাব ছিল।

নিম্নশ্রেণির মুসলিমদের মধ্যে তাদের নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে তাদের বিভাগ ছিল। যেমন- জোলা, গোলা, মুকেরি, কাবাড়ি, পিঠারি, সানাকার, হাজাম, তীরকর, দরজি, কাগজি, কসাই প্রভৃতি।[২৮]

পর্তুগীজ বারবোসা ১৬শ শতকে বাংলার প্রধান একটি বন্দরের সম্ভ্রান্ত মুসলিদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে– মুসলিমরা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সাদা জোব্বা পরতেন। হাতে মণিমাণিক্য খচিত আংটি পরতেন। মাথায় সূক্ষ্ম তুলার কাপড়ের টুপি পড়তেন। তারা খুব বিলাসী ছিলেন। তাদের স্ত্রীরা পর্দানশীল ছিলেন। নৃত্য ও গীত তাদের প্রিয় ছিল। মুসলিমদের ফার্সী ভাষাই ছিল উচ্চশিক্ষার মাধ্যম। পাশাপাশি আরবী ভাষাও চর্চা করতেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক সুলতান মাদ্রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদেও শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। সকলেই কোরান শরীফ পড়তেন। বিবাহের ক্ষেত্রে কনের বাড়িতে কাজীর সম্মুখে মোল্লা বিবাহ কার্য সম্পাদন করতেন। বিবাহের ক্ষেত্রে হিন্দুদের অনেক লৌকিক আচার মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়ে যায়।
মুসলিম ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বহুবিবাহ করতেন। মুসলিম সমাজে নর্তকীর নৃত্য ও সঙ্গীত খুব জনপ্রিয় ছিল এবং ধনীরা হারেম খোজা প্রহরী নিযুক্ত করতেন।[২৯] মুসলমানরা অনেক হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে তাদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সুলতানরা ভারতের বাহির থেকে ক্রীতদাস-দাসী আনয়ন করতেন।[৩০]

হিন্দু সমাজ :

বিভিন্ন জাতি:

হিন্দু সমাজে বিভিন্ন বর্ণের বা জাতির লোক বসবাস করত। তাদেরকে নিয়েই হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে ছিল। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির লোকের প্রাধান্য ছিল বেশি। ব্রাহ্মণ জাতি আবার বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে কৌলীন্য প্রথা ছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে একশ্রেণি ছিল পণ্ডিত ও সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত। বেদ, পুরাণ, শ্রুতি, স্মৃতি, প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁদের পাণ্ডিত্য ছিল এবং তাঁরা শিক্ষাদান করতেন।[৩১] ব্রাহ্মণ শ্রেণির মধ্যে কেউ বিবাহ অনুষ্ঠানাদি সম্পাদিত করতেন এবং শিশুর জন্মের পর কোষ্ঠী তৈরি করতেন।
বৈদ্যরা নানা শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। তৎকালীন সময়ে এই বৈদ্যরা রোগ ব্যাধি হলে তার চিকিৎসা করতেন। কায়স্থগোত্রের মধ্যে আবার বিভিন্ন শ্রেণির ভাগ ছিল। তারা বিভিন্ন উপাধিধারী ছিলেন। তারা পড়াশুনা করতেন এবং পাশাপাশি কৃজি কাজ করতেন। এই তিন জাতির লোক ছাড়া মধ্যযুগে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল খুব বেশি। তবে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব পদ কর্তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ শ্রেণির লোক ছিল।[৩২]

মধ্যযুগের সমাজে এই সকল জাতির লোক ছাড়াও বৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন জাতির লোক ছিল। যেমন– নাপিত, তেলি, কামার, ছুতার, মোদক, পাটনী প্রভৃতি। এছাড়া সমাজে বেশ্যা বৃত্তির জন্য 'জায়াজীব' নামে একটি শ্রেণি ছিল। এছাড়া রাজপুত ও ক্ষত্রি নামে এক শ্রেণির লোক ছিল। তারা মল্ল-বিদ্যা চর্চা করত।

মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু সমাজে দাস প্রথা ছিল। সেসময়ে বহু বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীকে অপহরণ করার পরে দাসরূপে প্রকাশ্যে বিক্রি করা হতো। দাস প্রথা সমাজে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল এবং তাদের উপর নির্মম ও নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হতো। সেসময়ে হাড়ী, ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক যুদ্ধবিদ্যার জন্য সম্মান লাভ করত। এছাড়া সেসময়ে তান্ত্রিক, নাথ, সহজিয়া প্রভৃতি নব্যপন্থী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। বাণিজ্য করে সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি জাতির লোকেরা সমাজে সম্মানিত ছিলেন।[৩৩]

জাতিচ্যুত :

মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে জাতিচ্যুত হয়ে অকেকেই মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছেন। *চৈতন্যচরিতামৃত* থেকে জানা যায় যে, বাংলার সুলতান হোসেন শাহ বেগমের পরামর্শ মত জীবন নাশের পরিবর্তে করোয়ার জল পান করিয়ে সুবুদ্ধি রায়কে জাতিচ্যুত করেছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কাশীর পণ্ডিতগণ তপ্তঘৃত পানে মুত্যুবরণ এর বিধান দিলে তিনি চৈতন্যদেবের পরামর্শে বৃন্দাবনে কৃষ্ণনাম জপ করে পাপমুক্ত হয়েছিলেন।[৩৪] সেই সময়ে কোন মুসলিম কর্তৃক কুলস্ত্রী ধর্ষিতা হলে যাতে সেই পরিবার জাতিচ্যুত না হয় সে কারণে দেবীবরের মেলবন্ধনে কতগুলো মেল 'যবন-দোষে' দুষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে প্রায় ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্পর্শে হিন্দুরা জাতিচ্যুত হতো এবং এর পরিণাম স্বরূপ তাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হতো। নিজধর্মে ফিরে আসার জন্য রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছিলেন।[৩৫]

পর্তুগীজদের প্রভাব :

পর্তুগীজরা বাংলায় স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করে। বরিশালের পূর্বে, নোয়াখালির দক্ষিণে, চট্টগ্রামের পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের উত্তর প্রান্তের দ্বীপে তারা বাস করত। পর্তুগীজরা বাংলায় অনাথ আশ্রম, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসহ বহু জনহিতকর কাজ করে। বিভিন্ন ফল-ফলাদি তারা বাংলায় আমদানি করেছিল।[৩৬]

বিদ্যাচর্চা :

মধ্যযুগে বিদ্যা চর্চার জন্য নবদ্বীপ বিখ্যাত ছিল। *চৈতন্যভাগবতে* বর্ণনা পাই–

নানা-দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়
নবদ্বীপে পড়িলে সে 'বিদ্যারস' পায় ॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ-কোটি অধ্যাপক,– নাহিক নিশ্চয় ॥[৩৭]
চৈতন্যভাগবত-আদি/২য়/৬০-৬১

তবে নবদ্বীপ নব্যন্যায় ও স্মৃতি চর্চার জন্য বেশি বিখ্যাত হয়েছিল। বহু ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত নবদ্বীপে ন্যায় শাস্ত্র চর্চা করতে করতে শুষ্ক মরুভূমির মত তাঁদের হৃদয় হয়েছিল। পাণ্ডিত্য ও তর্ক ছাড়া কিছুই তারা বুঝতেন না। মহাবৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য নবদ্বীপে টোল স্থাপন করে নব্যন্যায় চর্চা করতেন। তাঁর অনেক ছাত্র ছিল। রঘুনাথ শিরোমণি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বর্ধমানের চতুষ্পাঠীতে মিথিলা, বারাণসী, উৎকল থেকে বহু ছাত্র অধ্যয়নের জন্য আসতেন। ন্যায়শাস্ত্র ছাড়াও ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করানো হতো।[৩৮]

পরবর্তীকালে উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র বাসুদেব সার্বভৌমকে সসম্মানে সভা পণ্ডিত করেন। সেখানেই তিনি চতুষ্পাঠী খুলে শিষ্যদের বেদান্ত শিক্ষা প্রদান করতেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ ও গৌরাবান্বিত সন্তান শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপ অবস্থানকালে সংস্কৃত টোল খুলে ন্যায় শিক্ষা প্রদান করতেন। সন্ন্যাসী হয়ে উড়িষ্যা গিয়ে শাস্ত্রালোচনার মাধ্যমে অদ্বিতীয় বৈদান্তিক সার্বভৌমকে পরাজিত করে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। বাংলার এই দুই চিরঞ্জীব সন্তান উড়িষ্যার রাজার দ্বারা সম্মানিত হয়ে বাংলার গৌরব ও মহিমা প্রচার করেন।[৩৯]

সে সময়ে পণ্ডিতগণ রাজ সম্মান লাভ করতেন। রায় মুকুট বৃহস্পতিকে গৌড়েশ্বর জালালুদ্দীন ও বারবক শাহ বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করে 'রায় মুকুট' উপাধি প্রদান করেছিলেন। সেসময়ে মহান পণ্ডিতরা দিগ্বিজয়ে বের হতেন। চৈতন্যদেবের সময়ে কেশব কাশ্মীরী নবদ্বীপের পণ্ডিতদের পরাজিত করতে নবদ্বীপ গিয়েছিলেন। তাঁরা আড়ম্বর-পূর্ণভাবে গমনাগমন করতেন ঠিক বিদ্যা শোভাযাত্রার মতো। মিথিলার নৈয়ায়িক পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র নবদ্বীপে দিগ্বিজয়ে এসে রঘুনাথ শিরোমণির নিকট পরাজিত হয়েছিলেন।

নবদ্বীপ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠী ছিল। শাস্ত্র চর্চায় ব্রাহ্মণগণই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া বৈদ্য জাতি এবং মুসলমান পণ্ডিতগণও সংস্কৃতসহ নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আলাওল অন্যতম। ড. সুকুমার সেন বলেছেন– "দক্ষিণ রাঢ়ে স্থানে স্থানে এখনও ডোম ও বাগ্‌দী পণ্ডিতের টোল আছে। সেখানে ব্যাকরণ, কাব্য ইত্যাদির পঠন-পাঠন হয় এবং বামুনের ছেলেরাও পড়ে।" বাংলার বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠী বা টোল ছিল। টোলে পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রদের শিক্ষা দান করতেন। তাল পাতায়, কলাপাতায় তারা লেখাপড়া করতেন। টোলের মাধ্যমেই উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হতো। গুরুগৃহে অধ্যাপনা হতো এবং রাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করতেন।[৪০]

নারী জাতির শিক্ষা: ভারতচন্দ্রের *'অন্নদামঙ্গল'*-এর নায়িকা বিদ্যা ও রাণী ভবানী সুশিক্ষিতা ছিলেন। এছাড়া বাংলায় অনেক বিদুষী নারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রাঢ়দেশের হটু বিদ্যালঙ্কার, হটী বিদ্যালঙ্কার, বিক্রমপুরের আনন্দময়ী, কোটালিপাড়ার প্রিয়ম্বদা দেবী, বৈজয়ন্তী দেবী উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে হটী বিদ্যালঙ্কার বিভিন্ন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের কারণে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত হন। হটু বিদ্যালঙ্কার চিরকুমারী ছিলেন। তিনি মস্তক

মুণ্ডন করে শিখা রেখে পুরুষের ন্যায় উত্তরীয় পরিধান করতেন। সেসময়ে বৈষ্ণব পরিবারে এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের নারীরা পড়াশুনা করার সুযোগ পেত। সেসময়ে বাল্য বিবাহের কারণে সাধারণ পরিবারের কন্যাদের পড়াশুনা করা হতো না।[৪১]

বিবাহ :

সে সময়ে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল। অষ্টম থেকে দশম বৎসরের মধ্যে কন্যাদের বিবাহ হতো। মঙ্গলকাব্যগুলোতে বিবাহের বর্ণনা রয়েছে। সেসময়ে বিবাহে বরের পিতা কন্যা-পণ প্রদান করত। তখন বিবাহ কালে অধিবাস, বাসি বিবাহ, বাসর ঘরে স্ত্রীদের বিভিন্ন আচরণ, জামাইয়ের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কৌতুক প্রভৃতি ছিল। মধ্যযুগে বাল্য বিধবাদের কঠোরভাবে জীবন যাপন করতে হতো। বিশেষ করে বালিকা থেকে বৃদ্ধা বিধবাগণকে একাদশীর উপবাস করতে হতো।[৪২] সে সময়ে পুরুষরা বহু বিবাহ করত। বিবাহের সময়ে নববধূর সঙ্গে যুবতী দাসী এমনকি নববধূর ভগ্নীকেও যৌতুক স্বরূপ প্রদান করতে হতো।[৪৩]

নারীর সতীত্ব পরীক্ষা :

তৎকালীন সমাজে নারীর সতীত্ব বিষয়ে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করা হতো। তা পরীক্ষা করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করা হতো। [৪৪]

নারী জাতির লজ্জা হরণ :

মধ্যযুগে বাংলার নারীজাতির লজ্জা হরণ একটি বর্বরোচিত ঘটনা ছিল। বহারিস্তান-ই- গায়েবি নামক সমসাময়িক প্রামাণিক গ্রন্থে গ্রন্থকার একটি অভিযানের সেনানায়ক ছিলেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে–তাঁর সৈন্যরা চার হাজার স্ত্রীলোক বন্দি করে এনে সকলকে বিবস্ত্রা করে রেখেছিল। সেনাপতি তাদের মুক্তির আদেশ দিলেও তাদের অঙ্গে কোন পরিধান বস্ত্র ছিলনা।

সতীদাহ প্রথা :

সবচেয়ে ঘৃণ্যতম প্রথা ছিল সতীদাহ। সেসময়ে এক শ্রেণির পাষণ্ডরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বিধবাকে জোর করে অগ্নিতে ফেলে মৃত্যু নিশ্চিত করত। তবে স্বেচ্ছায় অনেক সতী অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতেন।[৪৫]

খাদ্য :

সমসাময়িক বাংলার বিভিন্ন সাহিত্যে বাঙালি হিন্দুদের খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুগামীরা নিরামিষ আহার করতেন। *চৈতন্যচরিতামৃত* থেকে বিভিন্ন প্রকার নিরামিষ খাদ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা–

দশবিধ শাক নিম্ব তিক্ত সুক্ত ঝোল।
মরিচের ঝাল ছেনা বড়ী বড়া ঘোল ॥
দুগ্ধতুম্বী দুগ্ধকুষ্মাণ্ড বেশারি লাফরা।
মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ শাকরা ॥
চৈ. চ-মধ্য/১৫/৪১১-৪১৪

এছাড়া রাঘবের ঝালি নামেও নিরামিষ আহার্যের বিবরণ রয়েছে *চৈতন্যচরিতামৃতে*।[৪৬] তবে তান্ত্রিক বা শাক্তরা আমিষ ও নিরামিষ দুটিই গ্রহণ করতেন। শাক্ত গ্রন্থে এই দুই প্রকার খাদ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। নারায়ণদেবের *পদ্মপুরাণে* বেহুলার বিবাহ উপলক্ষে খাদ্যের বিভিন্ন ব্যঞ্জনের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে ঘৃত দ্বারা ১১ প্রকার নিরামিষ খাদ্যের বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া আমিষের মধ্যে ১২ প্রকার মৎস্য ও ৫ প্রকার মাংসের বিবরণ রয়েছে।[৪৭] বাঙালিদের খিরিসা, মনোহরা, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি পিঠা প্রিয় ছিল। হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে গোপনে মাদক সেবনের প্রচলন ছিল। মুসলিমরা বিভিন্ন প্রকার বিশেষ করে পশু ও পাখির মাংস খেত। রুটির পাশাপাশি ভাত ছিল অধিকাংশ মুসলিমদের খাবার। গরিবদের প্রধান খাদ্য ছিল পান্তাভাতের জল। হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে পান-সুপারি খাওয়ার প্রচলন ছিল এবং অতিথিদের পান-সুপারি দ্বারা আপ্যায়ন করা হতো।[৪৮]

পোশাক :

বাঙালি পুরুষেরা ধূতি, চাদর এবং বঙ্গ নারীরা খালি গায়ে শুধু শাড়ি পড়ত। ধনী পুরুষ-নারীরা বিভিন্ন ধরনের পোশাক ও অলংকার পরিধান করত। ধনী স্ত্রীলোকেরা রেশমের শাড়ি পড়ত। দরিদ্র নারীরা পট্টশাড়ি পড়ত। সধবা স্ত্রীলোকেরা সিঁদুর ও কস্তুরী ব্যবহার করত। এছাড়া বঙ্গ নারীরা সোনা-রূপার বিভিন্ন প্রকার অলংকার পরিধান করত। যেমন-হার, কুন্তল, মুক্তা, বালা, নূপুর, ধাতুর আংটি প্রভৃতি।[৪৯]

ক্রীড়া:

মধ্যযুগে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রচলিত ছিল। নারী-পুরুষ উভয়ই পাশা খেলায় সময় অতিবাহিত করত। বিষ্ণুপুরে গোলতাস খেলার প্রচলন ছিল। পায়রা উড়ানো একটি আনন্দদায়ক ক্রীড়া ছিল। সে সময়ে মল্লযুদ্ধের প্রতি জনগণ আকৃষ্ট ছিল। এছাড়া লোহার শিকলে বেঁধে বাঘ বাজারে ও বাড়িতে নিয়ে খেলা প্রদর্শন করা হতো। তাছাড়া নানা প্রকার ক্রীড়া সে যুগে ছিল।[৫০]

নৃত্যগীত :

প্রাচীনকালের ন্যায় মধ্যযুগেও নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল। নৃত্যগীত চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল। *চৈতন্যভাগবতের* বর্ণনানুসারে স্বয়ং চৈতন্যদেব তাঁর পার্ষদদের নিয়ে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করতেন। মনসার গান, শিবের গান জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া তখন রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার উপর যাত্রা

অভিনয় হতো। তখনকার সময়ে মৃদঙ্গ, ডম্বরু, জগঝম্প, বিষাণ, ঘণ্টা, শঙ্খ, প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ছিল। তবে পাঁচালী গানের প্রাধান্য ছিল সর্বত্র। গায়ক পায়ে নুপূর পরে নৃত্যের ভঙ্গিতে গান গাইতেন। তার এক হাতে চামর অন্য হাতে মন্দিরা থাকত। সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজানো হতো ছন্দের তালেতালে। ধামালী, পাঁচালী, কথকতা, গম্ভীরা প্রভৃতির মাধ্যমে লোকনাট্যের বিকাশ হয়েছিল।[৫১] তখন কবিগানও বেশ জনপ্রিয় ছিল। পাশাপাশি তরজা ছিল। এছাড়া সূর্যোদয়ের পূর্বে ধনীলোকদের গৃহে গিয়ে একশ্রেণির লোক অর্থের জন্য ঢোল ও সানাই বাজাত।[৫২]

জ্যোতিষ গণনা :

সে যুগে মানুষ জ্যোতিষ গণনাকে বিশ্বাস করত। বিবাহের জন্য শুভ দিন নির্ধারণে এবং বাণিজ্য যাত্রার জন্য গণনা করত।[৫৩] এছাড়া শিশুর জন্মের পরে কোষ্ঠী তৈরি করত। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ বিষয়ে রাশিচক্র গণনা করে ভালমন্দ সম্পর্কে অবগত হত।[৫৪]

লৌকিক আচার ও কুসংস্কার :

জন্মের পূর্বে ও পরে বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান, বিবাহ, সাধভক্ষণ, পুত্রের ষষ্ঠী, নামকরণ, শ্রাদ্ধ ক্রিয়া প্রভৃতি লৌকিক আচার সমাজে প্রচলিত ছিল। এছাড়া গৃহে পশু-পাখি পোষা হতো।[৫৫] সে সময়ের মানুষ কুসংস্কারে বদ্ধমূল বিশ্বাসী ছিল। জাগতিক প্রাপ্তির নিমিত্তে মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাঁড়-ফুঁক, বশীকরণ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে মন্ত্রের ব্যবহার করত।[৫৬]

আসবাবপত্র :

ধনাঢ্য ব্যক্তিরা অত্যন্ত বিলাসী মনোভাবের চাকচিক্যময় জীবন যাপন করত। উচ্চ বিত্তবান ব্যক্তিদের গৃহে স্বর্ণরৌপ্য খচিত পালঙ্ক, সোনার পিঁড়ি, স্বর্ণখচিত দোলা, গালিচা, শীতলপাটি, মূল্যবান কম্বল, আয়না, পাখা, চামর, রথ, গজদন্তনির্মিত পাশা প্রভৃতি মূল্যবান আসবাবপত্র ছিল।[৫৭]

যুদ্ধ প্রণালী :

সেনাবাহিনী ৪ ভাগে বিভক্ত ছিল। পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী ও নৌবাহিনী। তবে অশ্বারোহী বাহিনী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সৈন্যরা তীর, ধনুক, খঞ্জর, তরবারী ও বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করত।[৫৮] 'পাইক' নামে পদাতিক বাহিনী যুদ্ধে গৌরব অর্জন করেছিল। যুদ্ধে নতুন পদ্ধতি ছিল দেশীয় অস্ত্রের ব্যবহার। এর মধ্যে বাঁশের লাঠি ছিল শক্তিশালী অস্ত্র।[৫৯] ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির সৈন্যদের যুদ্ধে অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পাশাপাশি অধীনস্থ রাজা, জমিদার নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ষোড়শ

শতকের প্রথম পাদ শেষ হওয়ার পূর্বে বাংলায় কামান, বন্ধুক, আগ্নেয়াস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেসময়ে উচ্চশ্রেণির পাশাপাশি নিম্নবর্ণের মানুষেরা যুদ্ধে ভূমিকা রাখত। বাংলা নদীমাতৃক হওয়ার কারণে রণতরীর ব্যবহার হতো যুদ্ধে।[৬০]

সাহিত্য :

মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের সময়ে বাংলা সাহিত্যের অবস্থান ছিল স্বর্ণশিখরে। কেননা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে সুলতান হোসেন শাহের আমলে এবং শাহীবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে। তবে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কালে তিনটি কাব্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' হচ্ছে সর্বপ্রথম কাব্য। 'রামায়ণ' নামে দ্বিতীয় কাব্যটি কৃত্তিবাস বাংলায় রচনা করেন। রুকন-উদ-দীন বারবক শাহের সময়ে মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করে গুণরাজখান উপাধি লাভ করেন। তিনি ১৪৭৩ খ্রি. থেকে রচনা শুরু করে ১৪৮০ খ্রি.-এ সমাপ্ত করেন।[৬০(ক)]

বাঙালির চরিত্র :

এ প্রসঙ্গে বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সে সময়ে অনেক নারী অসতী ও লজ্জাহীন ছিল। পুরুষেরা চুরি ডাকাতি করত। মানরিক এর মতে বাঙালিরা ভীরু ও উদ্যমহীন, পরের পা চাটতে অভ্যস্ত। তবে বাঙালিদের মধ্যে দুর্নীতি ও ধূর্ততা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বাঙালিরা বিলাসব্যসনে সময় অতিবাহিত করত। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য তারা নানা রকম অনৈতিক কাজে ও ব্যভিচারে লিপ্ত থাকত। মদ্য পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ সহ বিভিন্ন ক্রিয়া কর্মের মাধ্যমে চিত্তবিনোদন করত। সে যুগে স্মৃতি শাস্ত্রের নাম করে তান্ত্রিক বামাচারী ও সহজিয়া সম্প্রদায় ধর্মের সাধন পথের ব্যাখ্যা দিয়ে শবরোৎসব সহ নানা উৎসবে অশ্লীল ও অনৈতিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করত। অর্থাৎ ধর্মের অজুহাতে শৃঙ্গার রসের উদ্ভব ঘটিয়ে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব বৃত্তি করত। তবে বাঙালিদের জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা তাদের চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল।[৬১]

আদর্শ ও নীতি :

বাঙালির আদর্শ ও নীতির পরিচয় পাওয়া যায় যুদ্ধের জন্য তাদের অপরিসীম সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে। তবে উচ্চ-অভিজাত শ্রেণির পরিবর্তে ডোম, হাড়ী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণির পাইকরাই যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। মানরিক এর বর্ণনা অনুসারে বাঙালিরা দাসত্ব ও বন্দিজীবনের শৃঙ্খলে থাকতে অভ্যস্ত। মধ্যযুগের হিন্দু নেতারা সুলতানী ও মুঘলদের থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার সাধ পাওয়ার জন্য সম্যকভাবে চেষ্টা করেনি। তবে রাজা সীতারাম রায় ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে সর্ব শক্তি দিয়ে লড়াই করেছিলেন। সাধারণত বাঙালিরা আত্মশক্তির পরিবর্তে দৈব অনুগ্রহে বেশি নির্ভর করত। তবে *চৈতন্যভাগবতের* বর্ণনানুযায়ী রাজশক্তির বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য জনগণকে নিয়ে মশাল মিছিল দ্বারা চৈতন্যদেব বাঙালির

বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় রেখে ছিলেন। নবদ্বীপে কাজীর দ্বারা হিন্দুধর্মীয় আন্দোলনের উপর নিষেধাজ্ঞার আদেশের বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের এরূপ আন্দোলন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম।[৬২]

ধর্মীয় অবস্থা :

ইসলাম ধর্ম :

দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু মুসলিম পাশাপাশি বসবাস করলেও ধর্মীয় বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ই নিজ নিজ ধর্ম পালনে সচেষ্ট এবং পবিত্র কার্য বলে মনে করত। সংস্কৃতির অনেক বিষয়ে মিল থাকলেও ধর্মীয় আচার ব্যবহার উভয় ধর্মে সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। মুসলমানদের গোমাংস ভক্ষণ, বিধবা বিবাহ ধর্মের মধ্যে স্বাভাবিক আচার ছিল।[৬৩] কিন্তু হিন্দু ধর্মের জন্য আচারটি গর্হিত অপরাধ বলে বিবেচিত হতো। এছাড়া মুসলিমরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী ছিল না। কিন্তু মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করা পুণ্যের কাজ বলে মনে করত। অথচ হিন্দুদের ক্ষেত্রে এটি পরম আরাধ্য এবং ধর্ম-উপাসনার প্রধান বিধি।[৬৪] তাই মুসলিম পণ্ডিত আল্‌বিরূণী (১০৩০ খ্রিস্টাব্দে) বলেছেন যে– "হিন্দুরা যাহা বিশ্বাস করে আমরা তাহা করি না–আমরা যাহা বিশ্বাস করি হিন্দুরা তাহা করে না।" ইসলাম ধর্মে সুফী ও দরবেশ সম্প্রদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাঙালি মুসলিমরা এই সম্প্রদায়ের প্রভাবে উন্নত চিন্তা চেতনার দ্বারা ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।[৬৫]

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতক বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের স্বর্ণযুগ ছিল। সুফীরা বাংলার সব জায়গাতে দর্গা প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সুফিরা ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ইসলাম ধমের্র মহান পণ্ডিত ছিলেন। সুফীরা মুসলমানদের ইসলাম ধর্মের শিক্ষা প্রদান করে সমাজে আধ্যাত্মিক ইসলামী চেতনা জাগ্রত করার জন্য তাদেরকে দীক্ষা প্রদান করতেন। শিষ্যরা আবার ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করে দর্গা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং মুসলমানদের পূর্বের দীক্ষা-শিক্ষা দান করতেন। রাজা থেকে সকলেই সুফীদিগকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতেন। দর্গার পাশাপাশি কবর স্থানকে পবিত্র জ্ঞান করতেন এবং ধর্মের অঙ্গ হিসেবে গরিবদের চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং খাদ্য বিতরণ করতেন।

সুফীদের পাণ্ডিত্যে ও উপদেশে অনেক হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষ সুফীদের, পীরদের ও দরবেশদেরকে ভক্তি ও বিশ্বাস করত। সাধারণ মানুষ দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য পীরের দর্গায় আগমন করত এবং প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। পীরেরা ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। পীরেরা সম্মানিত ছিলেন এবং তারা শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন।[৬৬] কিন্তু নিম্নশ্রেণির যে সকল হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা ইসলাম ধর্মের তাৎপর্য ভালো করে জ্ঞাত ছিল না। তারা আরবি ভাষা জানত না, কেউ কেউ সামান্য ফার্সি জানত। ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল স্তম্ভ বা তত্ত্ব রয়েছে, যথা– ইমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাত। সুফীরা ইসলাম ধর্মের আদর্শগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন।[৬৭]

হিন্দু ধর্ম :

যুগ যুগ ধরে হিন্দু ধর্মের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আদর্শ স্রোতধারার ন্যায় প্রবাহিত হয়ে আসছে। কালের প্রবাহে এর গতি ও রূপ পরিবর্তন হয়ে থাকে। ধর্মকে অবলম্বন করে সাহিত্য ও সমাজের বিস্তার লাভ ঘটেছে এবং প্রাচীন যুগের সাথে যোগসূত্র রক্ষা করে তা অব্যাহত রয়েছে। মধ্যযুগে শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতগণ প্রাচীনকালের স্মৃতি গ্রন্থ অবলম্বন করে বিভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন। বঙ্গদেশে রচিত বলে পরিচিত বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার প্রভৃতি গ্রন্থ।

ধর্মকর্ম :

স্মৃতি নিবন্ধগুলি থেকে জানা যায়–বাংলায় ১২ মাসেই পূজা পার্বণ হতো। বঙ্গে পূজা পার্বণে তান্ত্রিক মন্ত্র, তান্ত্রিক মণ্ডল, যন্ত্র, মুদ্রা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট। সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবদের প্রাধান্য বেশি ছিল। এছাড়া গাণপত্য, পাশুপত, পাঞ্চরাত্র, কাপালিক, কৌল প্রভৃতি বহু সম্প্রদায় ছিল।[৬৮] বাংলাদেশে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ কালীপূজার প্রবর্তন করেন। শাক্তগণ শক্তির পূজারী ছিলেন। মধ্যযুগে বাংলাদেশে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তবে দুর্গাপূজার প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশি। সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ত্রিগুণাত্মক পূজার বিধি বঙ্গীয় স্মৃতি নিবন্ধকারগণ অনুমোদন করেছিলেন বলে মনে করা হয়। কিন্তু শূলপাণি কালিকাপুরাণ মতে পঞ্চোপকরণে দেবীপূজার বিধান দিয়েছিলেন। বছরের বিভিন্ন মাসে হিন্দু ধর্মের নানা ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে বঙ্গের স্মৃতিকারগণ বর্ণনা করেছেন। যথা– বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান, বিষ্ণুকে শীতল জলে স্নান করানো। জ্যৈষ্ঠমাসে সাবিত্রীব্রত, আরণ্যষষ্ঠী। আষাঢ় মাসে চাতুর্মাস্য ব্রত। শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা। ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। কার্তিক মাসে প্রাতঃস্নান, ভাতৃদ্বিতীয়া। অগ্রহায়ণে নবান্ন শ্রাদ্ধ। পৌষমাসে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান নেই। মাঘে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা, মাঘী সপ্তমীতে প্রাতঃস্নান ও সূর্যোপাসনা, ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মপূজা, রটন্তীচতুর্দশী। ফাল্গুনে শিবরাত্রিব্রত। চৈত্রে রামনবমীব্রত, শীতলাপূজা, অশোকাষ্টমী, প্রভৃতি। এছাড়া তান্ত্রিকদের তন্ত্রসারে শত্রুর অমঙ্গল সাধনে বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, অভিচার প্রভৃতি অনুষ্ঠানের বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্ গতির জন্য স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হতো।[৬৯]

পাপকর্ম ও প্রায়শ্চিত্তের বিধান :

ধর্মের বিধান লঙ্ঘন করে কোন কাজ করলে তাকে পাপকর্ম বলে এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান রয়েছে। পাপকর্ম দুই প্রকার। বিহিত কর্ম না করা এবং নিন্দিত কর্ম করা। পাপের ফলও দুই প্রকার– জীবদ্দশায় ফল ভোগ করা এবং মৃত্যুর পর নরক যন্ত্রণা ভোগ করা। এছাড়া ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান রয়েছে। বিভিন্ন অবস্থায় পাপকারীর প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য রয়েছে। তবে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান ও গুর্বঙ্গনাগমন, স্তেয় এবং অপরাধকারীর সাথে সঙ্গ করা শাস্ত্রের বর্ণনায় মহাপাপ বলে বর্ণিত হয়েছে। সজ্ঞানে

ব্রাহ্মণের সুরাপানে মৃত্যুই প্রায়শ্চিত্ত। তবে অজ্ঞানে করলে দ্বাদশবর্ষ ব্রত পালন বা ১০০টি দুগ্ধবতী গাভী ব্রাহ্মণকে দানের বিধান ছিল। পাতকীর সকল প্রকার সংসর্গ থেকে মুক্ত থাকার জন্য স্মৃতি শাস্ত্রে নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা মহাপাতকীর সঙ্গে মহাপাতকের জন্ম হয়ে থাকে। বঙ্গীয় স্মৃতি অনুসারে-চান্দ্রায়ণ, অতিকৃচ্ছ্র, তপ্তকৃচ্ছ্র, পরাক, প্রাজাপত্য, সান্তপন প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা রয়েছে। বিকল্পে অসামর্থ্যহেতু ব্রাহ্মণকে গোদান দ্বারা ব্রতের কথা বলা হয়েছে।[৭০]

বর্ণাশ্রম প্রথা :

শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ণের নিজ নিজ ধর্ম পালন আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। তাই বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ চতুর্বর্ণের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। ব্রাহ্মণ বর্ণকে সবচেয়ে উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তুলনায় শূদ্রের অবস্থান একেবারে নিম্নে। সেসময় বেদ পাঠ শূদ্রের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। একমাত্র বিবাহরূপ সামাজিক সংস্কারেই ছিল তাদের অধিকার। তবে পুরাণ ও তন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ স্ত্রীলোক এবং শূদ্রকে কিছু ধর্মীয় অধিকার প্রদান করেছেন। ৪টি বর্ণ ছাড়াও বাংলাদেশে ছত্রিশটি শঙ্কর বর্ণ বা মিশ্র জাতির বর্ণনা আছে বৃহদ্ধর্মপুরাণে। প্রাচীন কালের রীতি অনুসারে মধ্যযুগে চতুরাশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-এর ব্যবস্থা সমাজে ছিল। বিধি অনুসারে যে কোন আশ্রমকে গ্রহণ করতে হতো। অনাশ্রমী ব্যক্তির ধমকার্য করা অনুচিত। রঘুনন্দন আটচল্লিশ বছর বয়সের পরে বিপত্নীক ব্যক্তির জন্য রণ্ডাশ্রমী নামে একটি আশ্রমের বিধান প্রদান করেছেন।[৭১]

নারীর মর্যাদা ও স্থান :

প্রাচীনকালের ন্যায় মধ্যযুগে বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ নারীদেরকে বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যে অধিকার প্রদান করেছেন। মুনুসংহিতাকে অবলম্বন করেই স্মৃতিকাররা বলেছেন– নারীদের পতি অনুগামী এবং পতি সেবাই ধর্ম। কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসারে বর্ণনা করেছেন মহানবমীতে এক-থেকে-ষোল বৎসর পর্যন্ত বয়সী কুমারী পূজিতা হতে পারেন। দেবী পূজায় কুমারী পূজা আবশ্যক। পুরুষের তুলনায় নারীদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান লঘুতর।[৭২] বিবাহ ছাড়া নারীর স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকার ছিল না। স্বামী ছাড়া স্ত্রীলোকের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। তবে বিধবারা স্বামীর মৃত্যুর পরে স্বামীর আত্মার মুক্তির জন্য বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান করবে। স্বামীগৃহে কেউ না থাকলে আমৃত্যু পিতৃগৃহে থাকতে হবে। বিধবারা মৎস্য, মাংসসহ কোনো উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ করবে না।[৭৩]

আহার্যদ্রব্য :

শূলপাণি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা করেছেন, সেগুলো হলো– জাতিদুষ্ট, ক্রিয়াদুষ্ট, কালদূষিত, আশ্রয় দূষিত, সংসর্গদুষ্ট, শহুল্লেখ। স্মৃতিকার ভবদেব ভট্ট বলেছেন- অমাবশ্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দশী প্রভৃতি বিশেষ তিথি ও বার ভিন্ন অন্যান্য দিনে মৎস্য বা মাংস ভোজনে দোষ নেই। স্মৃতিকার শ্রীনাথাচার্যও এই

মত সমর্থন করেছেন। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মতানুসারে শফর, সকুল, রোহিত ও আঁশযুক্ত মৎস্য ব্রাহ্মণরা ভোজন করতে পারবে।[৭৪] তবে বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রে সুরাপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুরাপান পঞ্চবিধ পাতকের মধ্যে অন্যতম। গৌড়ী, পৈষ্ঠী ও মাধ্বী-এই তিন প্রকার মদ সুরা নামে অভিহিত। সুরাপানে কঠোরতা থেকে মনে হয় তখনকার সমাজে ব্যাপকভাবে তা প্রচলিত ছিল।[৭৫]

বৈদিক আচার :

বৈদিক শাস্ত্রের ধারাবাহিকতায় হলায়ূধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' গ্রন্থে দশবিধ সংস্কারে বর্ণনা আছে, যথা– গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। তবে মধ্যযুগের সমাজে এর কয়টি প্রচলিত ছিল তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। উল্লিখিত দশটি সংস্কার ছাড়া রঘুনন্দন শোষ্যণ্ডীহোম এবং উপনয়নের পরে সমাবর্তন নামে আরো ২টি সংস্কার প্রবর্তন করেছেন। মলমাসে সকল প্রকার ধর্মকর্ম নিষিদ্ধ করেছেন। বিবাহ অনুষ্ঠানের সূচনা হবে নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ দ্বারা। বিবাহের পরে দম্পতি অক্ষারলবন গ্রহণ করে ব্রহ্মচর্য ধারণ করে ত্রিরাত্রি ভূমিতে শয়ন করবে। বঙ্গীয় স্মৃতিকাররা বিভিন্ন ব্রতের বিধান প্রদান করেছেন। উপবাস হচ্ছে ব্রতের প্রধান অঙ্গ। তবে অশক্ত পক্ষে ব্রতকালে জল, ফল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত ব্রাহ্মণের অনুমোদিত আহার্য। তবে ব্রতকালে পতিত ব্যক্তির সঙ্গ, অন্ত্যজ, পতিতা ও রজঃস্বলা স্ত্রীর দর্শন, বাক্যালাপ, তাম্বুল সেবন, গাত্রাভ্যঙ্গ, দিবানিদ্রা, স্ত্রীসঙ্গ, দন্তধাবন, অক্ষক্রীড়া সম্পূর্ণ বর্জনীয়। এছাড়া গৃহস্থের ও বিধবার একাদশীর উপবাস একান্ত পালনীয়। তবে ৮ বছর থেকে ৮০ বছরের নিম্নে বয়স পর্যন্ত বৈষ্ণব মতের অনুসারীদের একাদশীর উপবাস অবশ্য পালনীয়।[৭৬]

বাংলার ব্যবহারিক জীবনের ধর্ম :

বাংলার সমাজে যে হিন্দু ধর্ম পালিত হতো মধ্যযুগে তা পৌরাণিক ধর্মমতেরই বিবর্তন ছিল। উপাসনার দিক থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। তারা স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী প্রাত্যহিক জীবনে পঞ্চদেবতার পূজা করত অর্থাৎ পঞ্চোপাসক ছিল। হিন্দুরা নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্মকর্মে 'পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ' মন্ত্র দ্বারা পঞ্চোপাচারে পূজা করত।

চৈতন্যদেবের জন্মের অল্প কিছুকাল পূর্বে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ প্রেমধর্ম স্বরূপ ভক্তিবাদ অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন। চৈতন্যদেব আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণব ধর্মের আন্দোলন ও প্রচার ব্যাপকতা লাভ করেনি।[৭৭] বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁর *চৈতন্যভাগবতে* চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপে হিন্দু সমাজ-ধর্মের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন । যথা–

কৃষ্ণ-রাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥

ধর্মকর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু-ধন ॥
* * *
যেবা সব–বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী।
তাঁ-সবার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি ॥
* * *
গীতা ভাগবত যে-যে-জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥[৭৮]
চৈতন্যভাগবত-আদি/ ২য়/ ৬৩-৬৫, ৭০ ও ৭২

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ॥[৭৯]
চৈতন্যভাগবত-আদি/ ২য়/ ৮৬-৮৭

তখন বামাচারী বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম সমাজে এতই প্রভাবশালী হয়েছিল যে– গুরু যা বলবে তাই ধর্ম। কোন শাস্ত্রের দরকার নেই। ফলশ্রুতিতে দুর্নীতি, অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও নারী-পুরুষের অবৈধ সঙ্গ প্রভৃতির কারণে সমাজে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল।[৮০]

তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রবেশ করে। তন্ত্রশাস্ত্রে তান্ত্রিকগণকে বেদাচারী, শৈবাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, বৈষ্ণবাচারী, সিদ্ধান্তাচারী, কৌলাচারী প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তান্ত্রিক ধর্মে অনুপ্রবেশ করতে হলে পূর্বের ধর্মমত পরিত্যাগ করে দীক্ষা গ্রহণ করতে হতো। তাদের দীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি ও আচার সমাজে অস্পৃশ্যতা ও ঘৃণ্যতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাদের দার্শনিক মতবাদ হচ্ছে– যথেচ্ছা ইন্দ্রিয় ভোগের মাধ্যমে কাম-ক্রোধ-ব্যসনের নিরোধ করা যায়।[৮১]

বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদ থেকে বাংলায় বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। এই আউল, বাউল সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়কে মানুষ ঘৃণা করত। ইন্দ্রিয় দমনের শাস্ত্র বিধি তারা পরিপূর্ণভাবে ত্যাগ করে অপরিমিত ইন্দ্রিয় ভোগ

বাসনা চরিতার্থ করার জন্য শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচার এবং অবৈধ নারীসঙ্গ সহ অস্পৃশ্য কার্যে লিপ্ত থাকত। এভাবেই একসময় কামবাসনার নিরোধ হলে মোক্ষ লাভ হয়ে থাকে।[৮২] সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় তান্ত্রিক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরকীয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা করে প্রেমের দ্বারা ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করে।

সহজিয়াদের বহু সম্প্রদায় ও শাখা রয়েছে, যথা– রাম-বল্লভী, কর্তাভজা, বলরামী, সাহেবধনী প্রভৃতি। এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের ঘোষপাড়া, নদীয়া, খড়দহ প্রভৃতি স্থানে বহু কেন্দ্র রয়েছে। অমৃতরসাবলী, আনন্দভৈরব প্রভৃতি সহজিয়াদের গ্রন্থ।[৮৩] সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল কর্তাভজা। আউলে চাঁদ নামক এক সাধু এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু-মুসলিম উভয়ই এই সম্প্রদায়ের শিষ্য হয়। গুরুকে তারা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মনে করত। কৃষ্ণের সহস্র নামের সঙ্গে তুলনা করে গুরুকে তারা আউলে চাঁদ, আউলে মহাপ্রভু, কাঙ্গালী মহাপ্রভু নামে ডাকত। নিম্নজাতীয় স্ত্রীলোকের অনুপ্রবেশ ছিল অবাধ। ঘোষপাড়ার মেলায় লক্ষাধিক লোকের মধ্যে অধিকাংশ ছিল স্ত্রীলোক। এই সম্প্রদায় ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করলেও বর্তমান যুগের আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী এই সম্প্রদায়ের আচার-নীতি ছিল জঘন্য ও নিন্দনীয়। আর এ কারণেই এ সম্প্রদায় ধ্বংসের পথে ধীরে ধীরে ধাবিত হয়।[৮৪] এছাড়া নাথ বা যুগী সম্প্রদায় বাংলায় ব্যাপক প্রভাবশালী হয়েছিল। শিব এই সম্প্রদায়ের আদি গুরু। গোরক্ষনাথ এই সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন। এঁদের কীর্তি ও কাহিনি দ্বারা বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই মতবাদ বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এই সম্প্রদায় কায়াসাধন, হঠযোগ প্রভৃতি ক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণকে আলৌকিক শক্তির দ্বারা ক্ষমতা প্রদর্শন করত।[৮৫]

দ্বাদশ শতক থেকে বাংলায় বেদের পঠন-পাঠন ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড হ্রাস পেতে থাকে এবং তান্ত্রিক মত ক্রমে বর্ধিত হতে থাকে। এসকল মতের সমর্থনে পুরাণের অনুকরণে তাক্ষ্য, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, আগ্নেয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। তবে ১৩শ শতকে মুসলিম আক্রমণের ফলে বাংলার হিন্দু সমাজে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এবং বিপর্যয় ঘটে। এসময় অনাচার, অবিচার ও লৌকিক ধর্মের অনুপ্রবেশের কারণে সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সমাজের স্মার্ত পণ্ডিতগণ দুটি ধারায় বিভক্ত হয়। একশ্রেণি নতুন ভাব ধারায় অন্য শ্রেণি পুরাতন ভাব ধারায়। নতুন ভাব ধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শূলপাণি ও শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি। শূলপাণির ধর্ম তান্ত্রিক এবং শ্রীনাথ আচার্য দেশ-প্রসিদ্ধ আচারকে প্রামাণিক হিসেবে স্বীকার করে সমাজে মৎস্য ভক্ষণ প্রভৃতি অনুমোদন করেন।

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রখ্যাত স্মার্ত ও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি শাস্ত্র সিদ্ধান্তের যুক্তিতে যে মত প্রতিষ্ঠা করেন, তা বাংলার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ অবনত চিত্তে গ্রহণ করে। সমাজে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আদর্শ ও নীতি অনেকখানি খর্ব হয়। মনে হয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বাংলায় হিন্দু ধর্মের ও সামাজিক পরিবর্তনের নিদর্শন হিসেবে যাকে গ্রহণ করা হয়েছিল, সেটি হচ্ছে বৃহদ্ধর্মপুরাণ। কারণ

হচ্ছে এই গ্রন্থে বর্ণিত মত অনুসারে ব্রাহ্মণেরা মদ্য, মাংস, মৎস্য দ্বারা দেবতা পূজা এবং নরবলি দিতে পারে। এছাড়া এ গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে মুসলমানদের সংস্পর্শ ও ভাষা ব্যবহার সুরাপান তুল্য। তাদের অন্নভক্ষণ দোষণীয় এবং তাদেরকে ম্লেচ্ছ, যবন হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাদের সংসর্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৮৬] তাই আমরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্ম ও সমাজ জীবনের যে চিত্র দেখতে পাই, তা স্মৃতিশাস্ত্রের আদর্শ ও নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। উল্লিখিত কারণে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সমাজের বীভৎস রূপ দর্শন করে কাতর কণ্ঠে *চৈতন্যভাগবতে* যা বর্ণনা করেছেন, সে বিষয়ে ড. আহম্মদ শরিফ *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। যথা–

"রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি, পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা' সবার সনে ॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সভা সঙ্গে বিবিধ রমণ ॥[৮৭]

শিতলা, চণ্ডী, বাশুলী বা মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর পূজা ছিল মধ্যযুগের অন্যতম ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য। সে সময়ে উল্লিখিত দেব-দেবীর প্রশস্তি কীর্তন এবং পূজা পদ্ধতি অবলম্বনে এক বিশেষ কাব্যের সৃষ্টি হয়। এই কাব্যের নাম হয়েছিল মঙ্গলকাব্য। মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়ণ এই চার প্রকার মঙ্গলকাব্য।[৮৮] সেসময়ে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই মঙ্গলকাব্য বাংলার সম্পদ, যা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও নেই।

বাংলাদেশে যে সকল দেব-দেবী অপ্রসিদ্ধ ছিল, তারাই হলেন মঙ্গল কাব্যের উপজীব্য। এই সকল দেব-দেবীগণের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, মনসা, কালিকা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত দেব-দেবীদের মধ্যে মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীকাদেবীর প্রশস্তি করে কয়েকজন কবি কাব্য রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন। মধ্যযুগে পাঁচালী গানের রীতি প্রচলিত থাকায় এবং মঙ্গল কাব্যগুলো পাঁচালী গানের আকারে কীর্তন হওয়ার কারণে সমাজের সর্বস্তরে এই দুই দেবীর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। এই কারণে মঙ্গল কাব্যের দ্বারা তাঁদের ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে এবং পাঁচালীগানের দ্বারা সমাজে এই সকল দেব-দেবীর কীর্তি প্রচারের পথ ক্রমশ প্রশস্ত হয়। এছাড়া সম্ভবত যখন নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা ব্রাহ্মণ ধর্মের অত্যাচারে ও রাজনৈতিক পালাবদলের কারণে দলে দলে বিভক্ত হয়ে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করছিল, তখন ধর্মীয় এই বিপর্যয়ের হাত থেকে উত্তরণের জন্য উচ্চশ্রেণির হিন্দু পণ্ডিতসমাজ এসব দেবদেবীকে মর্যাদা ও স্বীকৃতি দান করে নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকে হিন্দুধর্মের মধ্যে রাখার জন্য তাদের ধর্মচর্চা পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যে স্তরের মানুষের অধিকার ছিলনা, বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবের কারণে সেই অবহেলিত শ্রেণির অধিকার ও সংস্কৃতি সমাজের সর্বস্তরের কর্ণগোচরে আনার সুযোগ মিলেছিল।[৮৯]

বাংলা সাহিত্যে স্মৃতি-বহির্ভূত ধর্মের বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন– ব্যাঘ্র কুম্ভীরাদিকে দেবতা শ্রেণির পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা। মধ্যযুগে হিন্দুধর্মে নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত প্রথা ছিল, যেমন– গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ, চড়কের আত্মঘাতী বীভৎস যন্ত্রণা প্রভৃতি। তখন অবশ্য দুর্গাপূজা ও কালীপূজা নামে নতুন ধর্মানুষ্ঠানের প্রবর্তন হয়েছিল। এই দুটি বৃহৎ অনুষ্ঠান বর্তমান কালেও ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে ভারতবর্ষের অন্য কোথাও উক্ত প্রকার দুর্গা পূজার প্রচলন আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সে যুগে পূজায় পাঠা ও মহিষ বলি দেয়া হতো। বলি শেষে সবাই মিলে পশুবলির রক্ত অঙ্গে মর্দন বা লেপন করে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করত এবং অশ্লীল গীত পরিবেশন করত। তন্ত্রসারে কালী ছাড়া ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, তারা ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা ইত্যাদি দেবীগণের সাধন পদ্ধতি সংকলিত হয়েছে। উল্লিখিত দেবীগণকে আশ্রয় করে তন্ত্রসাধন-উপাসনা বাংলার সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে কৃষ্ণানন্দ, পূর্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সর্বানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট শাক্ত উপাসকগণ বর্তমান ছিলেন।[৯০]

অর্থনৈতিক অবস্থা:

দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা অর্থ-সম্পদের দ্বারা যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। তখন বাংলা শস্য সম্পদে ভরপুর ছিল। ১৭ শতকের শুরুতে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবায় পরিণত হয়েছিল। এর পূর্বে ৪০০ বছরের প্রায় পুরোটাই ছিল স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র। এই সময়ে বাংলা সম্পদশালী হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে, বাংলার ধন-সম্পদ বাংলাদেশের মধ্যেই থাকত। অন্যদিকে মুঘল যুগে সুশাসনের ফলে রাজ্যে বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছিল বলে অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশ ঘটেছিল।

বাংলার সম্পদ ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও মুঘল সাম্রাজ্যের শোষণের কারণে সম্পদ হ্রাস পেতে থাকে। কারণ দিল্লীতে বাংলার রাজস্ব হিসেবে প্রত্যেক বছরে বহু টাকা পাঠানো হতো। দ্বিতীয়ত সুবেদার- এর উচ্চ-রাজকর্মচারিগণ অবসর গ্রহণের পরে সৎ ও অসদুপায়ে অর্জিত বহু অর্থ নিজের রাজ্যে নিয়ে যেতেন। এভাবে বিপুল পরিমাণ রূপার টাকা গাড়ি ভরে দিল্লীতে প্রেরণ করা হতো। এরূপ শোষণের কারণে রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পায়। ফলে দ্রব্যাদির মূল্যও হ্রাস পায় আর এই কারণে সাধারণ মানুষের মূলধন কমে যাওয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক হতে শুরু করে।[৯১]

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের উৎকৃষ্ট শিল্পের প্রচলন ছিল। শিল্পের মধ্যে বস্ত্র শিল্প খুব উন্নত ছিল। তন্মধ্যে বাংলার মসলিন উন্নতমানের বস্ত্র হিসেবে বিশ্বখ্যাত ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই মসলিন রপ্তানি করা হতো। বিদেশী রাজা ও আভিজাত্যপূর্ণ ব্যক্তিরা এই বস্ত্র খুব পছন্দ করতেন। মসলিন ছাড়া বিভিন্ন উৎকৃষ্ট বস্ত্র বাংলায় তৈরি হতো এবং তার চাহিদাও খুব ছিল। তবে উন্নতমানের মসলিনের মূল্য ছিল বেশি। বাংলাদেশে বেশি পরিমাণে রেশম ও রেশমের বস্ত্র তৈরি করা হতো। রেশমী পোশাক অভিজাত শ্রেণির নারী-পুরুষ ব্যবহার

করতেন।[৯২] নৌকা তৈরি ছিল একটি বড় শিল্প। ঢাকায় শঙ্খ ছিল সেসময়ে বিখ্যাত শিল্প। এছাড়া সোনা, রূপা ও মূলবান ধাতব পদার্থের অলংকারও জনপ্রিয় ছিল।

বীরভূমে লোহার খনি ছিল। মুল্লারপুর পরগণায় ও কৃষ্ণনগরে লোহার খনি ছিল। মুহাম্মদ বাজারে ও দেওচাতে লোহা তৈরীর কারখানা ছিল। বাংলার লোকেরা কলকাতা ও কাশিম বাজারে কামান তৈরি করতো। কামানের বারুদও বাংলায় তৈরি করা হতো। বাংলায় শীতকালে বরফ তৈরি করা হতো কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে। চীনা পর্যটকদের বিবরণ অনুযায়ী বাংলায় গাছের বাকল থেকে উন্নতমানের কাগজ তৈরি করা হতো।[৯৩]

ইব্‌ন্‌ বতুতার বর্ণনা মতে- বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হতো। বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শস্যশালিনী খ্যাতি বাংলারই প্রাপ্য ছিল। এই ধান বিভিন্ন দেশে রপ্তনি করা হতো। বাংলার চিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গা সহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হতো। বাংলার রেশম সুতা ভারতবর্ষসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হতো।[৯৪] এছাড়া আফিম, মোমবাতি, লাক্ষা, ঘৃত, লঙ্কা ও মৃগনাভি বিভিন্ন স্থানে চালান করা হতো।

আমদানিকৃত কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রথম তামাক ও আলু আমেরিকা থেকে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা ১৩শ শতকে আমদানি করেন। তবে চা ও পাটজাত দ্রব্য ১৭শ শতক ও ১৮শ শতকের প্রথম দিকে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। ১৮শ শতকের শেষের দিকে নীল ও পাট রপ্তানি শুরু হয়। বিভিন্ন প্রকার কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে সুপারি, গুড়, পাট, আদা, তেল, মরিচ, তাড়ি, ফল, মাখন প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এবং বাহিরে রপ্তানি করা হতো। তাই দেখা যায় যে, বাংলা ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকলেও বাংলার বিভিন্ন দ্রব্য বাহিরে রপ্তানি করা হতো। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার মসলা, ঔষধ, গালা, খোজা, লবণ, আফিম ও ক্রীতদাস জল ও স্থলপথে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এবং সমুদ্র পথে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে লঙ্কাদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানি করা হতো। ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে বাংলার বাণিজ্য জাহাজের উপর পর্তুগীজ জলদস্যুতার কারণে বাংলার জলপথে ব্যবসা বাণিজ্য ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।[৯৫]

ভার্থেমা-র মতে বাংলাদেশের মত ধনী বণিক অন্যকোন দেশে ছিল না।[৯৬] পর্তুগীজ যোয়াওদ্য ব্যারোস লিখেছেন– গৌড় নগরী বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ৯ মাইল বিস্তৃত শহরে ২০ লক্ষ মানুষের বসবাস ছিল। বাণিজ্য দ্রব্যের কারণে পথে প্রচণ্ড ভিড় থাকত। হুগলী, সপ্তগ্রাম, সোনারগাঁও ও চট্টগ্রাম বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। ষোড়শ শতকের শেষে সিজার ফ্রেডরিক সপ্তগ্রামকেই বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী বন্দর বলে উল্লেখ করেছেন। র‍্যালফ্‌ ফীচ সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামকে বাংলার বড় বন্দর হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৯৭]

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে কাশ্মীরী, আফগান বা পাঠান, পগেয়া মুলতানী, শেখ, ভুটিয়া ও সন্ন্যাসী বণিকেরা বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্য করতে আসতেন। মনে হয় সন্ন্যাসীরা হিমালয় অঞ্চল থেকে চন্দন কাঠ, রুদ্রাক্ষ, লতাগুল্ম, ভূর্জপত্র ইত্যাদি ভেষজদ্রব্য বিক্রির জন্য আনতেন। কাশ্মীরী ও আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ীরা বাংলা থেকে ক্রয় করে নেপাল ও তিব্বতে মণিমুক্তা, চিনি, তামাক, চর্ম, নীল প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করতেন। তবে বাঙালি সদাগরেরা ভারতবর্ষের সব জায়গাতে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন।

বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি থাকলেও মূলত সাধারণ মানুষের কৃষিই ছিল প্রধান উপজীব্য। বাংলায় বাঙালির কৃষি কাজে বংশগত অভিজ্ঞতা ছিল। তারা বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি, ফল-ফলাদি ও শস্যের চাষ করত। একজন চীনা পর্যটক বলেছেন– বাংলাদেশে বছরে ৩বার ফসল উৎপন্ন হতো। কেননা এখানের সাধারণ মানুষ কঠোর পরিশ্রমী। মধ্যযুগে বাংলার অর্থ-সম্পদের এতই প্রাচুর্য ছিল যে– তা প্রবাদ বাক্যে পর্যন্ত পরিণত হয়েছিল।[৯৮]

বাংলা সাহিত্যে অভিজাত শ্রেণির বিস্তৃত প্রাসাদ, মণিমুক্তাখচিত বসন, ভূষণ, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য রত্নের বর্ণনা করা হয়েছে। ১৫শ শতকে চীনা রাজদূতেরা বাংলায় আগমন করলে অনুষ্ঠান শেষে তাদেরকে স্বর্ণের তৈরি বাটি, পিকদানি, সুরাপাত্র ও কোমরবন্ধ এবং কাজের সহকারীদেরও রৌপ্যের ঐ সকল দ্রব্য, সৈন্যগণকে রূপার মুদ্রা, কর্মচারীদের সোনার ঘণ্টা উপহার প্রদান করা হয়েছিল। বাংলার ঐশ্বর্য দর্শন করে চীনা দূতেরা বিস্মিত হয়েছিলেন। এসবের দ্বারা চীনারা বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। তখন গৌড় ও পূর্ববাংলায় ধনাঢ্য ব্যক্তিরা স্বর্ণ পাত্রে ভোজন করতেন। ষোড়শ শতকে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ গৌড়ের লুণ্ঠনকারীদের হত্যা করে ১৩০০ সোনার থালা এবং বহু মূল্যবান রত্নাদি উদ্ধার করেছিলেন।

বাংলার এই ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে বাঙালির বাণিজ্যে সাফল্য এবং বাংলার উর্বর ভূমিতে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রাকৃতিক কৃষিসম্পদ ও শিল্প।[৯৯] সেসময়ে বহু ধনাঢ্য বণিক সপ্তগ্রামে বসবাস করতেন। এ বিষয়ে সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় *মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন* গ্রন্থে *চৈতন্যচরিতামৃত* থেকে উদ্ধৃত করেছেন। যথা–

> "হিরণ্য-গোবর্ধন নাম দুই সহোদর।
> সপ্তগ্রামে বারো লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥"[১০০]

কবি কঙ্কনের সমসাময়িক পর্যটক সিজার ফ্রেডরিক বাণিজ্য ও ঐশ্বর্যের অন্যতম স্থান হিসেবে সপ্তগ্রামের বর্ণনা করেছেন। ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে প্রতি বৎসর ৩০ খানা জাহাজ আসা যাওয়া করতো। আবুল ফজলের বর্ণনা অনুযায়ী সপ্তগ্রামের বার্ষিক আয় ছিল ৩০,০০০ টাকা।[১০১] ইবনে বতুতা দেখেছিলেন যে, বাংলায় সাত টাকায় সুন্দরী দাসী ক্রয় করতে পারা যায়। তিনি নিজেও একজন সুন্দরী দাসী ক্রয় করেছিলেন।[১০২]

ইবন বত্তুতা ১৪শ শতকে বাংলায় এসে বর্ণনা করেছেন যে–বাংলায় খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র খুব কম মূল্যে পাওয়া যায়। টাকায় আট মন ত্রিশ সের চাল ক্রয় করা যেত। তিন টাকায় দুগ্ধবতী গাভী পাওয়া যেত। চার টাকায় চৌদ্দ সের ঘি পাওয়া যেত। বাঙালির যে সকল খাদ্যদ্রব্য অর্থাৎ চাল, গম,ডাল, আদা, সরিষা, তিল, নারকেল, ঘৃতসহ বিভিন্ন প্রকার শাক সবজি এবং ফলমূল তা সুলভেই পাওয়া যেত। চীনা দূত যেই শিন বর্ণনা করেছেন– গৌড়ের মানুষ ছিল সমৃদ্ধিশালী। সে সময়ে মাটি উর্বর ছিল। বছরে দুইবার ধান পাকতো, নারী-পুরুষ উভয়ে ক্ষেতে কাজ করতো।[১০৩] এছাড়া বিভিন্ন প্রকারের মাছ ও মাংস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। ১৮শ শতকে সরকারি কাগজপত্রে বাংলাদেশকে ভারতের স্বর্গ বলা হয়েছিল। কেননা প্রাকৃতিক মনোরম শোভা, নদ-নদীতে পরিবেষ্টিত সবুজ শ্যামল বাংলার নান্দনিক পরিবেশ ছিল মোহনীয়।[১০৪]

তবে ঐশ্বর্যের পাশাপাশি দারিদ্র্যের করুণ চিত্রও ফুটে উঠেছে বাংলায়। হীন-দরিদ্র ও কৃষকের দুর্দশার অন্ত ছিল না। এর মূল কারণ হচ্ছে– রাজ কর্মচারীদের দ্বারা অহেতুক নির্যাতন ও উৎপীড়ন। লেখক মুকুন্দ-রামের উক্তি অনুসারে তিনি ডিহিদার মাহমুদের অত্যাচারে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বৈদেশিক পর্যটক মানরিক বর্ণনা করেছেন– খাজনার টাকা দিতে না পারলে সাধারণ হিন্দুদের পত্নী ও সন্তানদের নিলামে বিক্রি করা হতো। সুলতানদের কর্মচারীরা কৃষকদের রমণীদের ধর্ষণ করত। এই সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন বিচার বা প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিলনা। শতকরা ৯০ ভাগ সাধারণ জনতা উক্তরূপ শোষণ বঞ্চনার স্বীকার হতো।

এছাড়া সাধারণ জনতা যুদ্ধকালীন সময়ে সৈন্যদের লুঠপাটের দ্বারা দুর্দশাগ্রস্ত হতো। যুদ্ধের সুযোগে উভয় পক্ষের সৈন্যরাই নারী ধর্ষণ ও লুটপাট করত।[১০৫] উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের কারণে রাস্তার পাশের গ্রামের মানুষজন সৈন্যদের আগমন ধ্বনি শ্রবণ মাত্রই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাড়িঘর ত্যাগ করে পালিয়ে যেত। যুদ্ধশেষে বিজয়ী সৈন্যগণ দস্যুর মত ধন-সম্পদ লুটপাট করত।

দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রের উপকূলবর্তী লোকজন মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুর অত্যাচার-নির্যাতনে সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত। মনুষ্যরূপী দানব বাহিনী শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রী-পুরুষদের অপহরণ করে পশুর মত নৌকার খোলে করে নিয়ে দাস হিসেবে অন্যত্র বিক্রয় করত। তারা নারীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করত। এমনকি তারা নগর ও জনপদ লুণ্ঠন করত এবং আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ফেলত। ১৬২১-১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পুর্তুগীজরা ৪২,০০০ দাস বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে চট্টগ্রামে এনেছিল। স্থলপথেও অভিযানকালে গ্রামের মধ্যে সৈন্যরা প্রবেশ করে দস্যুর মত লুণ্ঠন কার্য করে অসংখ্য নারীপুরুষকে বন্দি করে অর্থের বিনিময়ে দাসপণ্যরূপে বিক্রি করত।[১০৬]

তথ্যনির্দেশ:

১. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, প্রকাশক-শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭ম সংস্করণ, ১৯৮১, পৃ. ১-২

২. ঐ, পৃ. ১

৩. ড. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদি পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ৮ম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৪২৩, পৃ. ১৭১-১৭২

৪. ঐ, পৃ. ১৮৮-১৯২

৫. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৯-৩০০

৬. ঐ, পৃ. ৩০০-৩০১

৭. শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসে দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ১ম দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৮, পৃ. ২৭১-২৭২

৭ ক). ঐ, পৃ. ২৭৩

৭ খ). ঐ, পৃ. ২৭৭

৮. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২ম খণ্ড, পৃ. ৭৩

৯. ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, (মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২য় সংস্করণ এবং জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ ১ম প্রকাশ, আগস্ট, ২০১২, পৃ. ৯৭

১০. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, অখণ্ড সংস্করণ, (২য় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১২, পৃ. ১৩৯

১১. শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসে দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল*, পৃ. ২৮৭-২৮৯

১২. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ.৭৬-৭৭

১৩. ঐ, পৃ. ৭৭

১৪. ঐ, পৃ.৭৭-৭৮।

১৫. শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসে দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল*, পৃ. ৩০৬-৩০৮

১৬. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ.৭৯-৮৩

১৭. ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ,২০১৮, পৃ. ৩৩৪- ৩৩৬

১৮. শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, *গৌড়ের ইতিহাস*, সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পদনা মাহবুব সিদ্দিকী, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ১ম দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, মার্চ, ২০১৯, পৃ. ৩৩৩

১৯. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪-৮৫

২০. ঐ, পৃ. ১০৫-১০৬

২১. ড. অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, সাহিত্য লোক, কলকাতা, ৫ম সংস্করণ, নভেম্বর, ২০১৮, পৃ. ১৩৪

২২. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬

২৩. ড. অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, পৃ. ১৩৪

২৪. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭-১০৮

২৫. ড. অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, পৃ. ১৩৪

২৬. ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, (মু-সি) পৃ. ১২৩-১২৬

২৭. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৬-২৩৭

২৮. ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, (মু-সি) পৃ. ১২৪

২৯. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮-২৩৯

৩০. ঐ, পৃ. ২৮৮

৩১. ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, (মু-সি) পৃ. ১২৫

৩২. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮২-২৮৩

৩৩. ঐ, পৃ. ২৮৫-২৯০

৩৪. শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল*, পৃ. ৩৬১

৩৫. ড. অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, পৃ. ১৫৩-১৫৪

৩৬. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯২-২৯৩

৩৭. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ, *চৈতন্যভাগবত*, শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, মায়াপুর, নদীয়া, ২য় সংস্করণ, ২৩ মার্চ, ২০১৬, পৃ. ২৬
৩৮. ড. অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, পৃ. ১৫৪
৩৯. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৪-২৯৫
৪০. ঐ, পৃ. ২৯৬-২৯৯
৪১. ড. অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, পৃ. ১৫৪-১৫৫
৪২. ঐ, পৃ. ১৫৫-১৫৬
৪৩. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১
৪৪. ঐ, পৃ. ৩০১
৪৫. ঐ, পৃ. ৩০২
৪৬. ড. সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, কার্তিক, ১৪২৪, পৃ. ২৫৫
৪৭. ড. অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, পৃ. ১৫৬
৪৮. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬-৩০৭
৪৯. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, মোহম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১ম পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল, ১৯৯৫, পৃ. ৩১৯-৩২০
৫০. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮-৩০৯
৫১. ড.মহুয়া মুখোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় নৃত্য*, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০১৭, পৃ. ১৪-১৬।
৫২. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৯
৫৩. ঐ, পৃ. ৩১৩
৫৪. ড. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, জুন, ২০১৬, পৃ. ৬০৮
৫৫. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৩
৫৬. ড. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, পৃ ৬০৮
৫৭. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৪
৫৮. ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, সুলতানী আমল, পৃ. ৪১২-৪১৪
৫৯. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৬-৩২৭
৬০. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১০-৩১৩
৬০ ক). ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, মু-সি, পৃ. ১৩৪
৬১. ড. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০০-৬০৩
৬২. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৬
৬৩. ঐ, পৃ. ২৩০।
৬৪. ড. জগদীশনারায়ণ সরকার, *বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক* (মধ্যযুগ), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসৎ, কলকাতা, ৪র্থ মুদ্রণ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৫৫-৫৬
৬৫. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩১-২৩৪
৬৬. ড. জগদীশনারায়ণ সরকার, *বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক* (মধ্যযুগ), পৃ. ১৯-২৩
৬৭. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ.২৩৫
৬৮. ঐ, পৃ. ২৩৯-২৪০
৬৯. ঐ, পৃ. ২৪১-২৪৩
৭০. ঐ, পৃ. ২৪৪-২৪৬
৭১. ঐ, পৃ. ২৪৬-২৪৮
৭২. ঐ, পৃ. ২৪৮-২৪৯
৭৩. ড. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গার ইতিহাস* (আদি পর্ব), পৃ. ৬০৫
৭৪. ঐ, পৃ. ৫৭৪
৭৫. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫২
৭৬. ঐ, পৃ. ২৫২-২৫৪

৭৭ . ঐ, পৃ. ২৫৪-২৫৫
৭৮. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ, *চৈতন্যভাগবত*, পৃ. ২৬
৭৯. শ্রীমদ্ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ, *শ্রীচৈতন্যভাগবত*, সংকীর্তন বিভাগ, ইস্কন, মায়াপুর, নদীয়া, ১ম সংস্করণ, ২০০৭, পৃ. ১৭
৮০. ড. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৯১/বি, পৃ. ২৬১
৮১. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬-২৬৭
৮২. ড. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ*, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ৫ম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১৮, পৃ. ৩২৪-৩২৬
৮৩. ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭১-৭৭৬, ৭৮২
৮৪. অক্ষয় কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়*, ১ম খণ্ড, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ১ম দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৭, পৃ. ৯২-৯৬
৮৫. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানি, ঢাকা, সপ্তদশ সংস্করণ,জানুয়ারি, ২০১৭, পৃ. ২৫২
৮৬. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৫-২৭৬
৮৭. ড. আহমদ শরিফ, *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪
৮৮. ড.অতুল সুর, *বাংলা ও বাঙলীর বিবর্তন*, পৃ. ১৫৮-১৫৯
৮৯. শ্রীভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৫, পৃ. ১৭১-১৭৮
৯০. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৯-২৮১
৯১. ঐ পৃ. ২১৬-২১৭
৯২. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬-৩৪৮
৯৩. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮-২১৯
৯৪. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা,৩য় সংস্করণ, আগস্ট, ২০১০, পৃ. ৭১
৯৫. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯-২২১
৯৬. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন*, পৃ. ৭২
৯৭. ড. অতুল সুর, *বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, পৃ. ১৮১
৯৮. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড পৃ. ২২৪-২২৫
৯৯. ড. অতুল সুর, *বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, পৃ. ১৮২
১০০. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন*, পৃ. ৭২।
১০১. অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের বাংলা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০১২, পৃ. ৫৫০-৫৫৩
১০২. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন*, পৃ. ৭৪
১০৩. ড. আহমদ শরিফ, *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১১
১০৪. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড পৃ. ২২৭
১০৫. ড. অতুল সুর, *বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, পৃ. ১৮৩
১০৬. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড পৃ. ২২৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী

আবির্ভাবঃ

উন্নত-উজ্জ্বল-কৃষ্ণপ্রেমরস-রূপস্বভক্তি জগৎকে প্রদান করবার জন্য এবং কৃষ্ণপ্রেমভক্তি বিষয়ক রসসমূহের আস্বাদন করার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি মানব সমাজের পরম কল্যাণের পথ বিশ্বজগতের সমক্ষে অতিউজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর প্রদর্শিত প্রেমধর্মের পথ অনুসরণ করলেই জগতের সকল দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে অমৃতময় জীবনের আনন্দ লাভ করা যায়। করুণাময় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিপূর্ণ বাণী ও মাধুর্যরসপূর্ণ জীবনী কলিযুগে অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানবের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে ফাল্গুন শনিবার চৈতন্যদেব মায়াপুরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অর্থাৎ ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেদিন চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। চন্দ্রগ্রহণের সময় সবাই গঙ্গা স্নান করেছিলেন। একদিকে চন্দ্রগ্রহণ অন্যদিকে চৈতন্যচন্দ্রের জন্ম, এ যেন অশুভ কালরূপ অন্ধকারকে বিদায় দিয়ে মুক্তিস্বরূপ শুভময় উজ্জ্বল আলোকে স্বাগত জানানো।[১]

ড. বিমান বিহারী মজুমদার *চৈতন্যচরিতের উপাদানে* বলেছেন–চৈতন্যদেব ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে সন্ধ্যার সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ড. মজুমদার উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্ত রচিত *শ্রীচৈতন্যজাতক* নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয় ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন শনিবার। জুলিয়ান্ ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি এবং বর্তমানে প্রচলিত গ্রেগরিয়ান্ ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি।[২]

মুরারি গুপ্ত তাঁর রচিত *শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্*-এ বর্ণনা করেছেন যে, চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। যথা–

তস্য জন্মসময়েঽনুশশাঙ্কং রাহুরগ্রসদলং ত্রপয়ৈব।
কৃষ্ণপদ্মবদনেন নির্জ্জিতঃ প্রাবিশৎ সুররিপোর্মুখং বিধুঃ॥[৩]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্-১ম প্রক্রম/৫/২০

কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ বর্ণনা করেছেন–

চৌদ্দ শত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।

ষড়ুবর্গ অষ্টবর্গ সর্ব সুলক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কিবা প্রয়োজন ॥
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥
চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৩/১৭১-১৭৮

কবিরাজ গোস্বামী মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর ও বাসু ঘোষের মতকে সমর্থন করে চৈতন্যদেবের জন্ম সময় বর্ণনা করেছেন।[৪]

আবির্ভাবের কারণ:

জ্ঞানীরা ব্রহ্মের উপাসনা করেন। নির্বাণ মুক্তিই তাঁদের নিকট পরমপুরুষার্থ। কিন্তু সচ্চিদানন্দ ভগবানের সবিশেষ রূপ আছে, সেই সবিশেষ রূপ হচ্ছে সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ। শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত। সনন্দন-নারদ-ব্যাসাদি পঞ্চরাত্র ও ভাগবতাদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার জন্য ভক্তিযোগের সাধন করেছেন। এই ভক্তিযোগের সাধনই হচ্ছে পঞ্চম পুরুষার্থ। আর এই পঞ্চম পুরুষার্থ নামসংকীর্তনরূপ ভক্তিযোগ প্রদান করার জন্য স্বয়ং গৌররূপে নদীয়ায় আবির্ভূত হয়েছেন। মহাকবি কবিকর্ণপূর- তাঁর রচিত *চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে* বর্ণনা করেছেন, যথা– তত্র তত্রৈব শাস্ত্রেষু গূঢ়তয়োঢ়তয়োত্তমত্বেন স্থিতমপি সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহো নিত্যলীলোঽখিলসৌভগবান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এব সবিশেষং ব্রহ্মেতি তত্ত্বং তস্যোপাসনং সনন্দনাদ্যুপগীতমবি-গীতমবিকলঃ পুরুষার্থস্তস্য সাধনং ধনং নাম নাম-সঙ্কীর্ত্তনপ্রধানং বিবিধ-ভক্তিভক্তিযোগমাবির্ভাবয়িতুং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যরূপী ভবান্নাবিরাসীৎ।[৫] (*চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক*-১ম অঙ্ক)

তিনি নাটকের ১ম অঙ্কের ৭ম শ্লোকে বর্ণনা করেছেন– যাতে রাধাকৃষ্ণ নামক লীলাময় বাসা বেঁধেছে এবং যাঁর পরশে সংসার সাগরে পতিত পথিকের ক্লান্তি দূর হয় ও ভক্তের মনোভিলাষ পূরণ হয়, সেই কোন এক অনিবর্চনীয় রসময় কলেবর শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। আলোচ্য শ্লোকটি হচ্ছে–

ব্রহ্মানন্দঞ্চ ভিত্ত্বা বিলসতি শিখরং যস্য যত্রাত্তনীড়ং
রাধাকৃষ্ণাখ্য-লীলাময়-খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্।
যস্য চ্ছায়া ভবাধ্ব-শ্রমশমনকরী ভক্তসঙ্কল্পসিদ্ধে-
র্হেতুশ্চৈতন্যকল্পদ্রুম ইহ ভুবনে কশ্চন প্রাদুরাসীৎ ॥[৬]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃতে* শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত *বিদগ্ধমাধব* নাটকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যথা–

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ন্।

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥[৭]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/৩/২

মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধার সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম অকাতরে বিতরণ করার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। গুরুর ন্যায় শিষ্যকে শিক্ষাদান করার পদ্ধতিকে অবলম্বন করে তিনি জগৎজীবকে শিক্ষা প্রদান করেছেন। নিজ আচরি ধর্ম জীবেকে শিখায়। এই ব্যবহারিক পদ্ধতিতে তিনি শিক্ষা প্রদান করেছেন। সমুদ্র মন্থনের ফলে চন্দ্রের যেমন প্রকাশ হয়েছিল, ঠিক তেমনি ব্রজের মাধুর্য রসসুধা মন্থনের নিমিত্তে প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের উদয় হয়েছিল।[৮]

জীবনী বর্ণনার উৎস:

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী রচনার উৎস সম্বন্ধে ড. রাধাগোবিন্দ নাথ *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের* ভূমিকাতে বর্ণনা করেছেন যে– প্রধান উৎস হচ্ছে মুরারি গুপ্তের কড়চা এবং স্বরূপ দামোদরের কড়চা। মুরারি গুপ্তের কড়চা গ্রন্থের নাম *শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্*। তবে এই গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। স্বরূপ দামোদরের কড়চা সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃতের* বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া কবিকর্ণপূর চৈতন্যচরিত বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় ২টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। একটি হচ্ছে *শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়- নাটকম্* এবং অপরটি হচ্ছে *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্।* এর পরে বাংলা ভাষায় বৃন্দাবনদাস ঠাকুর *চৈতন্যভাগবত* এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত* রচনা করেছেন। তবে মুরারি গুপ্তের কড়চা গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে চৈতন্যদেবের আদিলীলা এবং স্বরূপ দামোদরের কড়চাকে সূত্র হিসেবে গ্রহণ করে চৈতন্যদেবের শেষলীলা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে কবিকর্ণপূর তাঁর মহাকাব্য মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে রচনা করেছেন, একথা তিনি নিজে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মুরারি গুপ্তের কড়চা ও নিত্যানন্দের নিকট শ্রবণ করে *চৈতন্যভাগবত* রচনা করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুরারি গুপ্তের কড়চা, স্বরূপ দামোদরের কড়চা, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের *চৈতন্যভাগবত*, কবিকর্ণপূরের দুই গ্রন্থ অবলম্বন করে এবং রঘুনাথ দাস ও রূপ-সনাতনের নিকট শ্রবণ করে *চৈতন্যচরিতামৃত* রচনা করেছেন।[৯] এই সূত্রগ্রন্থ বিষয়ে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে-

আদিলীলামধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥
প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপদামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥[১০]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৩/১৪-১৫

জীবনকালের অধ্যায়ঃ

ড. রাধাগোবিন্দ নাথ *চৈতন্যচরিতামৃতের* গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকায় বর্ণনা করেছেন– শ্রীচৈতন্যদেব ৪৮ বৎসর পৃথিবীতে প্রকট ছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম ২৪ বৎসর সংসারের মধ্যে অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন লীলা বিলাসে রত ছিলেন। প্রথম ২৪ বৎসর এই গৃহস্থ আশ্রমকে আদিলীলা বলা হয়েছে। ২৪ বৎসর শেষে অর্থাৎ ২৫ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ কাল মোট ২৪ বৎসর। এই সময় কালকে শেষলীলা বলা হয়েছে। শেষলীলা আবার দুটি ভাগে বিভক্ত। যথা– মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা। এর মধ্যে প্রথম ৬ বৎসর তিনি নীলাচল, দক্ষিণভারত, গৌড়, বারাণসী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে তীর্থ পর্যটন করেন। এই ৬ বৎসরের ভ্রমণ কালকে মধ্যলীলা বলা হয়েছে। সন্ন্যাসের শেষ ১৮ বৎসর তিনি নীলাচলে কৃষ্ণরস আস্বাদনে অতিবাহিত করেন। এই ১৮ বৎসরের ভজন কালকে অন্ত্যলীলা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের জীবন কালের অধ্যায়কে সুচারুভাবে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করেছেন–

'চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল কৃষ্ণ কীর্ত্তন বিলাস ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন ॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম-নামামৃতে ভাসাইল সকলে ॥
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা-আদিলীলাখ্যান।
মধ্য-অন্ত্য-লীলা-শেষ লীলার দুইনাম ॥[১১]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৩/৯-১৩

আদিলীলা, মধ্যলীলা, ও অন্ত্যলীলার মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে ক্রমিকানুসারে আদিলীলা বর্ণনা করা হলো–

আদিলীলা

বংশ পরিচয়ঃ

শ্রীচৈতন্যদেবের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। জগন্নাথ মিশ্র বিদ্বান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডিত্যের কারণে তাঁর উপাধি ছিল পুরন্দর। 'মিশ্র পুরন্দর' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের আদি বাসস্থান ছিল শ্রীহট্ট জেলায়। অর্থাৎ সিলেট জেলার ঢাকা দক্ষিণ নামক স্থানে। জগন্নাথ মিশ্রের পিতার নাম উপেন্দ্র মিশ্র। উপেন্দ্র মিশ্রের সাত পুত্র ছিল। এ প্রসঙ্গে কবিকর্ণপূর *গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে* বর্ণনা করেছেন। যথা–

উপেন্দ্রমিশ্রঃ সন্ জাতঃ শ্রীহট্টে সপ্তপুত্রবান্॥[১২]

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা-৩৫

পুত্রদের মধ্যে জগন্নাথ মিশ্র ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রে খ্যাতিমান পণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত জ্যোতিষী নীলাম্বর চক্রবর্তীর রূপবতী ও গুণবতী কন্যা ছিলেন শচীদেবী। জগন্নাথ মিশ্রের সাথে শচীদেবীর বিবাহ হয়। নীলাম্বর চক্রবর্তীরও আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। পরবর্তীকালে জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। জগন্নাথ মিশ্র একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হিসেবে চতুর্ভুজ অধোক্ষজ বিষ্ণু বিগ্রহকে গৃহদেবতা হিসেবে নিত্য সেবা পূজা করতেন। শচীর গর্ভে ক্রমে ক্রমে আটটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছিল এবং ক্রমে ক্রমে কন্যা সন্তানগুলোর মৃত্যু হয়েছিল। কন্যা সন্তানের শোকে জগন্নাথ-শচীদেবী গৃহদেবতা বিষ্ণুর চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকতেন। নবম পুত্র সন্তান রূপে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। দশম সন্তান রূপে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়।[১৩]

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে এক দিব্য জ্যোতি জগন্নাথ মিশ্রের দেহে প্রবেশ করে। সেই দিব্য জ্যোতির কারণে জগন্নাথ মিশ্রকে অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। শুভ মুহূর্তে সেই গলিত স্বর্ণবৎ উজ্জ্বল জ্যোতি জগন্নাথ মিশ্রের হৃদয় থেকে শচীদেবীর হৃদয়ে প্রবেশ করেন। এই অপার্থিব বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামী *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ বর্ণনা করেছেন–

চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ-মাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে ॥
মিশ্র কহে শচী-স্থানে, দেখি অন্য রীত।
জ্যোতির্ম্ময় দেহ, গেহ লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত ॥
যাঁহা তাঁহা সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান।
ঘরে পাঠাইয়া দেয় ধন, বস্ত্র, ধান ॥
শচী কহে, মুঞি দেঁখো আকাশ-উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি' স্তুতি হেন করে ॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে, স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥
আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি, জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥[১৪]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৩/৮০-৮৫

শচীদেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী চৈতন্যদেবের জন্মের পর কোষ্ঠী বিচার করে বললেন– বৃহস্পতি তুঙ্গে। এই বালক পুরুষসিংহ হবে। সকলের রক্ষক হবে। সন্ন্যাসী চূড়ামণি, সর্বজীবের আনন্দদায়ক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হবে। এ প্রসঙ্গে–

অয়ে পুরুষসিংহোঽয়ং জাতঃ প্রোচ্চে বৃহস্পতৌ।
অসৌ সর্ব্বস্য লোকস্য পাতা নিত্যং ভবিষ্যতি ॥
সুশীলঃ সর্ব্বধর্ম্মাণামাশ্রয়ো ন্যাসিনাং বরঃ।
প্রীতিদঃ সর্ব্বভূতানাং পূর্ণামৃতকরো যথা ॥[১৫]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্-১ম প্রক্রম/৫/২৫-২৬

মহাকবি কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যদেবের পরিচয় সম্বন্ধে *গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে* বর্ণনা করেছেন। যথা-

যঃ শ্যামো দধদাস বর্ণকমমমুং শ্যামং যুগে দ্বাপরে
সোঽয়ং গৌরবিধূর্বিভাতি কলয়ন্নামাবতারং কলৌ ॥[১৬]

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা- ২০

নামকরণ:

শচীদেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী জ্যোতিষশাস্ত্রে মহান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নামকরণসংস্কার উৎসবে শিশুর কোষ্ঠী গণনা করে মহাপুরুষের পূর্ণ লক্ষণসমূহ দেখতে পেলেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে শিশুর নাম রাখেন 'বিশ্বম্ভর'। নামকরণ উৎসবে আত্মীয়-স্বজন সহ বহু অতিথিবর্গ এসেছেন। গৃহ আনন্দে পরিপূর্ণ। মহাপুরুষ সূচক নামকরণে সবাই অভিভূত। নিম্ববৃক্ষের নীচে জন্মগ্রহণ করার কারণে শচীমাতা পুত্রের নাম রাখেন 'নিমাই'। আত্মীয় ও প্রতিবেশী নারীরা সম্মিলিতভাবে পরস্পর আলোচনা করে শিশুর দীর্ঘায়ু এবং যমের অরুচিকর তিক্ত প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্ববৃক্ষের নাম থেকে 'নিমাই' নাম রাখেন। কেননা পূর্বে শচীদেবীর আটটি কন্যা জন্মের পরে মৃত্যুবরণ করেছে। সেই ভয় থেকেই যেন এই শিশুর প্রতি যমের অরুচি আসে। সেকারণেই 'নিমাই' নাম রাখেন। *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ বর্ণনা করা হয়েছে–

ডাকিনী- শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই' ॥
চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৩/১১৭

সর্ব্বলোকে করিবে এই ধারণ, পোষণ।
'বিশ্বম্ভর' নাম ইহার, এই ত' কারণ ॥[১৭]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৪/১৯

শ্রীচৈতন্যদেবের দেহের বর্ণ ছিল স্বর্ণের মত উজ্জ্বল। তাঁর রূপ ছিল অপূর্ব মনোহর, সবার চিত্তকে আকর্ষণ করত। তাঁর মোহনীয় রূপে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী সকলেই মোহিত হতেন। এই কারণে কেউ কেউ তাঁকে গৌরাঙ্গ, গৌরহরি, গৌর, গোরা, গৌরসুন্দর গৌরগোপাল, শচীনন্দন, জগন্নাথ সূত প্রভৃতি নামে ডাকতেন।

তবে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম সন্ন্যাস দীক্ষা কালে শ্রীল কেশব ভারতী রেখেছেন। এছাড়া মহাপ্রভু, নবদ্বীপ চন্দ্র, নদের নিমাই, নিমাই পণ্ডিত প্রভৃতি নাম বিভিন্ন সময়ে রাখা হয়েছে।[১৮]

নিমাইয়ের নামকরণ উৎসবের সময় তাঁর রুচি পরীক্ষা করা হয়েছিল। কেননা এই রুচি-পরীক্ষার মাধ্যমে শিশু ভবিষ্যতে কি হবে এরূপ ধারণা করার জন্য করা হয়ে থাকে। এই প্রথা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। নিমাইয়ের সম্মুখে স্বর্ণ, কড়ি, ধান্য, খৈ, ভাগবত গ্রন্থ প্রভৃতি দ্রব্য রাখা হয়েছিল। কিন্তু নিমাই অন্য কোন দ্রব্য স্পর্শ না করে শুধু ভাগবত গ্রন্থ স্পর্শ করে আলিঙ্গন করলেন। সকলে এই দৃশ্য দর্শন করে আনন্দে অভিভূত হয়ে জয়ধ্বনি করলেন এবং সবাই অনুমান করলেন শিশু নিমাই ভবিষ্যতে ভাগবত শাস্ত্রের পণ্ডিত হবেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁর *চৈতন্যভাগবতে* বর্ণনা করেছেন। যথা–

জগন্নাথ বোলে, "শুন, বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয়, তাহা ধরহ সত্বর" ॥
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥
পতিব্রতাগণে 'জয়' দেয় চারিভিত।
সবেই বোলেন, "বড় হইবে পণ্ডিত"॥[১৯]

চৈতন্যভাগবত-আদি/৪/৫৪-৫৬

বাল্যলীলা:

নিমাই ক্রমশ বড় হচ্ছেন এবং সেই সাথে তাঁর চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিমাই বাল্যকালে অনেক লীলা করেছেন। নিমাই যখন হামাগুড়ি দিয়ে অঙ্গনে ঘুরছিলেন, তখন একটি বড় সর্পের সঙ্গে ক্রীড়া করেছিলেন। সর্পটি কুণ্ডলী আকার ধারণ করলে নিমাই তাঁর উপরে শয়ন করলেন। মনে হয় যেন অনন্তনাগের শেষ শয্যা। তখন পিতা-মাতা ও পরিজনবর্গ এই দৃশ্য দর্শন করে নিমাইকে সর্পের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য বিষ্ণুর বাহন পক্ষীরাজ গরুড়কে আহ্বান করলেন। পরে সর্পটি চলে যায় এবং নিমাইকে সবাই কোলে তুলে নিলেন। নারীগণ বিঘ্নবিনাশের জন্য বিভিন্ন আশীর্বাদ সূচক স্তবস্তুতি করলেন।

দুই চোরের সঙ্গে:

ছোটবেলায় নিমাইকে দেখতে চাঁদের মত সুন্দর দেখাত। তাঁর অঙ্গে স্বর্ণের বিভিন্ন অলংকার রয়েছে। দুই জন চোর নিমাইয়ের অঙ্গে অলংকার দর্শন করে অলংকার চুরির লোভে নিমাইকে সন্দেশ হাতে দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে নবদ্বীপ নগরে বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে লাগলেন। এদিকে পিতা-মাতা নিমাইকে না পেয়ে বিষ্ণুর নাম স্মরণ করলেন। দুই চোর বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হয়ে যেখান থেকে নিমাইকে নিয়েছিলেন, ঘুরতে ঘুরতে সেইখানে

নিমাইকে কাঁধ থেকে নীচে রাখলেন। তখন নিমাই দ্রুত বেগে পিতার নিকটে চলে গেলেন। চোর দুটি মনে মনে ভাবল ভেল্কী বাজি নাকি? কোথায় এলাম! বহুদিন চুরি করেছি, কিন্তু এমনটি কখনও হয়নি। চণ্ডীমাতা রক্ষা করেছে। নাহলে বিপদ!

খৈ-সন্দেশ সেবনে উপদেশ:

নিমাইকে শচীমাতা খৈ-সন্দেশ খেতে দিলেন। কিন্তু নিমাই সন্দেশ না খেয়ে মাটি খেলেন। শচীমাতা কারণ জিজ্ঞাসা করলে নিমাই বললেন–সন্দেশত মাটির বিকার। সন্দেশ ও মাটি গ্রহণ করা একই কথা। তখন শচী নিমাইকে বললেন– মাটি গ্রহণ করার জ্ঞানযোগ তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? এই ভাবে বাল্যকালে নিমাই মায়ের সঙ্গে সন্দেশ খাওয়ার ছলে জ্ঞানযোগের বিষয়ে কথপোকথন হয়। শিশু বয়সে জ্ঞানযোগ বড়ই চমৎকার।[২০]

ক্রন্দনচ্ছলে হরিনাম কীর্তন:

নিমাই শিশুকালে ক্রন্দন করতেন। পরিবার বর্গরা ক্রন্দন বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করতেন। কিন্তু কোন কিছুর বিনিময়ে ক্রন্দন বন্ধ করা যেতনা। যখন হরিনাম কীর্তন করা হতো, তখন শিশু নিমাই মৃদু-মধুর হাস্য করতেন। এই অভিনব পদ্ধতিতে সবাই আনন্দিত হতেন। এ বিষয়ে *চৈতন্যচরিতামৃত*- এ বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্রন্দনের ছলে বলাইল হরিনাম।
নারী সব 'হরি' বলে,-হাসে গৌরধাম ॥[২১]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৪/২২

নূপুরের ধ্বনি ও পদচিহ্ন :

জগন্নাথ মিশ্র একদিন পুত্র নিমাইকে পুস্তক নিয়ে আসার কথা বললেন। নিমাই পুস্তক আনার জন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন পিতা জগন্নাথ মিশ্র রুণুঝুনু শব্দে নূপুরের ধ্বনি শুনতে পেলেন। কিন্তু তিনি ভাবলেন নিমাইয়ের চরণে কোন নূপুর নেই। তাহলে নূপুরের ধ্বনি কোথা থেকে এলো। অদ্ভুত ব্যাপার! তখন শচীদেবীকে নিয়ে গৃহের মেঝেতে দেখতে পেলেন অপরূপ পদচিহ্ন। সেখানে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন দর্শন করে আনন্দিত হয়ে দু'জনার নয়ন থেকে অশ্রু প্রবাহিত হলো এবং পাদপদ্ম দর্শনে নমস্কার করলেন। এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবতে* বর্ণনা করেছেন–

রুণুঝুনু করিয়ে নূপুর বাজে পা'য় ॥
মিশ্র বোলে, "কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি?"।
চতুর্দ্দিকে চায় দুই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ॥

'আমার পুত্রের পা'য়ে নাহিক নূপুর ।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর? ॥
কি অদ্ভুত! 'দুইজনে মনে মনে গণে'।
বচন না স্ফুরে দুইজনের বদনে ॥
পুঁথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে।
আর অদ্ভুত দেখে গিয়া গৃহের মাঝেতে॥
সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।
ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন ॥
আনন্দিত দোঁহে দেখি' অপূর্ব্ব চরণ।
দোঁহে হৈলা পুলকিত সজল-নয়ন ॥
পাদপদ্ম দেখি, দোঁহে করে নমস্কার।
দোঁহে বোলে, "নিস্তারিনু, জন্ম নাহি আর"॥[২২]

চৈতন্যভাগবত-আদি/৫/৪-১১

তৈর্থিক ব্রাহ্মণ দর্শন:

এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ একদিন ভ্রমণ করতে করতে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে উপস্থিত হলেন। তখন জগন্নাথ মিশ্র অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করার জন্য নিবেদন করলেন। রন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে ব্রাহ্মণকে প্রদান করলেন। ব্রাহ্মণ রন্ধন করে বিষ্ণু বিগ্রহের সম্মুখে ভোগ নিবেদন করলেন। তখন চঞ্চলমতি নিমাই সেই ভোগ থেকে অন্ন গ্রহণ করলেন। ব্রাহ্মণ চিৎকার করলেন। তখন জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী ব্রাহ্মণকে পুনরায় রন্ধনের জন্য প্রার্থনা করলেন। দ্বিতীয় বার নিমাই ভোগ থেকে পূর্বের মত অন্ন গ্রহণ করলেন। তখন বিশ্বরূপের একান্ত অনুরোধে ও চরণ স্পর্শ করে প্রার্থনা জ্ঞাপন করায় ব্রাহ্মণ তৃতীয় বার রন্ধন করলেন। নিমাই গভীর রাত্রিতে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণ ভোগ নিবেদন করলেন। তখন নিমাই এসে ব্রাহ্মণ এর সম্মুখে অষ্টভুজমূর্তি ধারণ করলেন এবং বললেন– হে ব্রাহ্মণ, তুমি আমার মন্ত্র জপ করে আমাকে আহ্বান করেছ। তাইতো বার বার তোমার ডাকে আমি আসছি। তোমার ঐকান্তিক ভক্তিতে আমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে! তাইতো তোমাকে দর্শন দান করছি। আমার দিব্য রূপ তুমি দর্শন কর। আলোচ্য বিষয়ে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর *চৈতন্যভাগবতে* বর্ণনা করেছেন। যথা–

প্রভু বোলে, "অয়ে বিপ্র, তুমি ত' উদার।
তুমি আমা' ডাকি' আন', কি দোষ আমার? ॥
মোর মন্ত্র জপি' মোরে করহ আহ্বান।

রহিতে না পারি আমি, আসি তোমা'- স্থান"॥

চৈতন্যভাগবত-আদি/৫/১২৪-১২৫

সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অষ্টভুজ রূপ ॥

একহস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়।

আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥

চৈতন্যভাগবত-আদি/৫/১২৭-১২৮

অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি' সুকৃতি ব্রাহ্মণ।

আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন ॥

চৈতন্যভাগবত-আদি / ৫ / ১৩৫

প্রভু বোলে, "শুন শুন, অয়ে বিপ্রবর।

অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর ॥

নিরবধি ভাব' তুমি দেখিতে আমারে।

অতএব আমি দেখা দিলাম তোমারে ॥[২৩]

চৈতন্যভাগবত-আদি /৫/১৪২-১৪৩

মাতাকে মূর্ছিতা দর্শনে নারিকেল আনয়নঃ

নিমাইয়ের দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিবেশী নারীরা শচীদেবীকে নিমাইয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। মাতা তাঁকে শাস্তিস্বরূপ প্রহার করলেন। নিমাই তখন রেগে গিয়ে মাতাকে তাড়া করলেন। মাতা মূর্ছিত হওয়ার অভিনয় করলেন। তখন নারীরা নিমাইকে বললেন–তোমার মাতার মৃত্যু হতে চলছে। নিমাই তখন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করলেন। তখন প্রতিবেশী নারীরা বললেন– তুমি যদি নারিকেল এনে দিতে পার, তাহলে তোমার মাতা প্রাণ ফিরে পাবে। তখন নিমাই কোথা থেকে দুটি নারিকেল নিয়ে এলেন, তা কেউ বলতে পারে না। এই আশ্চর্য ঘটনায় নারীরা অভিভূত হলেন। *চৈতন্যচরিতামৃতের* বর্ণনায় পাই–

কভু মৃদুহস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।

মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি' করয়ে ক্রন্দন ॥

নারীগণ কহে,– নারিকেল দেহ' আনি'।

তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী ॥

বাহিরে যাঞা আনিলেন দুই নারিকেল।

দেখিয়া অপূর্ব্ব হৈলা বিস্মিত সকল ॥[২৪]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/ ১৪/৪৫-৪৭

হিরণ্য-জগদীশের নৈবেদ্য গ্রহণ:

নিমাই একদিন উচ্চৈঃস্বরে কান্না করছেন। সবাই মিলে হরিকীর্তন করলেন কিন্তু কোন ক্রমেই কান্না বন্ধ হচ্ছে না। নিমাই বায়ুগ্রস্তা রোগীর মত একটানা কান্না করছেন। তখন মাতা শচী নিমাইকে বললেন– কি হলে তোর কান্না বন্ধ হবে তাই বল? আমরা তা এনে দিব। তখন নিমাই বললেন– হিরণ্য-জগদীশের গৃহে আজকে হরিবাসর, সেখানে নৈবেদ্যের জন্য নানা সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই খাবার এনে দিলে আমার কান্না থামবে। সবাই চমকে গেলেন যে, হিরণ্য-জগদীশের বাড়ি অনেক দূরে। আজকে একাদশীতে তাঁর গৃহে নানা দ্রব্যের খাবার তৈরী হয়েছে, তা বালক নিমাই কি করে জানল? তখন জগন্নাথ মিশ্র হিরণ্য-জগদীশের বাড়িতে গিয়ে নিমাইয়ের এই অদ্ভুত আচরণের কথা জ্ঞাপন করলে, তাঁরাও আশ্চর্যান্বিত হয়ে সেই নৈবেদ্য এনে নিমাইকে প্রদান করলেন। নিমাই আনন্দভরে সেবা করলেন। সবাই অদ্ভুত আচরণে রোমাঞ্চিত হলেন। তাই *চৈতন্যভাগবতে* পাই–

সবেই বোলেন, "বাপ, কি ইচ্ছা তোমার?।
সেই দ্রব্য আনি' দিব, না কান্দহ আর"॥
প্রভু বোলে, "যদি মোর প্রাণ-রক্ষা চাহ'।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ' ॥
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত।
এই দুইস্থানে আমার আছে অভিমত ॥
একাদশী-উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি' করিয়াছে যত উপহার ॥
সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই' হাঁটিয়া বেড়াঙ"॥[২৫]

চৈতন্যভাগবত-আদি/৬/১৯-২৩

শিক্ষাজীবন:

নিমাই বাল্যকাল থেকেই তীক্ষ্ণমেধাবী ছিলেন। পড়াশুনায় তাঁর তীব্র আগ্রহ। অধ্যয়নের আগ্রহের কারণে তিনি নিমাই পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এ বিষয়ে এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

উপনয়ন:

নিমাইকে উপনয়ন প্রদান উপলক্ষে জগন্নাথ মিশ্র উৎসবের আয়োজন করেন। সেই উৎসবে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, বালক, বালিকা প্রভৃতি শ্রেণির লোকজন অংশগ্রহণ করেন। জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে সাবিত্রী মন্ত্র এবং ব্রহ্মগায়ত্রী প্রদান করলেন। এই প্রথম নিমাইকে ব্রহ্মণ্য তেজস্বীরূপে পিতামাতা দর্শন করলেন এবং আনন্দিত হলেন। মাতা শচী নিমাইয়ের ভিক্ষা ঝুলিতে ভিক্ষা প্রদান করে আশীর্বাদ করলেন। জগন্নাথ মিশ্র সমাগত সকল অতিথিকে বিভিন্ন উপাদেয় দ্রব্যে আকণ্ঠ ভোজন করিয়ে প্রীতি লাভ করলেন।

অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য-তেজ দেখি' সর্ব্বগণে।
নর-জ্ঞানে আর কেহ নাহি করে মনে ॥
হাতে দণ্ড, কান্ধে ঝুলি, শ্রীগৌরসুন্দর।
ভিক্ষা করে প্রভু সর্ব্ব-সেবকের ঘর ॥[২৬]

চৈতন্যভাগবত-আদি/৮/১৬-১৭

বিদ্যাচর্চা আরম্ভ:

নিমাইয়ের উপনয়ন সংস্করণের মাধ্যমেই প্রকৃত পক্ষে বিদ্যা চর্চা আরম্ভ হলো। মায়াপুরের নিকটে গঙ্গানগর নামক স্থানে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে নিমাইয়ের শিক্ষাজীবন শুরু হলো। গঙ্গাদাস নিমাইকে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাতেন। অল্প সময়ের মধ্যে নিমাই ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। গঙ্গাদাস তাঁর প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হলেন। নিমাইয়ের ব্যাকরণ শিক্ষা সম্পর্কে *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ বর্ণনা করা হয়েছে।

'গঙ্গাদাস পণ্ডিত-স্থানে পড়েন ব্যাকরণ।
শ্রবণ-মাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥
অল্পকালে হৈলা পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥[২৭]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৫/৫-৬

নিমাইয়ের বাল-চাপল্য:

নিমাই দেখতে যেমন সুদর্শন ছিলেন, তেমনি দুষ্টও ছিলেন। তিনি এতই চঞ্চল ছিলেন, তাঁর দুষ্টামির কারণে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে জগন্নাথ ও শচীর নিকটে অভিযোগ করতেন। নিমাই জলদিয়ে কারো ধ্যান ভঙ্গ করতেন। শিব-লিঙ্গ চুরি করতেন, বিষ্ণু পূজার উদ্দেশ্যে আয়োজিত আসনে বসে নৈবেদ্য গ্রহণ করতেন। গঙ্গা স্নানের পরে কারো অঙ্গে বালুকা দিতেন। কারো ঘাড়ে উঠতেন। বস্ত্রগুলো এলোমেলো করে রাখতেন। গঙ্গাজলে সন্ধ্যা

করলে ডুব দিয়ে নিমাই আঙ্গুল স্পর্শ করতেন। এইভাবে সবাইকে বিরক্ত করে নিমাই পিতামাতা কর্তৃক শাসিত হতেন। *চৈতন্যভাগবতে* পাই–

কেহ বোলে, "মোর শিব-লিঙ্গ করে চুরি"।
কেহ বোলে, "মোর লই' পলায় উত্তরী ॥
কেহ বোলে, "পুষ্প, দূর্ব্বা, নৈবেদ্য, চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জ, বিষ্ণুর আসন ॥[২৮]

চৈতন্যভাগবত-আদি/৬/৫৯-৬০

বিশ্বরূপের সংসার ত্যাগ:

নিমাইয়ের অগ্রজভ্রাতা বিশ্বরূপ। পরম পণ্ডিত বিশ্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সভায় সর্বদা শাস্ত্রালোচনায় রত থাকতেন। যৌবনে পদার্পণকালে পিতামাতা তাঁকে বিবাহ দেওয়ার জন্য আলোচনা করলে বিশ্বরূপ সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করে ঈশ্বর প্রাপ্তিই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য– এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে গভীর রাত্রে গৃহ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন। শঙ্করারণ্য স্বামী নামে পরিচিত হলেন। বিশ্বরূপের সংসার ত্যাগে পিতা-মাতা হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করলেন। বাৎসল্য স্নেহের অনুভূতিতে উভয়ই বিরহে কাতর হলেন। কনিষ্ঠপুত্র আদরের নিমাই তখন পিতামাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করে বললেন– তোমরা চিন্তা করনা, আমি তোমাদের সেবা যত্ন করব, তোমরাইতো আমার আশ্রয়![২৯]

একাদশীব্রত পালনে অনুরোধ:

শচীমাতাকে নিমাই অনুরোধ করে একদিন বললেন– মাতা, তুমি একাদশী তিথিতে অন্ন গ্রহণ করবে না। কেননা একাদশীব্রত পালনে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন। পুত্রের প্রার্থনা ছলে উপদেশ মাতা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। তাই লোচনদাস ঠাকুর *চৈতন্যমঙ্গলে* বর্ণনা করেছেন–

একাদশী-তিথি অন্ন না খাইবে আর।
যতনে পালিহ তুমি এ বোল আমার ॥
মেঘগম্ভীর-নাদে কহিল মায়েরে।
শুনি মাতা সবিস্মিতা সম্ভ্রম অন্তরে ॥[৩০]

চৈতন্যমঙ্গল-আদি/শ্রীরাগ-দিশা

অধ্যয়ন বন্ধ:

নিমাই মাতাকে বললেন– মা, দাদা আজ স্বপ্নে বলেছেন–'তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কর'। কিন্তু আমি দাদাকে বলেছি– বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করার জন্য আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব না। জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে বিমর্ষ অবস্থায়

চিন্তা করলেন, নিমাই শাস্ত্রে পণ্ডিত হলে সেও বিশ্বরূপের পথ অন্বেষণ করবে। সংসার অনিত্য এবং ত্রিতাপ দুঃখের আলয়। শাস্ত্রতত্ত্ব যাতে না জানতে পারে সেই জন্য জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে বললেন– আগামীকাল থেকে তোমার পাঠ বন্ধ থাকবে। শচীমাতা অনুরোধ করলেও মিশ্র সিদ্ধান্তে অটল থাকে।[৩১]

বর্জ্য পাত্রের উপর উপবেশন :

পড়াশুনা বন্ধ হওয়ার কারণে নিমাইয়ের চঞ্চলতা কয়েক মাত্রায় বেড়ে গেছে। নিমাই বর্জ্য পাত্রের উপর বসে আছে। মুখে ও হাতে কালির দাগ লেগেছে। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে অপবিত্র স্থানে উপবেশন, মাতা শচী দেখে নিমাইকে চলে আসতে বললেন। তখন নিমাই বললেন– বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট পাত্র কখনও অপবিত্র হয় না। এই ভাবে মাতাকে উপদেশ প্রদান করলেন এবং বললেন–আমার পড়াশুনা বন্ধ করেছ, কোনটি শুচি কোনটি অশুচি কি করে বুঝব? তখন প্রতিবেশীদের অনুরোধে পিতা-মাতা আবার পাঠ শুরু করার উপদেশ প্রদান করেন। *চৈতন্যভাগবতে* বর্ননা করা হয়েছে–

এ-সব হাঁড়ীতে মূলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি' করিলা রন্ধন॥
বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু দুষ্ট নয়।
সে হাঁড়ী-পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয় ॥[৩২]

চৈতন্যভাগবত-আদি/৭/১৭৭-১৭৮

বিদ্যার্থী:

জগন্নাথ মিশ্রের আদেশে আবার নিমাই পড়াশুনায় মনোনিবেশ করলেন। পিতা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে নিমাইকে সমর্পণ করলেন। পণ্ডিত গঙ্গাদাস সাধ্যমত নিমাইকে শিক্ষাদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। নিমাই দুই বছর অধ্যয়নে ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেন। নিমাইয়ের বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখে গঙ্গাদাস বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। এইভাবে নিমাইয়ের বিদ্যা চর্চা অব্যাহত থাকে। *চৈতন্যভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে–

গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পূনর্ব্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন ॥
দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্বশিষ্যশ্রেষ্ঠ করি' করিলা পূজিত ॥[৩২ক]

চৈতন্যভাগবত-আদি/৮/৩৪, ৩৬

ড. দীনেশচন্দ্র সেন *বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে* বলেছেন– নিমাইয়ের তিনজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা হলেন- গঙ্গাদাস, বিষ্ণুদাস ও সুদর্শন দাস। নিমাই বাল্য ও কৈশোরে এই তিন অধ্যাপকের নিকট পড়াশুনা করতেন।[৩৩]

জগন্নাথ মিশ্রের প্রয়াণঃ

নিমাইয়ের বয়স যখন দশ বছর, তখন পিতার অকাল প্রয়াণে নিমাই শোকগ্রস্ত। শিশু বয়সে পিতৃহারা নিমাইয়ের দুঃখের অন্ত নেই। তবুও পতিহারা জননীকে সান্ত্বনা দিয়ে মাতাকে সুস্থ করেছেন। মনুষ্য জীবন অনিত্য, সবাইকে একদিন ধরাধাম ত্যাগ করতে হবে। ঈশ্বর স্মরণই একমাত্র কাম্য। শোক করা উচিত নয়। মা আমি তোমাকে দেখব! *চৈতন্যমঙ্গলে* বর্ণনা করা হয়েছে–

বৈকুণ্ঠে চলিলা দ্বিজ রথ-আরোহণে।
ধরণী-বিদার দেই শচীর ক্রন্দনে ॥
মায়ের কান্দনা দেখি বাপের মরণ।
কান্দয়ে শচীর সুত ঝরয়ে নয়ন ॥[৩৪]

চৈতন্যমঙ্গল- আদি/পৌগণ্ডলীলা/৬৭৭, ৬৮৩

শচীদেবীকে স্বর্ণপ্রদানঃ

পিতার তিরোধানের পরে নিমাইয়ের সংসারের হাল ধরবার কেউ নেই। বালক নিমাইয়ের এ বিষয়ে কোন চিন্তা নেই। মাতা শচী সর্বদা চিন্তা করেন কিভাবে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করবেন। একদিন নিমাই গঙ্গাপূজার জন্য মায়ের নিকট তৈল, আমলকী, দিব্যমালা, সুগন্ধি-চন্দনের কথা বললে মা বলেন– অপেক্ষা কর, কিন্তু নিমাই অপেক্ষার কথা শুনে ক্রোধে গৃহের জিনিষপত্র সব ভেঙ্গে ফেলে দিলেন। মাতা তাঁকে শান্ত ভাবে বললেন–তোমার পিতা নেই, এরকম সব কিছু নষ্ট করলে কিভাবে সংসার চলবে? তখন নিমাই মাকে বললেন– কৃষ্ণের সংসার কৃষ্ণই চালাবেন। একদিন রাত্রে নিমাই মাকে দিব্যস্বর্ণ তোলা দিয়ে বললেন– কৃষ্ণের এই সম্বল দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ কর। বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবতে* পাই–

পড়িবারে তুমি বোল এখনি যাইবা।
ঘরেতে সম্বল নাহি,– কালি কি খাইবা? ॥
হাসে প্রভু জননীর শুনিয়া বচন।
প্রভু বোলে, "কৃষ্ণ পোষ্টা, করিবে পোষণ" ॥
জননীরে ডাক দিয়া আনিঞা নিভৃতে।
দিব্য স্বর্ণ তোলা দুই দিলা তান হাতে ॥
"দেখ, মাতা, কৃষ্ণ এই দিলেন সম্বল।
ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করহ সকল"॥[৩৫]

চৈতন্যভাগবত-আদি/৮/১৭০-১৭১/১৭৫-১৭৬

পণ্ডিত নিমাই:

পিতার তিরোধানের পরে নিমাই গভীরভাবে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। পিতার সংরক্ষিত স্মৃতি, ন্যায়ের গ্রন্থ পাঠ করে শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ আয়ত্ত করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে নিমাই অলংকার, ব্যাকরণ, ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রে আগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হলেন। তিনি সর্বত্র নিমাই পণ্ডিত নামে খ্যাত হলেন। মুরারি, মুকুন্দ-সঞ্জয় সহ নদীয়ার ব্যক্তিগণকে পথে ঘাটে যখন যেখানে যার সাথে দেখা হতো, তখন সেখানেই শাস্ত্র বিচার শুরু করতেন। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, বৈষ্ণব সবাই তাঁর নিকট বিচারে পরাস্ত হতো। এটাই নিত্যদিনের স্বভাব হয় নিমাইয়ের। বিদ্যার গর্বে গর্বিত হয়ে নিমাই সবাইকে শাস্ত্র বিচারে আহ্বান করতেন। ফলে নদীয়ার সকলেই তাঁকে পরাজয়ের ভয়ে এড়িয়ে চলতেন। তৎকালীন সময়ে নবদ্বীপে নিমাইয়ের সমকক্ষ পণ্ডিত কেউ ছিলেন না। *চৈতন্যভাগবতে* পাই–

বৃহস্পতি জিনিঞা পাণ্ডিত্য-পরকাশ।
স্বতন্ত্র যে পুঁথি চিন্তে, তারে করে হাস ॥
প্রভু বোলে," ইথে আছে কোন্ বড় জন?।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন? ॥[৩৬]

চৈতন্যভাগবত-আদি/১০/১৫-১৬

নিমাই ব্যাকরণ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। নিমাই তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও শিক্ষার ধনু নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতদের পাঠশালা লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলেন। নবদ্বীপের বড় বড় পণ্ডিতগণ নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ মেধা দেখে আনন্দিত ও বিস্মিত হলেন।[৩৭]

অধ্যাপনা:

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজধানী নবদ্বীপ সংস্কৃত চর্চার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তখন মল্লযুদ্ধের পরিবর্তে তর্কযুদ্ধই যেন প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হয়েছিল। নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল তখন ভারতবর্ষে অদ্বিতীয় ছিল। নবদ্বীপ বেদান্ত, অলংকার, কাব্য সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্র চর্চার শ্রেষ্ঠ পীঠ হিসেবে পরিণত হয়েছিল।[৩৮] নিমাই পণ্ডিতরূপে মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহাঙ্গনের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলে অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁর টোলে অনেক ছাত্র পড়াশুনা শুরু করেন। নিমাইয়ের শিক্ষা কৌশলে ছাত্ররা অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্যা অর্জন করতে সক্ষম হয়। নিমাইয়ের যশ সর্বত্র প্রচারিত হয়। এই সময়ে সংস্কৃত ও ন্যায় দর্শনের পীঠস্থল রূপে পরিগণিত নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে খ্যাতি লাভ করেন। তখন নৈয়ায়িকরা নিমাই পণ্ডিতের সাথে শাস্ত্র বিচারে ভয় পেতেন। *চৈতন্যভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

মুকুন্দসঞ্জয় বড় মহা-ভাগ্যবান্ ।
যাঁহার আলয়ে বিদ্যা-বিলাসের স্থান ॥

চৈতন্যভাগবত-আদি/১০/৩৮

বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তান ঘরে।
চতুর্দ্দিকে বিস্তর পড়ুয়া তঁহি ধরে ॥
গোষ্ঠী করি' তাঁহাই পড়ান দ্বিজরাজ।
সেই স্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ ॥
কতরূপে ব্যাখ্যা করে, কত বা খণ্ডন।
আধ্যাপক- প্রতি যে আক্ষেপ সর্ব্বক্ষণ ॥[৩৯]

চৈতন্যভাগবত-আদি/১০/৪০-৪২

বিবাহ :

নিমাই পণ্ডিত যৌবনে পদার্পণ করেছেন। সংস্কৃত টোলে অধ্যাপনা করছেন। মাতা শচীদেবীর অনুরোধে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। নদীয়ার বল্লভাচার্যের অতীব সুন্দরী কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সাথে বিবাহ হয় নিমাইয়ের। বনমালী মিশ্র নিমাইয়ের বিবাহের ঘটকালি করেছেন। প্রতিবেশী আত্মীয়রা নিমাইয়ের বিবাহে খুবই আনন্দিত। লক্ষ্মীরূপা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে নিমাইয়ের সাথে দর্শনে বিভিন্ন শ্রেণির লোক বিভিন্ন রূপে মন্তব্য করেছেন। কেউ বলে রাম-সীতা, কেউ বলে হর-পার্বতী, কেউ বলে ইন্দ্র-শচী, কেউ বলে লক্ষ্মী-নারায়ণ। বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত*-এ বর্ননা করেছেন–

শেষে সর্ব্ব-অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত।
লক্ষ্মী-কন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ ॥
হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে লাগিত করিতে।
তুলিলেন সভে লক্ষ্মীরে পৃথ্বী হইতে॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি' সপ্তবার।
যোড়-হস্তে রহিলেন করি' নমস্কার॥

চৈতন্যভাগবত-আদি/১০/৯৩-৯৫

অল্প-ভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামী মিলে?।
এই হর-গৌরী হেন বুঝি"–কেহ বোলে ॥
কেহ বোলে, "ইন্দ্র-শচী, রতি বা মদন"।
কোন নারী বোলে, "এই লক্ষ্মী-নারায়ণ" ॥
কোন নারীগণ বোলে, "যেন সীতা-রাম।
দোলোপরি শোভিয়াছে অতি-অনুপম" ॥[৪০]

চৈতন্যভাগবত-আদি/১০/১১২-১১৪

ঈশ্বরপুরীর দর্শন:

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের গৃহে এলে তিনি তাঁকে সসম্মানে সেবা করলেন। ঈশ্বরপুরী নদীয়ায় ভ্রমণ করছেন– এমন সময় নিমাই পণ্ডিতের সাথে দেখা হলে নিমাই তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। ঈশ্বরপুরী পথিকদের নিকট থেকে জানতে পারলেন– ইনিই নিমাই পণ্ডিত। মধুর বাক্য বিনিময়ে নিমাই নিজ গৃহে নিয়ে তাঁকে সেবা করেন। ঈশ্বরপুরী তাঁর রচিত 'কৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থখানির দোষ বিচার করার জন্য নিমাইকে অনুরোধ করলে নিমাই বললেন– ভক্ত যে গ্রন্থে কৃষ্ণের বিষয়ে বর্ণনা করে, সেই গ্রন্থে কোন দোষ থাকে না। কেননা কৃষ্ণ ভক্তের ভক্তিতেই প্রীতি লাভ করে থাকে। তবুও নিমাই গ্রন্থের একটি শ্লোক বিচার করে তার ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে বললেন– "এ ধাতু আত্মনেপদী নয়।" পরে ঈশ্বরপুরী বললেন– "যে ধাতু 'পরস্মৈপদী' বলি গেলা তুমি। তাহা এই সাধিল আত্মনেপদী আমি।" নিমাই তা শ্রবণ করে ভক্ত জয় নিমিত্তে কোন দোষ ধরলেন না।[৪১]

কেশব কাশ্মীরী পণ্ডিতের পরাজয়:

কাশ্মীরের বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম হচ্ছে কেশব ভট্ট, তিনি সর্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। কেশব কাশ্মীরী নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি সরস্বতী দেবীর বর প্রাপ্ত ছিলেন। দেবীর বরে কাশী, কাঞ্চী, দাক্ষিণাত্য, দ্রাবিড়, গয়া প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতদের পরাজিত করেছেন। এই কারণে তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন রাজ্য জয় করে অবশেষে সংস্কৃত চর্চার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হলেন অনুচরবৃন্দ সহ। তর্কযুদ্ধে তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতদের আহ্বান করেন এবং বলেন–"আপনারা আমার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন, তা না হলে জয়পত্র লিখে দিন"। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা ভয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে গেলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় নিমাই পণ্ডিত ছাত্রদের সাথে গঙ্গার সমীপে শাস্ত্রালোচনা করছেন, এমন সময় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সেখানে এসে নিমাই পণ্ডিতের সাথে পরিচয় হলে, নিমাই সাদর সম্ভাষণ করে আসন গ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন। আসন গ্রহণ করলে নিমাই তাঁকে বললেন– আপনি সর্বশাস্ত্র বিশারদ ও মহান কবি। অনুগ্রহ করে আমাদের গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন, আমরা শ্রবণ করে পবিত্র হই। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ঝড়ের বেগে শত শ্লোকে গঙ্গার মাহাত্ম্য সংস্কৃত ভাষায় বর্ণনা করলেন। তখন নিমাই প্রশংসা করে বললেন– সত্যই আপনি সরস্বতীর বরপুত্র; তা নাহলে এমন ভাবে বর্ণনা করা কোন পণ্ডিতের পক্ষে সম্ভব নয়। তখন নিমাই অনুরোধ করলেন–বর্ণিত শ্লোকের বিচার করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। দিগ্বিজয়ী বললেন–কোন শ্লোকটি? তখন নিমাই চতুঃষষ্ঠি শ্লোক নির্বাচন করে উচ্চারণ করলেন–

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৬/৪১

দিগ্বিজয়ী বললেন– আমি ঝড়ের বেগে বর্ণনা করলাম, তুমি কি করে স্মরণে রাখলে ? তখন নিমাই বললেন–

প্রভু কহে, দেবের বরে তুমি– 'কবিবর'।
ঐছে দেবের বরে কেহ হয়– 'শ্রুতিধর'॥

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৬/৪৪

তখন নিমাই শ্লোকটির বিচার শুরু করে বললেন– আলোচ্য শ্লোকে পাঁচটি দোষ এবং পাঁচটি অলংকার আছে। এখানে দুটি শব্দালংকার ও তিনটি অর্থালংকার রয়েছে। এছাড়া 'বিরুদ্ধমতি', 'ভগ্নক্রম', 'পুনরুক্তি' এবং দুই স্থানে 'অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ'– এই পাঁচটি দোষ রয়েছে।

নিমাই বললেন– যদিও শ্লোকে ৫টি অলংকার রয়েছে, তথাপি দোষের কারণে কাব্যের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়েছে। যথা–

যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চদোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ॥[৪২]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৬/৬৮-৬৯

দিগ্বিজয়ী পরাজিত হয়ে ক্রোধ প্রকাশ করে পরিকর সহ স্থান ত্যাগ করলেন এবং চিন্তা করলেন– নিশ্চয়ই দেবীর চরণে অপরাধ হয়েছে। রাত্রে দেবীর নিকটে প্রার্থনা করলে, দেবী দর্শন দিয়ে বললেন– তুমি ভাগ্যবান! তুমি যাঁর নিকটে পরাজিত হয়েছো তিনি আমার প্রভু, তাঁর সম্মুখে যেতে আমি লজ্জা পাই। দিগ্বিজয়ী দেবীর কথা শ্রবণ করে প্রাতে এসে নিমাইয়ের চরণে নিজকে সমর্পণ করলেন। তখন নিমাই তাঁকে বললেন–

'দিগ্বিজয় করিব',–বিদ্যার কার্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে ॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়' ॥[৪৩]

চৈতন্যভাগবত-আদি/১৩/১৭৩, ১৭৮

পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ :

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী নিমাই পণ্ডিতের নিকট পরাজিত হওয়ায় নিমাইয়ের বিদ্যা গৌরব সর্বত্র প্রচারিত হয়। নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মায়ের অনুমতি নিয়ে নিমাই পূর্ব বঙ্গের উদ্দেশে শিষ্যদের

নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। পিতা জগন্নাথ মিশ্রের পিতৃনিবাস ছিল বঙ্গদেশের শ্রীহট্টজেলার ঢাকা দক্ষিণে। পিতামহী একদিন স্বপ্নে দর্শন করলেন যে, দিব্যপুরুষ তাঁর পুত্রবধূ শচী গর্ভে আবির্ভূত হবেন। তাই গঙ্গাতীরবর্তী স্থান নবদ্বীপে পুত্রের সাথে পুত্রবধূকে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন– পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আমাকে দেখাবে। এই প্রতিশ্রুতি মাতার নিকট থেকে শ্রবণ করে পিতামহীকে দর্শন প্রদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে ভ্রমণ করেন।[৪৪] পথিমধ্যে পদ্মাবতীর তীরে এসে সশিষ্য পদ্মায় স্নান করলেন। পদ্মা অতীব পবিত্র। সেই সময়ে নিমাই পণ্ডিতের আগমন বার্তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় বহু লোক নিমাইয়ের নিকটে বিদ্যা শিক্ষা অর্জনে চলে আসেন। সবাই নিমাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সেখানে তপন মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নে দর্শন করলেন যে, নিমাই ঈশ্বরস্বরূপ, সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বিষয়ে তাঁর নিকটে গিয়ে জানতে পার। তখন মিশ্র এসে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশের প্রার্থনা করলে নিমাই বললেন–

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥

চৈতন্যভাগবত-আদি/১৪/১৪৩

মিশ্র কহে, "আজ্ঞা হয়, আমি সঙ্গে আসি"।
প্রভু কহে, "তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী ॥
তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কহিমু সকলতত্ত্ব সাধ্য-সাধন" ॥[৪৫]

চৈতন্যভাগবত-আদি/১৪/১৪৯-১৫০

লক্ষ্মীপ্রিয়ার তিরোধান :

নিমাই পূর্ববঙ্গে ভ্রমণে যাওয়ার কারণে লক্ষ্মীপ্রিয়া বিরহে কাতর হলেন। তিনি আহার ত্যাগ করে রাত্রিতে নিদ্রায় না গিয়ে অঝরে ক্রন্দন করতেন। পতিবিরহ সহ্য করতে না পেরে বিরহরূপ সর্প দংশনে দেহত্যাগ করলেন। *চৈতন্যভাগবতে* পাই–

ঈশ্বর-বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারে সহিতে।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে ॥
নিজ-প্রতিকৃতি-দেহ থুই' পৃথিবীতে।
চলিলেন প্রভু-পাশে অতি অলক্ষিতে ॥[৪৬]

চৈতন্যভাগবত-আদি/১৪/১০৩-১০৪

নিমাইয়ের লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিরহ সহ মোট তিনটি শোকের বেদনা তাঁর হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে। শৈশবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণ, অল্পবয়সে পিতা জগন্নাথ মিশ্রের প্রয়াণ ও যৌবনে পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার অকাল তিরোধান তাঁকে ব্যথিত করে।[৪৭]

নদীয়ায় প্রত্যাবর্তন:

নিমাই পূর্ববঙ্গ বিজয় করে নদীয়ায় সশিষ্য সহ প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ধন-সম্পদ অর্জন করে গৃহে ফিরে মায়ের দুঃখীত মন দেখে বুঝতে পারেন গৃহে কোন অমঙ্গল হয়েছে। দুঃখের কারণ মাতাকে জিজ্ঞেস করলে মাতা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে থাকেন। তখন নিমাই বললেন– মা, আমি সব জানতে পেরেছি। অনিত্য সংসারে জীবন-মরণ ঈশ্বরের খেলা। শোক করা উচিত নয়। সবই ভবিতব্য, কে খণ্ডাতে পারে? এই ভাবে মাকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করেন। *চৈতন্যভাগবতে* পাই–

প্রভু বলে,"মাতা, দুঃখ ভাব' কি-কারণে?।
ভবিতব্য যে আছে, সে খণ্ডিবে কেমনে? ॥
এইমত কাল-গতি, কেহ কারো নহে।
অতএব, 'সংসার অনিত্য' বেদে কহে ॥
চৈতন্যভাগবত-আদি/১৪/১৮৩-১৮৪

বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে বিবাহ:

নিমাই পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে এসে পুনরায় গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হলেন। ঊষাকালেই তিনি চতুষ্পাঠীতে ছাত্রদের শিক্ষাদান শুরু করেন। এদিকে লক্ষ্মীপ্রিয়ার অকাল প্রয়াণে গৃহশূন্য। শচীদেবী শোকে মূহ্যমান। তবুও শচী চিন্তা করেন লক্ষ্মীশূন্য গৃহ। নিমাই যদি বিশ্বরূপের মত সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়। এসব চিন্তা করে পুত্রকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করার লক্ষ্যে পুনরায় বিবাহ দেওয়ার জন্য রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের লক্ষ্মীসমা কন্যা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে পুত্রবধূরূপে মনোনীত করেন। শচীদেবী কাশীনাথ পণ্ডিতকে ঘটকালিতে নিযুক্ত করেন। সনাতন মিশ্রের কন্যার সাথে বিবাহের শুভদিন নির্ধারণ করা হলো। নদীয়ার শ্রেষ্ঠ ধনী বুদ্ধিমন্ত খাঁ নিমাই পণ্ডিতের জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। তিনি বলেন– বামনিয়া বিবাহ হবে না। রাজকুমারের মত জাঁকজমকপূর্ণভাবে বিবাহ হবে। শুভদিনে গোধূলীলগ্নে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। নদীয়ার সর্বত্র আনন্দে মুখরিত। নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়ার সাতপাকে বাঁধা মিলন দর্শন করে সবাই বিমোহিত। মনে করে বৈকুণ্ঠের স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণ। *চৈতন্যভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া ॥
তবে লক্ষ্মী নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি।

করিতে লাগিলা হই মহা-কুতূহলী ॥[৪৮]

চৈতন্যভাগবত-আদি/১৫/১৭৭-১৭৮)

গয়াযাত্রা:

শচীমাতার অনুমতি নিয়ে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানের জন্য নিমাই গয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন। সঙ্গে নিমাইয়ের মেসোমশাই চন্দ্রশেখর আচার্য এবং কয়েকজন ছাত্র ছিলেন। পদব্রজে নিমাই গয়াতে পৌঁছে গয়াসুরের শিরে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে তাঁর প্রেমভক্তির উদয় হয়। তাঁর নয়ন থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে। অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার দেখা গেল নিমাইয়ের দেহে। গঙ্গা ধারার ন্যায় নয়ন থেকে অবিরত অশ্রু ঝরতে থাকে। এই প্রথম নিমাইয়ের প্রেমভক্তির প্রকাশ হয়। কিন্তু দৈবক্রমে সেখানে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর দর্শন হয়। দুজনার মধ্যে ভক্তিভাবে প্রেমালিঙ্গন হয়।[৪৯] নিমাই ঈশ্বরপুরীর নিকট নিজেকে সমর্পণ করেন। পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তিনি গয়াতে পিণ্ডদান করেন। *চৈতন্যভাগবতে* পাই-

ষোড়শগয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া।

সবারে দিলেন পিণ্ড শ্রদ্ধা-যুক্ত হৈয়া ॥[৫০]

চৈতন্যভাগবত-আদি/১৭/৭৬

দীক্ষা গ্রহণ:

নিমাই গয়ায় বিভিন্ন স্থানে পিতৃকার্য সম্পন্ন করে শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকটে মন্ত্র দীক্ষা প্রার্থনা করেন। নিমাইয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে ঈশ্বরপুরী প্রেমে গদগদ। মন্ত্র কেন তিনি নিজেকে পর্যন্ত দান করতে পারেন। নিমাইকে ঈশ্বরপুরী দশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন।[৫১] মন্ত্র লাভ করে নিমাই পণ্ডিত প্রেমে উন্মত্ত হয়েছেন। পূর্বের সেই নিমাই পণ্ডিত এখন আর নেই। তিনি এখন ভক্তিভাবের প্রেমের ভিখারি। তাঁর মধ্যে বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের কোন গর্ব নেই, অহংকার নেই। মহান ভক্তরূপে নিমাই আবির্ভূত হলেন গয়াতে। মন্ত্র জপ করতে করতে উন্মত্ত হয়ে তিনি সঙ্গীদের বলেন– তোমরা গৃহে ফিরে যাও, আমি আর সংসারে ফিরে যাবো না। নিমাই ভক্তিভাবে বিভোর হয়ে মথুরার উদ্দেশে যাত্রা করলে তখন দৈববাণী হয়– "এখন সময় হয় নাই, নবদ্বীপে ফিরে যাও"। এ বিষয়ে *চৈতন্যভাগবতে* পাই-

কতদূর যাইতে শুনেন দিব্য-বাণী।

"এখনে মথুরা না যাইবা, দ্বিজমণি! ॥

যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে।

নবদ্বীপে নিজ গৃহে চলহ এখনে ॥[৫২]

চৈতন্যভাগবত-আদি/১৭/১২৯-১৩০

নদীয়ায় প্রেমভক্তি প্রচারঃ

ঔদ্ধত্যের শিরোমণি নিমাই পণ্ডিত। নিমাই গয়া থেকে নদীয়ায় প্রত্যাবর্তনের পরে নদীয়াবাসী নিমাইকে নতুন ভাবে দর্শন করে। পাণ্ডিত্যের অভিমানে যাঁর হৃদয় শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল, সেই নিমাই এখন কৃষ্ণ প্রেমে গদগদ। তাঁর দেহ পুলকিত, কৃষ্ণবিরহে তিনি উন্মাদের মত আচরণ করেন। কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও ধুলায় গড়াগড়ি দেন, কখনও উচ্চৈঃস্বরে দুই বাহু তুলে কীর্তন করেন। তাঁর নয়ন থেকে অবিরত অশ্রু ঝরে পড়ে। এই দৃশ্য দেখে কেউ তাঁকে গৌরহরি, নদের নিমাই, প্রাণের ঠাকুর, দয়াল গৌরাঙ্গ প্রভৃতি নামে সম্বোধন করেন। এখন তাঁর মধ্যে সেই উদ্ধত আচরণ নেই। তর্ককুশলতা নেই। বিদ্যা গর্বে গর্বিত অহংকারী নিমাই নেই। কোন বিদ্যাচর্চা নেই, শাস্ত্র অধ্যয়ন নেই, আছে শুধু মধুমাখা হরিনাম কীর্তন। শ্রীহরির চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থেকে দিন অতিবাহিত করেন। নিমাই জগৎকে কৃষ্ণময় দর্শন করছেন। তিনি অধ্যাপনার সময় ছাত্রদের সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করছেন। ছাত্রগণ "সিদ্ধ বর্ণসমাম্নায়" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন– "সর্ববর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ"। সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ" সূত্রটি কলাপ-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। টোলের ছাত্রগণ ধাতু সংজ্ঞা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন- "শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার" যা জগৎকে ধারণ করে আছে, তাই ধাতু। "ধাতু সংজ্ঞা কৃষ্ণশক্তি বল্লভ সভার" এই ভাবে নিমাই পাঠদানের ক্ষেত্রেও কৃষ্ণভাবনাময় ছিলেন।[৫৩]

নিমাইয়ের পরিবর্তন দেখে অদ্বৈত, শ্রীবাস ঠাকুর, মুকুন্দ, মুরারি প্রভৃতি বৈষ্ণবরা মহানন্দে আনন্দিত হয়েছেন। নিমাইয়ের হৃদয়ে যে প্রেমভক্তি জাগরিত হয়েছে সেই জন্য তিনি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে ভক্তিধর্মের সভা করলেন। পরবর্তীতে প্রায়ই তিনি শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে হরিনাম কীর্তনের আসর বসাতেন। এই ভাগবতীয় সভার মাধ্যমে তিনি সবাইকে সুদুর্লভ কৃষ্ণ প্রেমলাভ করার জন্য হরিকীর্তন করার উপদেশ প্রদান করতেন। এই সময়ে নিমাইয়ের প্রেমভক্তি ধর্মের প্রচার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় নবদ্বীপসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ভক্তরা নিমাইয়ের সাথে মিলিত হয়। শান্তিপুর থেকে অদ্বৈত আচার্য, ফুলিয়া থেকে হরিদাস ঠাকুর, চট্টগ্রাম থেকে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করে নদীয়ায় ফিরে এসে নিত্যানন্দের সঙ্গে নিমাইয়ের মিলন বৈষ্ণব ইতিহাসে গঙ্গা-যমুনার মিলনের মত। শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি পুরীর শিষ্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ। নিমাইয়ের গুরুদেব শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী হচ্ছেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রপুরীর গুরুভ্রাতা। নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রপুরীর নির্দেশে নবদ্বীপ এসে নিমাইয়ের সাথে মিলিত হলে নদীয়াবাসী নিত্যানন্দকে সাদরে গ্রহণ করেন। অবধূত হিসেবে পরিচিত নিত্যানন্দ নিমাইয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপে সবার নিকটে পূজিত হলেন। নিমাইয়ের প্রেমধর্ম প্রচারে নিত্যানন্দ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৫৪]

প্রকৃতপক্ষে নবদ্বীপে বৈষ্ণব ধর্মের মহাজাগরণ বা মিলন নিমাইয়ের ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমেই সূত্রপাত হয়। ঠিক এই সময়ের সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারীরা একেক করে নিমাইয়ের সঙ্গে মিলিত হন। সঞ্জয়, বাসুঘোষ, শিবানন্দ, নন্দনাচার্য, শ্রীধর, গদাধর, প্রভৃতি সেনাপতি শ্রেণির বৈষ্ণবরা নিমাইয়ের সাথে একত্রিত হয়ে নদীয়ায় প্রেমভক্তিধর্ম প্রচারে সহযোগিতা করেন। *চৈতন্যভাগবতে* আছে–

সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান, শুক্লাম্বর ।

মিলিলা সকল যত প্রেম-অনুচর ॥

হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।

আসিয়া মিলিলা হেথা বৈষ্ণবসমাজ ॥[৫৫]

চৈতন্যভাগবত-মধ্য-১/৮১-৮২

সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।

চিনিলেন নিত্যানন্দ– প্রাণের ঈশ্বর ॥

মনোহর শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ রায়।

ভকত-জন-সঙ্গে নগরে বেড়ায় ॥[৫৬]

চৈতন্যভাগবত-মধ্য/৩/১৮১, ১৮৪

মুরারি গুপ্ত *শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্*-এ চৈতন্যের প্রেমভক্তি প্রকাশ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। যথা–

রোদিতি স দিনং প্রাপ্য প্রবুধ্য রজনীমুখে।

দিবসোঽয়মিতি প্রাহ জনা উচুরিয়ৎ ক্ষপা ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্- ২য় প্রক্রম/১/২২/

ক্বচিদ্‌গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সাদরম্।

সন্নকণ্ঠঃ ক্বচিৎ কম্পরোমাঞ্চিততনুর্ভৃশম্ ॥[৫৭]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্-২য় প্রক্রম/১/২৬

নিমাইয়ের ভক্তিবাদ প্রচারে কোন জাতের বিচার ছিল না। তিনি জাতপাত বিচারের বিরোধী ছিলেন। এমনকি চণ্ডালও যে কৃষ্ণভজন করতে পারেন তার বহু দৃষ্টান্ত তিনি ভক্তিবাদ প্রচারের মাধ্যমে স্থাপন করেছেন। ভক্তিধর্মের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্মের নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। ফলে নতুন সামাজিক পরিবেশে মানুষের জীবন প্রণালীর পরিবর্তন হয়। প্রেমভক্তির ভিত্তিতে সমাজকে সম্প্রসারিত করার জন্য নিমাইয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক করে কিন্তু প্রেমভক্তির ফলে মানুষের সাথে মানুষের ভালবাসার বন্ধন দৃঢ় হয়। প্রকৃতপক্ষে নিমাই ভক্তিকে কেন্দ্র করে শক্তিশালী আধাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বলয়ে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৫৮] নিমাই সর্বশাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করেও তিনি শুষ্কপত্রের ন্যায় সেই পাণ্ডিত্য ভূতলে নিক্ষেপ করে সদ্য বিকশিত প্রেম দ্বারা দেবত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর এই দেবত্ব বা মহত্ত্ব মানবজাতির তপস্যার ফলস্বরূপ।[৫৯]

ড.দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে* বলেছেন-"এই যুবকের হৃদয় শরদভ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও শরৎ-শেফালিকার ন্যায় পবিত্র ছিল; ইহার চাপল্য-স্বচ্ছ, উদ্দাম প্রকৃতির হর্ষময় রসপূর্ণ খেলা,–তাহা সকলের প্রীতি উৎপাদন করিত।"[৬০]

সংকীর্তন আন্দোলন :

সংকীর্তন আন্দোলনের প্রবর্তক হচ্ছেন নিমাই। নিমাই জনসংযোগ, গণ-আন্দোলন এবং জাতিগঠনের নিমিত্তে হরিনাম কীর্তনকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন। কেননা চণ্ডাল থেকে ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেণির মানুষের ঐক্যের ও মুক্তির জন্য এর বিকল্প কোন পথ নেই। একেই তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে নির্ধারণ করেন। নিমাই কীর্তনরূপ প্রেমপ্রবাহে সমগ্র ভারতবর্ষকে অভিসেচন করেছিলেন। সংকীর্তন পদযাত্রা নিমাইয়ের অভিনব সৃষ্টি।[৬১] কেননা নিমাইয়ের মতবাদ হচ্ছে কলিযুগে জীবের নামসংকীর্তনই একমাত্র ধর্ম। এতেই জীবের প্রকৃত কল্যাণ। তাই প্রতি ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার করতে হবে। কলিযুগের ধর্ম সম্পর্কে *বৃহন্নারদীয়পুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে। যথা–

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥[৬২]

বৃহন্নারদীয়পুরাণ-৩৮/২৬

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার ॥[৬৩]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৭/২২

সে কারণে তিনি নেতৃস্থানীয় বৈষ্ণবদের নিয়ে সংকীর্তন আন্দোলন গড়ে তোলেন। নদীয়ার প্রতি নগরে নগরে মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসা, পতাকা-নিষাণা নিয়ে নগর সংকীর্তন করেন। নিমাই নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস ঠাকুর, হরিদাস, সঞ্জয়, মুকুন্দ, বাসুঘোষ, মুরারি গুপ্ত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধর, নন্দনাচার্য, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি অসংখ্য বৈষ্ণব ভক্তদের নিয়ে নগর সংকীর্তন করে হরিনামে মুখরিত করতেন। নদীয়ার সর্বত্র তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে এই সংকীর্তনের প্রভাব। এই ভাবে নিমাই পার্ষদ সহ সংকীর্তন করে নদীয়া হরিনামের বন্যায় ভাষিয়ে দিলেন। নবধর্মের সূচনা হলো। *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলা ॥
'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন' ॥
মৃদঙ্গ-করতাল সঙ্কীর্ত্তন-মহাধ্বনি।
'হরি' হরি' ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি ॥[৬৪]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৭/১২১-১২৩

মুরারি গুপ্ত নিমাইয়ের নগরে নগরে কীর্ত্তনের অদ্ভুত বর্ণনা করেছেন–

হরি সঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা নগরে নগরে প্রভুঃ।
ম্লেচ্ছাদীনুদ্দধারাসৌ জগতামীশ্বরো হরিঃ ॥[৬৫]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্-২/১৭/১১

নিমাইয়ের কীর্তনের মাধ্যমে সমাজের যে পরিবর্তন হয়েছিল, সে সম্পর্কে ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন–"রাজকীয় সহায়তা নাই, আইনের বাধ্যতা নাই, অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনা নাই, বল প্রয়োগের ভীতি নাই, যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের যাদুদণ্ডস্পর্শে বাঙ্গালার একটা মঙ্গলময় রূপান্তর ঘটিয়ে গেল। একজন কৌপীনসম্বল পুরুষের অঙ্গুলীহেলনে কোটী কোটী বাঙ্গালীর এই জাতীয় অভ্যুত্থান!"[৬৬]

নিমাই সঙ্গীদের নিয়ে 'নামকীর্তন' এবং 'নগরকীর্তন' করতেন। তিনি জনসংযোগের প্রধান মাধ্যমরূপে কীর্তনকে ব্যবহার করেছেন। কীর্তনীয়াদের দল সাতটি দলে গঠিত হয়েছিল। নিমাই কীর্তনকে প্রেমভক্তি প্রচারের সর্বোত্তম কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেন। কীর্তনে উঁচুনীচু ছিলনা। কীর্তনে ছন্দের তালে নৃত্য করা হতো। এখানে কোন যুক্তি, বুদ্ধির কলাকৌশল ছিলনা, ছিলনা কোন বিশেষ নন্দনতত্ত্ব। কীর্তনে ভাবের বিহ্বলতায় কীর্তনকারী, দর্শক, শ্রোতা, নারী-পুরুষ-আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ভাবে কম্পিত হয়ে হেসেছেন, নেচেছেন, কেঁদেছেন, অঙ্গে ধুলা মেখে গড়াগড়ি দিয়েছেন।[৬৭] কীর্তনে ভাবের গভীরতার অপূর্ব বর্ণনা–

জ্যোতির্ম্ময় কনক-বিগ্রহ বেদ-সার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার ॥
চাঁচর-চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি' সর্ব্বকলা ॥[৬৭ক]

চৈতন্যভাগবত-মধ্য/২৩/১৭৬-১৭৭

ড. দীনেশচন্দ্র সেন *বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে* বলেছেন–"এরূপ অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যজড়িত ছবি ইতিহাসের পটে যুগযুগান্তর পরে একবার প্রকটিত হইয়া থাকে। বক্তার গুণ নহে, রূপ দেখাইয়া চৈতন্যদেব পৃথিবী মোহিত করিলেন; শিশির স্নিগ্ধকুসুমসৌরভ বক্তৃতার দ্বারা উপলব্ধি করাইতে হয় না। চৈতন্যদেব স্বীয় ভক্তিময় অশ্রুসিক্ত মূর্তিখানি দ্বারে দ্বারে দেখাইয়াছেন, যে দেখিয়াছে সে ভুলিয়াছে; ----- হরিনাম করিতে করিতে তাঁহার অঙ্গ পুলকিত ও চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছে, তখন সেই চক্ষু ফাটিয়া অতিমনোহর মুক্তাদাম পতিত হইয়াছে"।[৬৮]

জগাই-মাধাইয়ের প্রতি অনুগ্রহ:

নবদ্বীপ নগরে দুজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁদের নাম ছিল জগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাধবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা নগরে কোতোয়ালের কাজ করতেন। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও মদ্য পান থেকে শুরু করে এমন কোন জঘন্য আপরাধ নেই, যা তাঁরা করতেন না। দয়ার সাগর নিত্যানন্দ তাঁদের পাপ কর্ম থেকে মুক্তির জন্য চিন্তা করতে থাকেন। নিমাইয়ের নির্দেশে নিত্যানন্দ ও হরিদাস হরিনাম কীর্তনে বের হলে জগাই-মাধাইয়ের সাথে দেখা হলে

বললেন– "বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ-নাম।" এই নাম শুনে মাধাই ভাঙ্গা কলসীর কানা দিয়ে নিতাইকে আঘাত করলে, নিতাইয়ের কপাল কেটে দর দর করে রক্ত বের হলেও তিনি আবার বললেন– মেরেছিস ভাই, তারপরও হরিনাম কর ভাই! *চৈতন্যভাগবতে* পাই–

'উদ্ধারিব দুইজন'–হেন আছে মনে।
অতএব নিশায় আইলা সেইস্থানে ॥
'অবধূত' নাম শুনি' মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া ॥
ফুটিল মুটকী শিরে,- রক্ত পড়ে ধারে।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু, গোবিন্দ সঙরে ॥

চৈতন্যভাগবত-মধ্য/১৩/১৭৭-১৭৯

কিন্তু এই সংবাদ নিমাই শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থলে এসে দৃশ্য দর্শন করে চক্র চক্র বলে আহ্বান করলে কৃপার ঠাকুর নিতাই নিমাইয়ের চরণ ধরে অনুরোধ করলেন, ক্ষমা করে মুক্তি দিতে। নিমাই-নিতাই দুইজনে ক্ষমা করে তাঁদের অনুগ্রহ করে নবজীবন দান করলেন। চৈতন্য ইতিহাসে জগাই-মাধাইয়ের প্রতি গৌর-নিতাইয়ের কারুণ্যপূর্ণ দয়া উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। *চৈতন্যভাগবতে* পাই–

রক্ত দেখি' ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
'চক্র, চক্র, চক্র'– প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে ॥
আথেব্যথে চক্র আসি' উপসন্ন হৈলা।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিলা ॥

চৈতন্যভাগবত-মধ্য/১৩/১৮৫-১৮৬

হেনমতে দু'-জনেতে পাইল মোচন।
দুই জনে স্তুতি করে দু'য়ের চরণ।[৬৯]

চৈতন্যভাগবত-মধ্য/১৩/২২৪

নিমাইয়ের ঐশ্বর্য প্রকাশ:

নিমাইয়ের সখা ছিলেন মুরারি গুপ্ত। কিন্তু মুরারি শ্রীরাম চন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। একদিন নিমাই মুরারির গৃহে বরাহরূপ ধারণ করে তর্জন গর্জন করতে শুরু করেন। তখন মুরারি সেইরূপ দর্শন করে স্তব স্তুতি করেন এবং তাঁর ইষ্টদেব রামমূর্তি দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। তৎক্ষণাৎ নিমাই রামমূর্তি ধারণ করে মুরারির অভিলাষ পূরণ করেন। যথা–

মহাবেগে আইসে হের দেখহ বরাহে।

দন্ত সারি' আইসে মোরে মারিবারে চাহে ॥
দুই দন্ত সারি' মোরে মারিবে শূকর।
ইহা বলি প্রবেশিলা দেবতার ঘর ॥[৭০]

চৈতন্যমঙ্গল-মধ্য/১/৮৯-৯০

এতেক কহিতে মাত্র দেখে সেইক্ষণে।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম জানকী-জীবনে ॥
লক্ষ্মণ-ভরত আর শত্রুঘ্নাদি যত।
দেখিয়া মুরারি হইল আনন্দে পূরিত ॥[৭১]

চৈতন্যমঙ্গল-মধ্য/১/১১৮-১১৯

নিমাই তাঁর পরম ভক্তদের সম্মুখে বিভিন্ন সময়ে ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন। একদিন নিমাই একটি আমের বীজ রোপণ করেন, সাথে সাথে বীজ অঙ্কুরোদ্‌গম হয়ে গাছে পরিণত হয় এবং মুকুলিত হয়। ক্রমে ক্রমে সেই মুকুল ফলে পরিণত হয় এবং সেই ফল সেই সময়ে পক্কফলে পরিণত হয়। তাঁর ভক্তগণ এই দৃশ্য দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত হয়। নিমাই এই ঘটনাকে মায়াময় অনিত্য সংসার জীবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। *চৈতন্যমঙ্গলে* পাই-

তখনি হইল ফল- পাকিল সেখানে।
অঙ্গুলি হেলাঞা প্রভু দেখায় সভারে ॥
পাড়িয়া আনিল ফল দেখে সব লোকে।
নিবেদন করি' দিল ঈশ্বর সম্মুখে ॥[৭২]

চৈতন্যমঙ্গল-মধ্য/২/৩৫-৩৬

নিত্যানন্দ বা নিতাই হচ্ছেন নির্মাইয়ের প্রাণস্বরূপ। শ্রীবাস ঠাকুরের মন্দিরে ব্যাসপূজার আয়োজন করলে ব্যাসপূজার ছলে নিমাই নিত্যানন্দের সম্মুখে ষড়ভুজরূপে আবির্ভূত হলেন। নিমাইয়ের ষড়ভুজরূপ দর্শন করে নিতাই মূর্ছিত হলেন। যথা–

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল-মুষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলা নিতাই বিহ্বল ॥
ষড়ভুজ দেখি' মূর্চ্ছা পাইলা নিতাই।
পড়িলা পৃথিবীতলে ধাতু-মাত্র নাই ॥[৭৩]

চৈতন্যভাগবত-মধ্য/৫/৯৩-৯৪

অদ্বৈত আচার্যের দীর্ঘদিনের হৃদয়ের অভিলাষ হচ্ছে রথে উপবিষ্ট অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ দর্শন করেছিলেন, সেই রূপ দর্শন করার। নিমাইকে এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করলে নিমাই সেই দিব্য শ্যামসুন্দর মুরলীরূপ অদ্বৈতকে দর্শন করালেন। *চৈতন্যভাগবতে* পাই–

বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।

চতুর্দ্দিকে সৈন্য-দলে মহা-যুদ্ধপথ ॥
রথের উপরে দেখে শ্যামল-সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ॥[৭৪]

চৈতন্যভাগবত-মধ্য/২৪/৪৮-৪৯

একদিন শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন হলেও, নিমাই বিষ্ণুর খট্টাতে উপবেশন করে ভাব প্রকাশ করে তাঁর অভিষেক করার কথা ভক্তদের বললেন। অন্যান্য ভক্তরা তৎক্ষণাৎ পুরুষসূক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে গঙ্গা জল দিয়ে তাঁর অভিষেক করলেন। এই সময়ে নিমাই তাঁর ঐশ্বর্য প্রকাশ করে বিভিন্ন ভক্তকে তাঁর দিব্য রূপ দর্শন দান করে ভক্তবাঞ্ছা পূরণ করেন। তিনি মুকুন্দ, হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস ঠাকুর, শ্রীধর প্রভৃতি ভক্তকে নিজ নিজ অভিলাষ অনুসারে অভিলাষ পূরণ করে বর দান করেন। এই সময়ে নিমাই একটানা সাত প্রহর অর্থাৎ একুশ ঘণ্টা ভক্তদের নিয়ে দিব্য ভাব প্রকাশ করেন। এই দিব্য ভাব প্রকাশকে নিমাইয়ের সাত প্রহরিয়া ভাব প্রকাশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *চৈতন্যভাগবতে* পাই-

আর সব দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া ॥
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে ছাড়ি সর্ব্ব মায়া।
বসিলা প্রহর-সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া ॥

চৈতন্যভাগবত-মধ্য/৯/১৮-১৯

অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি যতেক প্রধান।
পড়িয়া পুরুষসূক্ত করায়েন স্নান ॥[৭৫]

চৈতন্যভাগবত-মধ্য/ ৯/৩০

কাজী দলন:

গৌড়ের নবাব ছিলেন হুসেন শাহ্। হুসেন শাহের অধীনস্থ নদীয়ার শাসনকর্তা ছিলেন মৌলানা সিরাজ উদ্দিন। কিন্তু তাঁর ডাক নাম ছিল চাঁদকাজী। সেই সময় নদীয়ায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এবং তন্ত্র সাধনার খুব প্রভাব ছিল। কিন্তু তখন তন্ত্র সাধনার নামে মূলত এক শ্রেণি যত প্রকার কুকর্ম আছে, তা সবই করত। ধর্মের ছলে অধর্মের উত্থান হলো। নিমাইয়ের প্রাণধর্মরূপ সংকীর্তন আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন এই হিন্দুধর্মের তান্ত্রিক শ্রেণিরা। ধর্মীয় উগ্রবাদীরা শাসনকর্তা সিরাজ উদ্দিন কাজীর নিকটে গিয়ে নালিশ করেন যে- নিমাই গয়া যাবার পূর্বে ভাল ছিল। কিন্তু এখন হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করার ফলে মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হচ্ছে এবং দিনরাত কীর্তনের শব্দে সুস্থ ভাবে ঘুমানো যাচ্ছেনা, তাই নিমাইয়ের কীর্তন বন্ধ করতে হবে। এই ভাবে বিরোধীরা কাজীর নিকটে নালিশ করেন। *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ বর্ণনা করা হয়েছে–

এত শুনি' তা-সবারে ঘরে পাঠাইল।

হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল ॥
আসি' কহে,– হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই ॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥
হিন্দুশাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম– মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ॥[৭৬]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি / ১৭/ ২০৩-২০৪, ২১১-২১২

একদিন কাজী সিরাজ উদ্দিন শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়ির নিকটের রাস্তা দিয়ে সিপাহি সহ যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তনের শব্দ শুনে সেখানে গিয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মৃদঙ্গ ভেঙ্গে দিলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে ভয় দেখিয়ে বললেন– আজতো মৃদঙ্গ ভাঙ্গলাম, এর পরেও যদি কীর্তন করিস, তাহলে তোদের জাতি নিব এবং সর্বস্ব লুণ্ঠন করব। *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাই–

ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল ॥
এতকাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও, কার বল জানি ॥
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে ।
আজি আমি ক্ষমা করি' যাইতেছোঁ ঘরে ॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥[৭৭]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৭/১২৫-১২৮

নিমাই ভক্তমুখে মৃদঙ্গ ভঙ্গ ও কীর্তনের নিষেধাজ্ঞার কথা শ্রবণ করে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন এবং তিনি ভক্তদের বললেন– ভয় করিও না, প্রত্যেকে একটি মশাল নিয়ে আসবে। দলে দলে সবাই মিলে মহাসংকীর্তন আন্দোলন সহকারে আমরা কাজীর বাড়িতে যাবো। কাজীর এই নিষেধাজ্ঞা আমি মানিনা। সন্ধ্যাহলে নিমাইয়ের নেতৃত্বে অদ্বৈত, হরিদাস, নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীবাস, মুরারি, চন্দ্রশেখর,শুক্লাম্বর প্রভৃতি শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সহ বহুভক্ত মহাসংকীর্তন সহকারে হাতে মশাল নিয়ে কাজীর বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আইন অমান্য করে সংকীর্তন পদযাত্রা আন্দোলনের সূত্রপাত এই প্রথম। কাজী এই দৃশ্য দর্শন করে ভয়ে ঘরের ভিতরে লুকিয়ে থাকেন। তাঁর সিপাহির মধ্যে কারো দাড়ি পুড়ে গেছে অগ্নিশিখায়। কেউ ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করেছেন। আন্দোলনের মধ্যে কেউ কেউ আবার তর্জন গর্জন করে কাজীকে আঘাত করার জন্য বৃক্ষ

থেকে ডাল ভাঙ্গে, কেউ ফুলের বাগান তছনছ করে, কেউ আবার বলে কাজীর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দাও। এ বিষয়ে *চৈতন্যভাগবতে* পাই–

বারকোনা-ঘাটে,' 'নগরিয়া-ঘাটে' গিয়া।
'গঙ্গারনগর' দিয়া গেলা 'সিমুলিয়া' ॥
লক্ষ কোটি মহাদীপ চতুর্দ্দিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চতুর্দ্দিকে 'হরি' বলে ॥[৭৮]

চৈতন্যভাগবত-মধ্য/২৩/৩০০-৩০১

কেহ ঘর ভাঙ্গে, কেহ ভাঙ্গেন দুয়ার।
কেহ লাথি মারে, কেহ করয়ে হুঙ্কার ॥
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া ॥[৭৯]

চৈতন্যভাগবত-মধ্য/২৩/৩৯৩, ৩৯৫

এইভাবে নিমাইয়ের সঙ্গীরা কাজীর বাড়ি ঘেরাউ করে কাজীকে ডাকাডাকি করেন। নিমাই সবাইকে শান্ত হয়ে ধৈর্য ধারণ করতে বললেন। নিমাই অভয় দিলে কাজী অবনতমস্তকে নিমাইয়ের নিকটে এসে করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকেন। নিমাই মধুর স্বরে বললেন–আমি আপনার অতিথি, আপনি আমাকে দেখে লুকিয়ে আছেন কেন? তখন কাজী বললেন– তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী গ্রাম সম্বন্ধে আমার চাচা, সেই সূত্রে তুমি আমার ভাগ্নে। তুমি শান্ত হয়েছো বিধায় আমি নিশ্চিন্ত হলাম। এই সময়ে নিমাই ও সিরাজ উদ্দীন কাজীর মধ্যে উভয়ের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনায় কাজী নিমাইয়ের নিকট পরাজিত হয়। তখন নিমাই কাজীকে জিজ্ঞাসা করেন, মামা, আপনি সেদিন মৃদঙ্গ ভেঙ্গেছেন এবং কীর্তনে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছেন, কিন্তু আজ আইন অমান্য করে সংকীর্তন আন্দোলন করা হলে নিবারণ করলেন না কেন? উত্তরে কাজী ভক্তদের সম্মুখে নিমাইকে বললেন– সেদিন স্বপ্নে এক ভয়ঙ্কর রূপধারী অর্ধেক নর ও অর্ধেক সিংহ রূপী আমাকে প্রচণ্ডভাবে শাসন করলেন। আমার বুকের মধ্যে নখের আঘাত বসিয়ে দিয়ে বললেন– আর যদি সংকীর্তনে বাধা দিস্, তাহলে তোর বুক দুই ভাগ করে ফেলবো। *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাই-

সেই রাত্রে এক সিংহ মহা-ভয়ঙ্কর।
নরদেহ, সিংহমুখ, গর্জ্জয়ে বিস্তর ॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি'।
অট্ট অট্ট হাসে, করে দন্ত-কড়মড়ি ॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর- স্বরে বলে।
ফাঁড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥[৮০]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৭/১৭৯-১৮১

এত কহি' সিংহ গেল, আমার হৈল ভয়।
এই দেখ, নখচিহ্ন আমার হৃদয় ॥
এত বলি' কাজী নিজ-বুক দেখাইল।
শুনি' দেখি' সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল ॥[৮১]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৭/১৮৬-১৮৭

কাজীর কথা শ্রবণ করে নিমাই কাজীকে বললেন– আপনার কাছে আমার একটি দাবী আছে, তাহলো– নদীয়ায় কখনও কীর্তন বন্ধ করা যাবে না। সেই কথা শুনে কাজী বললেন– আমি এবং আমার বংশের কেউ কোনদিন তোমার কীর্তনে বাধা প্রদান করবে না। করলে তাকে আমি তালাক দিব অর্থাৎ সম্পর্ক ত্যাগ করে নগর থেকে বের করে দিব। *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাই–

এত শুনি' কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি।
প্রভুর চরণ ছুঁই' বলে প্রিয়বাণী ॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর, যেন তোমাতে রহু ভক্তি ॥
প্রভু কহে,– এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সঙ্কীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায় ॥
কাজী কহে,– মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে 'তালাক' দিব, কীর্ত্তন না বাধিবে ॥[৮২]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৭/২১৯-২২২

এভাবে সিরাজ উদ্দিন কাজীর হৃদয় পরিবর্তিত হলো। বর্তমানেও নদীয়ার বামন পুকুর স্থানে চাঁদকাজীর সমাধি রয়েছে। সমাধির উপরে বৃহৎ গোলক চাপা বৃক্ষ রয়েছে। পাঁচশত বৎসরের সাক্ষী সেই বৃক্ষ দেখে মনে হয় ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। কাজীর সেই সমাধি চৈতন্যদেব কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের সংকীর্তন আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ড. বিমান বিহারী মজুমদার *চৈতন্যচরিতের উপাদান* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন- নিমাই পৌষের শেষে গয়া থেকে গৃহে ফিরে আসেন। মাঘ মাস থেকে বৈশাখ পর্যন্ত অর্থাৎ ৪ মাস তিনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। পরে জ্যৈষ্ঠ হতে ৮ মাস তিনি ছাত্রদের পড়াতে পারেননি। তিনি তখন নৃত্য-কীর্তনে মগ্ন ছিলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ১৪৩১ শকের ২৯শে মাঘ। সে হিসেবে তিনি গয়া থেকে ফিরে এসে মোট ১৩ মাস নদীয়ায় নগর সংকীর্তন ও ভক্তদের নিয়ে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করেছেন।[৮৩]

প্রব্রজ্যা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত :

নিমাই জগৎ সংসারে মানবকে শিক্ষা প্রদানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু সবাইতো নিমাইয়ের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে সম্যক অবগত নয়। নিমাই গৃহে বসে একদিন 'গোপী গোপী' নাম জপ করতে থাকেন।

কিন্তু এক পড়ুয়া ব্রাহ্মণ নিমাইকে ঐ মন্ত্র জপ না করার অনুরোধ করেন। নিমাই তখন রেগে গিয়ে তাকে তাড়া করেন। কিন্তু পড়ুয়া ব্রাহ্মণ তার সঙ্গীদের নিকট এই বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং নিমাই সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাবে নিন্দা করেন। কিন্তু তিনি তা জানতে পেরে মনে মনে চিন্তা করলেন। মানবকল্যাণের জন্য সর্বদা নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছি অথচ সেই মানবগণ আমার বিরোধী।[৮৪] এ সকল কারণে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প নিত্যানন্দের নিকট প্রকাশ করেন। নিমাই নিতাইয়ের নিকটে হেয়ালী ভাষায় যা বলেছেন তা *চৈতন্যভাগবতে* পাই–

"করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে"॥[৮৫]

চৈতন্যভাগবত-মধ্য /২৬/১২১

নিমাই চিন্তা করলেন যে, যখন আমি যোগপট্ট ধারণ করে জগৎ কল্যাণের জন্য সন্ন্যাসী হয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করব, তখন আর আমার কেউ বিরোধী থাকবে না। সকল সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে পৌঁছাতে না পারলে ধর্মমত যথার্থভাবে প্রচার করা যায় না। তাই নিমাই অনিত্য সংসারের মোহমায়া ত্যাগ করে শেষ আশ্রম সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥
প্রণতিতে হ'বে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥
এ-সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাহি, এই যুক্তি সার ॥[৮৬]

চৈতন্যচরিতামৃত-আদি/১৭/২৫৮-২৬০

কিন্তু পুত্র নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদ মাতা শচীদেবী জানতে পেরে ক্রন্দন করতে করতে মূর্ছিত হলেন। দু'নয়ন থেকে গঙ্গা ধারার মতো অশ্রু ঝরতে থাকে। বুক ফাটা আর্তনাদ, গগন বিদারী কান্নার শব্দে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে! নিমাই কি করে এত নিষ্ঠুর হলো? একমাত্র অবলম্বন পুত্র নিমাই আমাকে ছেড়ে চিরতরে চলে যাবে। আর কোনদিন চাঁদের মত বদনখানি দেখতে পাব না! বৃন্দাবনদাস ঠাকুর *চৈতন্যভাগবতে* ভাটিয়ারী রাগে শচীর নিদারুণ বেদনা প্রকাশ করেছেন। যথা–

"না যাইয় না যাইয় বাপ, মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ চাহিয়া ॥[৮৭]

চৈতন্যভাগবত-মধ্য/২৭/২২

মধ্যলীলা

সন্ন্যাস গ্রহণ :

নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রথমে নিত্যানন্দকে জ্ঞাপন করলেন। নিত্যানন্দ শ্রবণ করে স্তম্ভিত হলেন। শচীদেবীর ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে নিত্যানন্দ বিষণ্ণচিত্ত হলেন। নিমাই মুকুন্দ ও গদাধরকেও জানালেন। তাঁরা উভয়েই মর্মাহত হলেন এবং সন্ন্যাস থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করলেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হলো তাঁর বজ্রসম সিদ্ধান্তে। তিনি নিত্যানন্দকে বলেছেন–সন্ন্যাসকালে কাটোয়ায় যেন চন্দ্রশেখর আচার্য, গদাধর, মুকুন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও তিনি উপস্থিত থাকেন। তিনি রাত্রি শেষে গৃহত্যাগ করার সময় মাতার অনুমতি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করার সময় শচীমাতা অশ্রু প্রবাহিত নয়নে গদগদ কণ্ঠে অনেক অনুরোধ করলেন এবং বললেন–এই অভাগিনীকে পরিত্যাগ করে যেও না! নিমাই অনেক তত্ত্ব কথা ও প্রবোধ দিয়ে সর্বশেষবারের মত মাতাকে প্রণাম করে গৃহত্যাগ করে গঙ্গাঘাট পার হয়ে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর আশ্রমে পৌঁছালেন। এদিকে পূর্বের কথামত নিমাইয়ের পিছনে পিছনে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য, মুকুন্দ, গদাধর ও ব্রহ্মানন্দ এই পাঁচজন কেশব ভারতীর আশ্রমে পৌঁছালেন। নিমাই কেশব ভারতীর চরণে আত্মসমর্পণ করে নিবেদন করলেন যে–সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করার জন্য আমাকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করুন। সকল বিধি অনুসরণ করে যজ্ঞ সম্পাদন করে কেশব ভারতী নিমাইকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। নিমাইকে সন্ন্যাসের নববস্ত্র ও যোগপট্ট এবং ত্রিদণ্ড প্রদান করলেন এবং নাম রাখলেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করে নবরূপে গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে হস্তে দণ্ড ধারণ করে দিব্যকান্তির উজ্জ্বল-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হলেন। ত্যাগের মাধ্যমে শাশ্বত প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করার জন্য জগৎকল্যাণে নিজেকে ধর্মযজ্ঞে আহুতি দিলেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর *চৈতন্যভাগবতে* সন্ন্যাসের প্রতিচ্ছবি বর্ণনা করেছেন–

জননীর পদ-ধূলি লই' প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি' তানে চলিলা সত্বরে ॥
চলিলেন বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহ হইতে।
সন্ন্যাস করিয়া সর্ব্ব জীব উদ্ধারিতে ॥[৮৮]

চৈতন্যভাগবত-মধ্য/১৮/৬২-৬৩

"যত জগতেরে তুমি 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য–কীর্ত্তন প্রকাশিয়া ॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্বলোক তোমা' হইতে যাতে হইল ধন্য"॥[৮৯]

চৈতন্যভাগবত-মধ্য/১৮/১৭৫-১৭৬

শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্যদেবঃ

শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরে বৃন্দাবন দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তিনি কৃষ্ণনাম কীর্তনের প্রেমে আত্মহারা। কেঁদে কেঁদে দু'নয়ন থেকে অশ্রু ঝরছে। এভাবে তিনদিন তিনি রাঢ় দেশের পথে পথে ঘুরলেন। অনুগামী নিত্যানন্দ এই অবস্থায় তাঁকে গঙ্গাকে যমুনা বলে বৃন্দাবনের পথ ভুলিয়ে শান্তিপুর অদ্বৈতাচার্যের গৃহে নিয়ে আসেন। মুহূর্তেই খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এক পলক তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করার জন্য সকলে ছুটে আসে। অদ্বৈতের বাড়ী জনসমুদ্রে পরিণত হয়। চন্দ্রশেখর আচার্য শচীমাতাকে নবদ্বীপ থেকে নিয়ে আসেন পুত্রকে দর্শন করানোর জন্য। শ্রীচৈতন্যদেব মাতাকে দর্শন করে তাঁর চরণে পতিত হয়ে ষাষ্টাঙ্গে প্রণতি নিবেদন করেন। মাতা শচীদেবী যেন দেহে প্রাণ ফিরে পেলেন। মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য বলে প্রণাম জানালেন নিমাই।

সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিমাই বৃন্দাবনে যাবেন এই তাঁর সংকল্প। শচীদেবী নিতাই ও অদ্বৈতের সাথে পরামর্শ করে জগন্নাথ ধাম পুরীতে থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। কেননা এই জগতে চৈতন্যদেব ছাড়া শচীর অন্য কেউ নেই। তাই পুত্র পুরীতে থাকলে নিয়মিত সংবাদ আদান প্রদান করতে পারবেন। বৃন্দাবন অনেক দূরে। তাই স্থির করলেন যাতে একদিকে পুত্রের সন্ন্যাস ধর্ম পালন হয় এবং অন্যদিকে বেঁচে থাকার শেষ সম্বল পুত্রের সংবাদ পেয়ে জীবন ধারণ করতে পারেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করেছেন–

তোমা-সব না ছাড়িব, যাবৎ আমি জীব'।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,–নহে সন্ন্যাস করিঞা।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লঞা ॥[৯০]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/৩/১৭৬-১৭৭

তেহোঁ যদি ইঁহা রহে, তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি, তবে মোর দুঃখ ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল, মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয় ॥
নীলাচলে-নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক-গতাগতি-বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥[৯১]
চৈতন্যচরিতামৃত- মধ্য/৩/১৮১-১৮৩

নীলাচল যাত্রা :

শান্তিপুরে দশদিন থাকার পরে শচীদেবীর অনুমতি নিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল যাত্রা করেন। তাঁর চার জন সঙ্গী হলেন। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ ও দামোদর পণ্ডিত। তিনি গঙ্গাতীরবর্তী পথ অবলম্বন করে ছত্রভোগ এসে, সেখান থেকে রেমুনায় পৌঁছলেন। রেমুনায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করলেন। মাধবেন্দ্র

পুরীর জন্য গোপীনাথ বিগ্রহ নীজ আঁচলের নীচে ক্ষীর চুরি করে রেখে দিয়েছিলেন। সেই থেকে এই মন্দিরের বিগ্রহের নাম হয় ক্ষীরচোরাগোপীনাথ। সেখান থেকে যাজপুর হয়ে কটকে পৌছান। কটকে সাক্ষীগোপাল নামে বিগ্রহ আছে। সেই বিগ্রহ দর্শন করেন। পূর্বে বিদ্যানগরে দুই ব্রাহ্মণকে কেন্দ্র করে বৃন্দাবন থেকে গোপাল এসে সাক্ষী প্রদান করেন মর্মে সেই থেকে এই মন্দিরের বিগ্রহের নাম হয় সাক্ষীগোপাল। পুরীর রাজা পরবর্তীকালে যুদ্ধে জয়লাভ করে বিদ্যানগর থেকে সাক্ষী গোপালের বিগ্রহকে কটকের মন্দিরে স্থাপন করে নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন। সেখান থেকে তিনি সঙ্গীসহ ভুবনেশ্বরের কমলপুরে পৌছান। কমলপুরে ভার্গী নদীতে তিনি স্নান করেন। তাঁর অসাক্ষাতে নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের দণ্ড ভেঙ্গে ফেলে দেন। কিন্তু চৈতন্যদেব ভাবাবেশে থাকায় তিনি দণ্ডভঙ্গের ঘটনা জানতে পারে নাই। তবে তিনি নৃত্য ও কীর্তন সহকারে যখন আঠারো নালায় পৌছালেন অর্থাৎ জগন্নাথ পুরী মন্দিরের কাছাকাছি যখন এলেন তখন তিনি নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড চাইলে নিত্যানন্দ বললেন– আমি দণ্ড ভেঙ্গে ফেলেছি। কারণ, যাঁকে আমি হৃদয়ে ধারণ করি সেই দণ্ডের আবার কিসের প্রয়োজন? ঘটনাচক্রে চৈতন্যদেব অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন– শেষ সম্বলকেও ভেঙ্গে দিলে। তোমরা প্রথমে যাও অথবা আমি প্রথমে যাই। মুকুন্দের অনুরোধে চৈতন্যদেব নৃত্য ও কীর্তন ভাবে বিভোর হয়ে দ্রুত বেগে গিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করে জগন্নাথকে দর্শন করে মূর্ছিত হলেন। তিনি জগন্নাথ বিগ্রহকে প্রেমাবেশে আলিঙ্গন করতে চাইলেন। কিন্তু সেখানকার পাণ্ডা ও পরিছা দল তাঁর চারপাশ ঘিরে ধরলেন এবং যদি তিনি সত্যি স্পর্শ করতেন, তাহলে তারা তাঁকে প্রহার করতো। ঘটনাচক্রে সেই সময়ে উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সবাইকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিলেন। তিনি দেখলেন তরুণ যুবক দিব্য দেহধারী এক সন্ন্যাসী। পরীক্ষা করে দেখলেন দেহে শ্বাস প্রায় নেই এই অবস্থা। নিশ্চয়ই দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার হয়েছে। সাধারণ কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। তবে নিজে তাঁর পুত্রকে দিয়ে চৈতন্যদেবকে অচৈতন্য অবস্থায় সার্বভৌমের গৃহে নিয়ে এলেন। এদিকে তাঁর সাথীরা তাঁকে না পেয়ে সার্বভৌমের ভগ্নিপতি গোপীনাথ আচার্যের নিকট সংবাদ পেয়ে সার্বভৌমের গৃহে তাঁকে দর্শন করেন। তৃতীয় প্রহরে কীর্তন শ্রবণে চৈতন্যদেবের বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে। তখন সার্বভৌমের সাথে পরিচয় হয়।[৯২]

বাসুদেব সার্বভৌমের সাথে বেদান্ত আলোচনা :

ভারতবর্ষে বেদান্তের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন বাসুদেব সার্বভৌম। তিনি ন্যায়শাস্ত্র ও বেদান্তের প্রথীতযশা অধ্যাপক ছিলেন। উড়িষ্যাতে বহু ছাত্র তাঁর নিকটে অধ্যয়ন করতেন। তাঁর জন্ম নবদ্বীপে। তাঁর পিতা ছিলেন মহেশ্বর বিশারদ। তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য প্রতিভা দর্শনে উড়িষ্যার গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁকে সভাপণ্ডিতের আসনে অলংকৃত করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সাথে পরিচয় পর্বে সার্বভৌম তাঁকে 'নমো নারায়ণায়' বলে সম্বোধন করলেন। চৈতন্যদেব তাঁকে "কৃষ্ণে মতিরস্তু" এই বাক্যবলে আশীর্বাদ করলেন। সার্বভৌম তখন বুঝতে পারলেন নবীন সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী। সার্বভৌম তাঁর ভগ্নিপতি গোপীনাথ আচার্যের নিকট থেকে জানতে পারলেন শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বাশ্রমের পরিচয়। বিখ্যাত পণ্ডিত নীলাম্বর

চক্রবর্তীর পৌত্র এবং জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র তিনি। সার্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল নীলাম্বর চক্রবর্তী ও জগন্নাথ মিশ্র এই দু'জন। সেই সূত্রে সার্বভৌম চৈতন্যদেবকে অতি মান্য ও স্নেহ করতেন। কিন্তু অতিস্নেহে তাঁর শঙ্কা, নবীন বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম, তাও আবার ভাবাবেশে নৃত্য কীর্তনে রত। তাই তিনি গোপীনাথ আচার্যের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন তিনি চৈতন্যদেবকে বেদান্ত শিক্ষা প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনে নতুন করে যোগপট্ট প্রদান করবেন। সেই সূত্র ধরে বেদান্ত অধ্যয়নে চৈতন্যদেব উপস্থিত হলে সার্বভৌম বললেন–তুমি নবীন সন্ন্যাসী, তোমার উচিত বেদান্ত পাঠ করা। চৈতন্যদেব বিনয়ের সাথে তাঁর নির্দেশ মেনে নিয়ে এককভাবে সাত দিন সার্বভৌমের বেদান্ত পাঠ শ্রবণ করেন। কোন প্রশ্ন না করায় সার্বভৌম চৈতন্যদেবকে বললেন– তুমি বেদান্তের অর্থ বুঝতে পেরেছ কি ? তখন তিনি উত্তরে বললেন– ব্যাসদেবের মুখ্যসূত্র আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনার কল্পিত ব্যাখ্যা বুঝতে পারছিনা। তখন আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন– তাহলে তুমি ব্যাখ্যা করে শুনাও। তখন চৈতন্যদেব ব্যাখা করলেন, ঈশ্বর হচ্ছে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। তিনি সচ্চিদানন্দময়। তাঁর তিন শক্তি– হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী। বেদের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিন পন্থায় তাঁকে জানা যায়। তাঁর ব্যাখ্যা শুনে সার্বভৌম স্তম্ভিত হলেন। চৈতন্যদেব তাঁকে 'আত্মারামাশ্চ মুনয়' ভাগবতের এই শ্লোকের ব্যাখা করতে অনুরোধ করলে, সার্বভৌম নয় প্রকার ব্যাখা করলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব ঐ শ্লোকের সার্বভৌমের ৯ প্রকার ব্যাখ্যাকে এড়িয়ে নতুনভাবে আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করলেন। তখন সার্বভৌম তাঁকে ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন এবং বললেন– তর্কশাস্ত্রের জ্ঞানে আমার মনপ্রাণ শুষ্ক হয়ে গেছে, আমি লৌহপিণ্ডের মত হয়েছিলাম। তুমি আমাকে সূত্র ব্যাখ্যা করে সঠিক সিদ্ধান্তে মুক্তির পথ পরিষ্কার করে দিলে। *চৈতন্যচরিতামৃতে* এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভাগবতের ১/৭/১০ শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন–

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥[৯৩]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/৬/১৫

জগৎ নিস্তারিলে তুমি–সেই অল্পকার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি–এ শক্তি আশ্চর্য্য ॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি–যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ-প্রচণ্ড ॥[৯৪]
চৈতন্যচরিতামৃত–মধ্য/৬/১৯৩-১৯৪

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ :

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৩১ শকাব্দে মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আসেন এবং পরবর্তী বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করার জন্য জ্যেষ্ঠ ভক্তদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁর অগ্রজ ভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করে

দক্ষিণ ভারতে পবিত্র তীর্থ ভূমিতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই সেখানে যাওয়ার জন্য তাঁর মন খুবই উদগ্রীব। কিন্তু নিত্যানন্দ দক্ষিণ ভারতের সকল তীর্থ স্থান ভ্রমণ করেছেন, তাঁর সকল পথ জানা আছে। সে কারণে তিনি চৈতন্যদেবের সঙ্গী হওয়ার প্রার্থনা জানালে তিনি বললেন– না আমি একাই তীর্থে যাব। পুরীর সকল বৈষ্ণবদের অনুরোধে কৌপিন, বহির্বাস এবং জলপাত্র বহন করার জন্য কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে–

প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্র-বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ? ॥
কৃষ্ণদাস-নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ–ধর নিবেদন ॥[৯৫]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/৭/৩৭-৩৮

চৈতন্যদেব সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে সমুদ্র তীরবর্তী পথ দিয়ে আলালনাথে এসে রাত যাপন করেন। সার্বভৌম তাঁকে বললেন– দক্ষিণভারতে গোদাবরী নামক স্থানে রায় রামানন্দ আছেন। তিনি পরম ভক্ত। তাঁর সাথে দেখা করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করেন। রায় রামানন্দ হচ্ছেন গোদাবরীর রাজ্যপাল। তখন ভারতবর্ষ রাজনৈতিক কারণে বহুভাগে বিভক্ত হয়েছিল। উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই গোদাবরী রাজ্য। সার্বভৌম বললেন–

তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিকভক্ত নাহি তাঁর সম ॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস–দুহার তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥[৯৬]
চৈতন্যচরিতামৃত -মধ্য/৭/৬৩-৬৪

চৈতন্যদেবের যাত্রাকালে সবাইকে বিদায় জানালে ভক্তরা গভীর আবেগে বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মূর্চ্ছিত হলেন। তিনি প্রেমাবেশে নামকীর্তন করতে করতে দীর্ঘ পথ চলতে থাকেন। তাঁর শ্রীকণ্ঠে নামকীর্তন শ্রবণ করে পথের গ্রামবাসীরা মুগ্ধ হয়ে বহু লোক ভক্তে পরিণত হয়। যে নাম কীর্তন করতেন, তা হলো–

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্ ॥[৯৭]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/৭/৩/ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্যম্)

এইভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর ভ্রমণ করতে করতে পদব্রজে তিনি সেতুবন্ধে পৌঁছালেন। সেখানে কূর্মনামক স্থানে অর্থাৎ কূর্মক্ষেত্রে ভগবান কূর্মাবতারের বিগ্রহ দর্শন করে বিভিন্ন স্তবস্তুতি করেন। সেবকরা তাঁকে সম্মান করলেন।

সেখানকার এক কূর্ম নামক ব্রাহ্মণ তাঁকে অতিথি হিসেবে গৃহে নিয়ে যায়। সেই গৃহে আহারাদি সম্পন্ন করে রাতযাপন করেন এবং তাঁকে উপদেশ প্রদান করেন–

যারে দেখ– তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার' এই দেশ ॥[৯৮]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/৭/১২৫

প্রাতঃকালে তিনি যাত্রা শুরু করেন। সেখানে বাসুদেব নামে এক কুষ্ঠ রোগী ছিলেন। তার আর্তনাদে চৈতন্যদেব তাকে আলিঙ্গন করে রোগ থেকে মুক্তি দিয়ে কৃষ্ণ নামের উপদেশ প্রদান করেন।

প্রভুর স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দসহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥[৯৯]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/৭/১৩৮

চৈতন্যদেবের এই দয়া প্রদর্শনের জন্য তাঁর নাম হয় 'বাসুদেবামৃতপদ'। চৈতন্যদেব কূর্মক্ষেত্র থেকে পদব্রজে জিয়ড়-নৃসিংহ ক্ষেত্রে গমন করেন। সেখানে হিরণ্যকশিপু বধকারী ভগবান নৃসিংদেবের বিগ্রহের দর্শন লাভ করে স্তবস্তুতি ও নৃত্য গীত করেন। সেখানে এক ব্রাহ্মণ গৃহে রাত যাপন করে প্রাতঃকালে গোদাবরী যাত্রা করেন।

গোদাবরীতে রায় রামানন্দের সঙ্গে ধর্মালোচনা:

সাতটি পবিত্র নদীর মধ্যে গোদাবরী অন্যতম। এই গোদাবরী নদীর তীরে গোষ্পদতীর্থনামক প্রসিদ্ধ ঘাট রয়েছে। সেই ঘাটের নিকটে বৃক্ষতলে চৈতন্যদেব আসনে বসে আছেন। সেই সময় গোদাবরী প্রদেশের শাসনকর্তা রায় রামানন্দ দোলায় চড়ে ঘাটে স্নান করতে আসেন। সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাদ্য-বাজনা সহযোগে সেখানে আসেন। স্নানের সময় বহু বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে স্নানাদি সম্পন্ন করেন। স্নান সমাপনান্তে রামানন্দ দূর থেকে দর্শন করেন এক বৃক্ষতলে গৈরিক বসন পরিহিত সূর্যতেজঃ সম্পন্ন এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। সম্মুখে গিয়ে ষাষ্টাঙ্গে প্রণতি নিবেদন করলেন। চৈতন্যদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনি রায় রামানন্দ?" তিনি বিনয়ের সহিত বলেন–"শূদ্রাধম, আপনার দাস।" এইভাবে বাক্য বিনিময়ের মধ্যেই উভয় উভয়কে ভাবাবেগে আলিঙ্গন করলেন। দু'জনার নয়ন অশ্রুপূর্ণ। তাঁদের এই ভাব দর্শন করে সঙ্গের ব্রাহ্মণগণ বিস্মিত হন। সন্ন্যাসী হয়ে শূদ্রকে স্পর্শ, তাও আবার আলিঙ্গনে পৌঁছালো। তবে রাজ্যপালতো পণ্ডিত এবং গম্ভীর স্বভাবের। চৈতন্যদেব তাঁদের বিজাতীয় মনোভাব অনুধাবন করতে পেরে বললেন– সন্ধ্যাকালে এসো, নির্জনে কৃষ্ণ কথা আলোচনা করা যাবে। রামানন্দ ছদ্মবেশে রাত্রিতে এসে চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাধ্যের নির্ণয় বিষয়ে আলোচনা করেন। চৈতন্যদেব প্রশ্নকর্তা, রামানন্দ উত্তরদাতা। চমৎকার তাঁদের প্রশ্নোত্তরের বাক্য কৌশল। বর্ণাশ্রমধর্ম, শুদ্ধভক্তি, প্রভৃতিসহ পঞ্চরসের গভীর আলোচনা হয়। রজনী প্রভাত হয়। একপর্যায়ে রামানন্দের প্রার্থনায়

চৈতন্যদেব তাঁকে নটবর বেণুধারী রাইরসরাজ রূপে দর্শন প্রদান করেন। রায় রামানন্দ মূর্ছিত হয়ে তাঁর বন্দনা করেন।

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ–।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ–পড়িলা ভূমিতে ॥[১০০]

চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/৮/২৩৩-২৩৪

রামানন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি গোদাবরীতে দশ দিন থাকেন। রামানন্দ ও চৈতন্যদেবের মধ্যে সাধ্যের নির্ণয় বিষয়ক দার্শনিক আলোচনা *চৈতন্যচরিতামৃতের* মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পাই–

প্রভু কহে পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্মাচরণ বিষ্ণুভক্তি হয় ॥[১০১]

চৈতন্যচরিতামৃতের-মধ্য/৮/১০৫-১০৬

দশদিন একইভাবে রসতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব আলোচনার পরে তিনি রামানন্দের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলেন এবং বললেন–রাজকার্য পরিত্যাগ করে পুরীতে চলে এসো। সেখানে মিলিত হয়ে রসতত্ত্ব আলোচনা করা যাবে।

বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন:

চৈতন্যদেব গোদাবরী থেকে গৌতমী গঙ্গায় চলে আসেন। এখানের লোকজন বিভিন্ন মতবাদের। কেউ জ্ঞানী, কেউ কর্মী, কেউ রাম উপাসক, কেউ তত্ত্ববাদী কৃষ্ণ উপাসক। কিন্তু চৈতন্যদেবের দর্শনে ও কথায় সবাই মুগ্ধ হয়ে তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেন। গৌতমী গঙ্গায় স্নান করে স্তব করেন। মল্লিকার্জ্জুনে গিয়ে মহাদেব শিবকে দর্শন করেন। অহোবল নৃসিংহে গমন করেন। নৃসিংহ দর্শন করে স্তুতি করেন। সিদ্ধবট গিয়ে অযোধ্যাপতি রঘুনাথকে দর্শন করে স্তব করেন। সেই সিদ্ধবটে এক রামভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণে তিনি তাঁর গৃহে ভিক্ষা করেন। রামভক্ত সর্বদা রামনাম জপ ও কীর্তন করতেন। চৈতন্যদেব তাঁকে কৃপা করেন। পরে তিনি স্কন্দক্ষেত্রে গিয়ে কার্তিককে দর্শন করেন। ত্রিমঠে গিয়ে ত্রিবিক্রম দর্শন করে পুনরায় সিদ্ধবটে রামভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে ফিরে আসেন। তিনি দেখেন ব্রাহ্মণ পূর্বে রাম নাম জপ করছিল, কিন্তু এখন সে কৃষ্ণ নাম জপ করছে। তখন তিনি রামভক্তকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর প্রদান করে যে–

বাল্যাবধি রামনাম–গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।

কৃষ্ণনাম স্ফুরে– রামনাম দূরে গেল ॥[১০২]

চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/৯/২৪-২৫

সেখান থেকে তিনি বৃদ্ধকাশীতে এসে শিব দর্শন করেন। সেখান থেকে এক গ্রামে গিয়ে ব্রাহ্মণ সমাজে পৌছালে বহু লোক তাঁকে দর্শন করতে আসে। তাঁর জ্যোতি, সৌন্দর্য ও প্রেমাবেশ দর্শন করে সবাই মুগ্ধ হলেন। সেখানে তার্কিক, মীমাংসক, মায়াবাদী প্রভৃতি শ্রেণির পণ্ডিতরা তাঁর সাথে সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম দর্শন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। অনেক যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হয় যার যার মতবাদ অনুসারে। কিন্তু সবার মতবাদ চৈতন্যদেব শাস্ত্র সিদ্ধান্তের দ্বারা খণ্ডন করেন। যার ফলে তাঁর বৈষ্ণব মতবাদ সর্বত্র প্রচারিত হয়। কিন্তু চৈতন্যদেবের এই প্রতিভার কথা ছড়িয়ে পড়াতে বৌদ্ধধর্মের মহান আচার্য ও মহাপণ্ডিতগণ কোনভাবেই মেনে নিতে পারেন নাই। তাই বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা তাদের শিষ্যসহ চৈতন্যদেবের সভায় উপস্থিত হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন নিয়ে যুক্তি উপস্থাপন করে শাস্ত্রীয় তর্ক শুরু করলে তিনিও শাস্ত্রযুক্তি দিয়ে তর্কের মাধ্যমেই তাদের মতবাদ খণ্ডন করেন। তারা পরাজিত হলো–

বৌদ্ধাচার্য্য নবপ্রস্তাব সব উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ডখণ্ড কৈল॥[১০৩]

চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/৯/৪৪

কিন্তু বৌদ্ধাচার্যগণ এই পরাজয় মনেপ্রাণে মেনে নিতে না পেরে তারা চৈতন্যদেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। একটি থালাতে অমেধ্য খাবার সাজিয়ে তাঁকে আহার করার জন্য প্রদান করলে, সেই সময় একটি বড় পাখি ঠোঁটে করে থালাটি নিয়ে উপর থেকে ফেলে দিলে বৌদ্ধাচার্যের মাথার উপরে পরলে তিনি মূর্চ্ছিত হন। পরবর্তীতে উক্ত ঘটনায় সকল বৌদ্ধাচার্যরা এসে চৈতন্যদেবের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি বলেন–সবাই মিলে কৃষ্ণনাম করুন তাহলে মুক্তি হবে। এভাবে সেই নাস্তিক বৌদ্ধাচার্যরা চৈতন্যদেবের নির্দেশ মেনে নিয়ে তাঁর নিকটে বিনয়ের সাথে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।[১০৪] সেখান থেকে চৈতন্যদেব বেঙ্কট পর্বতে এসে চতুর্ভুজ বিষ্ণু দর্শন করেন। ত্রিপদী গিয়ে শ্রীরাম দর্শন করে প্রণাম ও স্তব করেন। পরে তিনি পানা-নরসিংহে এসে নৃসিংহদেবকে দর্শন করে প্রণতি ও স্তুতি করেন। শিবকাঞ্চী এসে শিব দর্শন করেন। বিষ্ণুকাঞ্চী এসে লক্ষ্মী-নারায়ণ দর্শন করেন এবং এখানে তিনি দুইদিন থাকেন। ত্রিমল্লের সর্ব তীর্থস্থান দর্শন করে তিনি ত্রিকালহস্তি গিয়ে মহাদেব দর্শন করেন। পক্ষতীর্থে শিব দর্শন করেন, বৃদ্ধকোলতীর্থে গিয়ে শ্বেতবরাহ দর্শন করেন। পীতাম্বর শিবস্থানে শিয়ালী ভৈরবী দেবী দর্শন করেন। সেখান থেকে কাবেরী এসে শিব দর্শন করে বেদাবন গমন করেন। সেখানে এসে অমৃতলিঙ্গ শিব দর্শন করেন। দেবস্থানে এসে তিনি বিষ্ণু দর্শন করেন।[১০৫]

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র :

শ্রীচৈতন্যদেব বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করে পবিত্র কাবেরী নদীতে স্নান করে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের রঙ্গনাথ মন্দিরে রঙ্গনাথ বিগ্রহ দর্শন করে আনন্দে পুলকিত হন। তিনি ভাবাবেশে গান কীর্তন করেন। সেই মন্দিরে বেঙ্কট ভট্ট নামে এক

বৈষ্ণব ভক্ত চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করে নিজ গৃহে নিয়ে ভিক্ষা প্রদান করেন। সেই সময় ছিল বর্ষাকাল। সেই সময়ে বৈষ্ণবরা বিধি অনুসারে চাতুর্মাস্যব্রত পালন করেন। তাই সুযোগ বুঝে বেঙ্কট ভট্ট চাতুর্মাস্যের পুরো সময়টা অর্থাৎ চার মাস তাঁর গৃহে থাকার জন্য অনুরোধ করেন। চৈতন্যদেব এই সময়টা বেঙ্কট ভট্টের গৃহে ছিলেন এবং প্রতিদিন তিনি শ্রীরঙ্গনাথকে দর্শন করতেন। প্রত্যেকদিন সেই এলাকার বিভিন্ন ভক্তরা এসে নিমন্ত্রণ করতেন এবং সর্বত্র তিনি ধর্মালোচনা করতেন। সেখানে এক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি প্রতিদিন দেবালয়ে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতাপাঠ করতেন এবং তিনি আনন্দিত হয়ে পাঠের মধ্যে অর্জুনের রথে উপবিষ্ট শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতেন। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের পাঠ অশুদ্ধ ছিল। তাই সবাই তাঁকে উপহাস করত। চৈতন্যদেব একদিন দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন-কি কারণে গীতাপাঠে তোমার এত আনন্দ হয় ? তখন তিনি উত্তর দিলেন–

অর্জ্জুনেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥
যাবৎ পঢ়োঁ তাবৎ পাঙ্ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/৯/৯৪-৯৫

এই কথা শুনে চৈতন্যদেব বললেন–

প্রভু কহে–গীতাপাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার ॥ [১০৬]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/৯/৯৬

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন তীর্থে :

শ্রীচৈতন্যদেব চাতুর্মাস্য পূর্ণ হলে রঙ্গক্ষেত্রের সকল তীর্থস্থান দর্শন করে ঋষভ পর্বতে চলে আসেন। সেখানে তিনি নারায়ণ বিগ্রহ দর্শন করেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরী চাতুর্মাস্যের কারণে সেখানে অবস্থান করছেন। চৈতন্যদেব তাঁর সাথে দেখা করেন এবং তিনদিন কৃষ্ণকথা আলোচনা করে একসাথে সময় অতিবাহিত করেন। তখন পরমানন্দ পুরী নীলাচলে যাবেন এই বলে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট বিদায় নিলেন। তখন চৈতন্যদেব তাঁকে বিদায় দিয়ে শ্রীশৈলে চলে আসেন। সেখানে ব্রাহ্মণ বেশে শিব-দুর্গাকে দর্শন করেন। সেখানে তিন দিন ইষ্ট গোষ্ঠী করে তিনি পুরী কামকোষ্ঠীতে আসেন। সেখান থেকে তিনি দক্ষিণ মথুরা আসেন। সেখানে এক ব্রাহ্মণ রাম ভক্তের সাথে পরিচয় হয়। কিন্তু সেই রামভক্ত প্রায়ই উপবাস থাকেন। তিনি রামভক্তকে এই দুঃখ কষ্টের কারণ জিজ্ঞাসা করলে, রামভক্ত উত্তরে বলেন–

জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে–ইহা কর্ণে শুনি ॥

এ শরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায় ॥[১০৭]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য /৯/১৭৩-১৭৪

কিন্তু তাঁর কথা শ্রবণ করে চৈতন্যদেব বলেন–

রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল ॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥[১০৮]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/৯

চৈতন্যদেব তাঁকে অনেক উপদেশ প্রদান করলে, তিনি তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন। তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে তিনি কৃতমালায় স্নান করে দুর্ব্বেশন এসে রঘুনাথ দর্শন করেন। সেখান থেকে মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দর্শন করেন। সেখান থেকে সেতুবন্ধে এসে ধনুতীর্থে স্নান করে রামেশ্বর দর্শন করেন। সেখানে এক ব্রাহ্মণ সভায় কূর্ম্মপুরাণ এর মধ্যে পতিব্রতা–উপাখ্যান পাঠ করা হয়েছিল। তিনি তা শ্রবণ করে আনন্দিত হলেন এবং মনে করলেন এই গ্রন্থ থেকে পুঁথি লিখিয়ে নিয়ে রামভক্তকে দেখাতে পারলে তাঁর রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের সংশয় দূরীভূত হবে। তাই তিনি গ্রন্থের সেই আখ্যান অংশটুকু নতুন করে লিখিয়ে পুরাতন পত্রখানা নিয়ে দক্ষিণ মথুরা এসে সেই রামদাস বিপ্রকে প্রদান করেন। রামদাস বিপ্র মহানন্দে তাঁর চরণে পতিত হয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।[১০৯] চৈতন্যদেব সেখান থেকে পাণ্ড্যদেশে এসে তাম্রপর্ণী নদীতে স্নান করে নয়ত্রিপদী দর্শন করে চিড়য়তালা তীর্থে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দর্শন করেন। সেখান থেকে তিলকাঞ্চীতে শিব, গজেন্দ্রমোক্ষ তীর্থে বিষ্ণুমূর্তি, পানাগড়ি-তীর্থে সীতাপতি, চামতাপুরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু দর্শন করেন। সেখান থেকে তিনি মলয় পর্বতে অগস্ত্য মুনির বন্দনা করে কন্যাকুমারী দর্শন করেন। আমলীতলায় রাম দর্শন, মল্লার দেশে তমাল কার্ত্তিক দেখে বাতাপানীতে রঘুনাথ দর্শন করেন।[১১০] মল্লার দেশে ভট্টমারিরা বসবাস করেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে ভট্টমারিরা স্ত্রীধনের লোভ দেখিয়ে বুদ্ধিনাশ করে তাকে তাদের ঘরে নিয়ে যায়। চৈতন্যদেবের তেজ দর্শন করে ভয় পেয়ে কৃষ্ণদাসকে ফিরিয়ে দেয়। সেখান থেকে তিনি পয়স্বিনী-তীরে আদিকেশবের মন্দিরে আদি কেশব দর্শনে আনন্দিত হন। সেই মন্দিরে তিনি ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায় পেয়ে পুঁথি নকল করে নিলেন। সেখান থেকে তিনি অনন্ত পদ্মনাভে এসে পদ্মনাভ দর্শন করে দুইদিন থাকেন। তিনি পয়োষ্ণী এসে শঙ্কর-নারায়ণ দর্শন করে শঙ্করাচার্যের সিংহারি মঠ দর্শন করে, মৎস্য তীর্থ দর্শন করে তুঙ্গভদ্রায় স্নান করেন। দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের আচার্য মধ্বাচার্যের পীঠ হচ্ছে উড়ুপী। তিনি সেই মন্দিরে কৃষ্ণ দর্শন করেন। তিনি প্রেমোন্মাদী হলেন।[১১১] সেই মন্দিরে তত্ত্ববাদী আচার্য ছিলেন, যিনি দর্শন ও শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। তাঁদের

মধ্যে অনেক গর্ব ছিল। চৈতন্যদেব অত্যন্ত বিনীতভাবে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নির্ণয় করে তাঁর যুক্তি খণ্ডন করে গর্বচূর্ণ করে স্বীয় বৈষ্ণব মত স্থাপন করেন।

চৈতন্যদেব ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকূপ, পঞ্চাস্পরা তীর্থ, গোকর্ণ শিব, দ্বৈপায়নী, সূর্পারকতীর্থ, কোলাপুর, লাঙ্গা গণেশ দর্শন করে পাণ্ডুপুর আসেন। সেখানে তিনি বিঠ্ঠল ঠাকুর দর্শন করে প্রেমে আপ্লুত হন। সেখানে একবিপ্র গৃহে জানতে পারেন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী সেখানে আছেন। তিনি শ্রীরঙ্গপুরীকে দর্শন করে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। রঙ্গপুরীর নিকটে পাঁচ-সাত দিন বিভিন্ন শাস্ত্র কথা আলোচনা করে অতিবাহিত করেন। কথা প্রসঙ্গে রঙ্গপুরী বলেন–নবদ্বীপে তিনি চৈতন্যদেবের গৃহে ভোজন করেছিলেন। তখন রঙ্গপুরীর নিকট থেকে জানতে পারেন তাঁর ভ্রাতা বিশ্বরূপ (সন্ন্যাস নাম শঙ্করারণ্য স্বামী) এই তীর্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছেন। চৈতন্যদেব তখন তাঁর পূর্বাশ্রমের পরিচয় জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর নিকট থেকে বিদায় নেন। সেখানে এক বিপ্রের গৃহে দিন-চারের মত থেকে তীর্থ দর্শন করেন। পরে তিনি কৃষ্ণবেণ্বা নদীর তীরে এসে নানা তীর্থ দর্শন করে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থটির সন্ধান পান। রাধাকৃষ্ণের মাধুর্যলীলা বর্ণিত গ্রন্থটি পেয়ে তিনি আনন্দে উল্লসিত হন। সেই গ্রন্থের এক কপি নকল করে সংগ্রহ করেন। চৈতন্যদেব 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' এই দুটি গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পেরে মনে মনে ভীষণ আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁর ভক্তদের সঙ্গে এই গ্রন্থ পাঠ করবেন এবং তাঁদের প্রত্যেকেই এই গ্রন্থের কপি পেয়ে তাঁরাও আনন্দিত হবেন। সে কারণে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সময় এই দুটি গ্রন্থ তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যান।[১১২] সেখান থেকে তিনি মাহিষ্মতীপুর, নর্ম্মদা, ধনুতীর্থ, ঋষ্যমুখ-পর্বত, দণ্ডক-অরণ্য, সপ্ততাল বৃক্ষ দর্শন করেন। পরে তিনি পম্পাসরোবর, পঞ্চবটী, নাসিক- ত্র্যাম্বক, ব্রহ্মগিরি, কুশাবর্ত্ত, গোদাবরী, সপ্ত গোদাবরী সহ বহু তীর্থ দর্শন করে পুনরায় বিদ্যানগরে চলে আসেন। সেখানে পুনরায় রায় রামানন্দের সাথে পুনঃমিলন হয়। সাক্ষাতে তিনি রামানন্দকে বললেন–

তীর্থযাত্রা-কথা প্রভু সকল কহিলা।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুথি দিলা ॥
প্রভু কহে–তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুথি সেই সব সাক্ষী দিলে ॥[১১৩]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/৯/ ২৯৫-২৯৬

নীলাচলে প্রত্যাবর্তন:

চৈতন্যদেব রামানন্দের অনুরোধে পাঁচ-সাত দিন তীর্থ দর্শন ও নানা শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করে অতিবাহিত করেন। তিনি রামানন্দের নিকট বিদায় নিয়ে এবং নীলাচলে দ্রুত আসার কথা বলে নীলাচলের উদ্দেশে কৃষ্ণদাসকে নিয়ে যাত্রা করেন। পূর্বে যে পথে তিনি এসেছিলেন, সেই পথ দিয়েই তিনি নীলাচল প্রত্যাবর্তন করেন। এভাবে তিনি দুই বছর দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করেন। তিনি প্রথমে আলালনাথে চলে

আসেন। কৃষ্ণ দাসকে দিয়ে নীলাচলে আগমনের বার্তা প্রেরণ করেন। সার্বভৌম, কাশীমিশ্র, নিত্যানন্দ সহ পুরীর সকল ভক্তরা চৈতন্যদেবকে সমুদ্রের তীরে এসে দর্শন করেন। সার্বভৌমের গৃহে সকল ভক্তের সম্মুখে চৈতন্যদেব তীর্থ যাত্রার সকল বিবরণ আলোচনা করেন। যথা–

সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজ-গণ।
তীর্থযাত্রা-কথা কহি কৈলা জাগরণ ॥
প্রভু কহে–এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন।
তোমা সম বৈষ্ণব না দেখিল একজন ॥[১১৪]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/৯/৩২৭-৩২৮

রথযাত্রা উৎসব :

রথযাত্রায় তিনটি রথে তিনটি বিগ্রহ থাকে। একটিতে বলদেব, দ্বিতীয়টিতে সুভদ্রাদেবী, তৃতীয়টিতে জগন্নাথ দেব। পুরীতে বহুকাল থেকে এই নিয়মে রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়ে আসছে। লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয় রথযাত্রা উৎসবে। রথযাত্রার কিছুদিন পূর্বে জগন্নাথের স্নানযাত্রা হয়। স্নানযাত্রা থেকে নেত্রোৎসব পর্যন্ত জগন্নাথদেবের দর্শন হয় না। এই সময়ে বিগ্রহের অঙ্গরাগ হয়। রথযাত্রার পূর্বের দিন নেত্রোৎসব হয় অর্থাৎ চক্ষুদান করা হয়। এই দিন থেকে বিগ্রহ দর্শন করা হয়।[১১৫] রথযাত্রার দিন থেকে বিগ্রহগণকে গুণ্ডিচামন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নয় দিন থাকেন। পরে আবার মন্দিরে ফিরে আসেন। নয় দিন বাদে সারাবছরই গুণ্ডিচামন্দির ফাঁকা থাকে। গুণ্ডিচামন্দির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য চৈতন্যদেব সার্বভৌম ও কাশীমিশ্রের অনুমতি গ্রহণ করে স্বীয় ভক্তদের নিয়ে মন্দির মার্জনা করেন। এটি জগন্নাথের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন। চৈতন্যদেবের একটি চমৎকার শিক্ষা তাঁর ভক্তদের জন্য।[১১৫(ক)] রথযাত্রার দিন পুরীর মন্দির কর্তৃপক্ষ অপূর্বভাবে রথকে সাজালেন বিভিন্ন রঙের কাপর, ছবি, পুষ্প, পত্র দিয়ে। রথ সাজিয়ে বিগ্রহ স্থাপন করে রথযাত্রা শুরু হলো। প্রতাপরুদ্র রাজা হয়েও সুবর্ণ মার্জনী দ্বারা পথ পরিষ্কার করেন। এটি হচ্ছে বিনয়ের মাধ্যমে জগন্নাথদেবকে সেবা প্রদান করা। এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে–

তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
সুবর্ণ-মার্জ্জনী লৈয়া করে পথ-সম্মার্জ্জন ॥
চন্দন-জলেতে করে পথ নিষিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজসিংহাসনে ॥[১১৬]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৩/১৪-১৫

চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে সাতটি সম্প্রদায় বিভক্ত হয়ে রথযাত্রায় নৃত্য কীর্তন করেন। শীর্ষ ভক্তসহ সকল ভক্তরা এই কীর্তনে অংশগ্রহণ করেন। শান্তিপুরের এক সম্প্রদায়, কুলীন গ্রামের এক সম্প্রদায়, শ্রীখণ্ডের এক সম্প্রদায়

সহ মোট সাতটি সম্প্রদায়ের নৃত্য কীর্তনে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। চৈতন্যদেবের মনোমুগ্ধকর উদণ্ড নৃত্য কীর্তনে রথযাত্রার ভক্তরা অভিভূত।

জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায় ॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি' বৈষ্ণব হৈল পাগল ॥
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে শরীর যাঁর হৈল প্রেমময় ॥[১১৭]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৩/৪৭-৪৮, ৫৬

রথ বালগণ্ডিস্থানে এসে থেমে গেলে সবাই জগন্নাথ দর্শন করেন। কিছু পড়ে আবার রথ টানা শুরু হলে রথ চলছে না। সকল লোক মিলে রথের রশি ধরে টানলেও রথ চলে না। পরে হাতি দিয়ে টানলেও রথের চাকা ঘুরে না। এই সময়ে চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তসহ রথ টানলে পূর্বের মত রথ চলতে শুরু করে। চৈতন্যদেবের এই ঐশ্বর্য দর্শন করে রাজাসহ পাত্রমিত্র লোকজন চমৎকৃত হন। বর্ণনা পাই–

নিমিষেকে রথ গেলা গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্যপ্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার ॥
'জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
এইমত কোলাহল লোকে 'ধন্য ধন্য' ॥
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রসঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥[১১৮]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৪/৫৬-৫৮

গৌড়ীয় ভক্তদের বিদায় :

গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রার পূর্বেই নীলাচলে এসেছেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে মহানন্দে চার মাস কাটালেন। এই সময়টা ছিল চাতুর্মাস্য কাল। পুরীতে জগন্নাথ দেবের বিবিধ প্রকার অনুষ্ঠানাদি দর্শন করেন। এখন বিদায়ের পালা। চৈতন্যদেব সকল ভক্তদের বিদায় লগ্নে জ্যেষ্ঠ ভক্তদের প্রশংসা করেন এবং নির্দেশনা প্রদান করেন এবং প্রতি বৎসরে রথযাত্রার সময় নীলাচলে আসার কথা বলেন। এদের মধ্যে অন্যতম অদ্বৈতকে আচণ্ডাল সবাইকে কৃষ্ণভক্তি প্রদানের নির্দেশ এবং নিত্যানন্দকে গৌড় দেশে গিয়ে সকল শ্রেণির মানুষকে প্রেমভক্তি প্রদানের নির্দেশ দেন। গৌড়ীয় ভক্তদের মধ্যে কুলীন গ্রামের ভক্ত, শ্রীখণ্ডের ভক্ত, শান্তিপুরের ভক্ত, নদীয়ার ভক্তদের প্রশংসা করে হরিনাম প্রচারের নির্দেশ প্রদান করেন। আগমন আনন্দের কিন্তু বিদায় বড় বেদনার। শচীমাতার

কথা মনে পরে চৈতন্যদেবের। তাই তিনি মায়ের জন্য প্রসাদী বস্ত্র ভক্তদের নিকটে প্রদান করেন এবং দণ্ডবৎ প্রণতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাই সকরুণ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়–

এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এ সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ ॥
বাতুল-বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ ॥[১১৯]

চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৫/৪৮, ৫১

বিদায় বিচ্ছেদে নয়ন থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছে ভক্তদের এবং চৈতন্যদেবেরও হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে বিষণ্ন মনে অপলক নেত্রে তাকিয়ে বিদায় দিচ্ছেন। বর্ণনা–

এই মত সবভক্তের কহি' সব গুণ।
সবারে বিদায় দিল করি' আলিঙ্গন ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করেন রোদন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ন হৈল মন ॥[১২০]

চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৫/১৮১-১৮২

বৃন্দাবনের উদ্দেশে গৌড়ে গমন :

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরে দুই বছর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে সময় অতিবাহিত হয়। পরবর্তী বছর তিনি বৃন্দাবনে যেতে চাইলে রামানন্দ বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরে কালবিলম্ব করায় যেতে পারেননি। সন্ন্যাসের পঞ্চম বৎসরে গৌড়ীয় ভক্তরা রথযাত্রার সময় এসেছে পুরীতে। রথযাত্রা উৎসব আনন্দ সমাপনান্তে তিনি গৌড়ীয় ভক্তদের বিদায় দিলেন। কেননা তিনি সিদ্ধান্তে অটল এই বৎসরে তিনি বৃন্দাবন দর্শন করবেন। তাঁর ইচ্ছা বৃন্দাবন যাওয়ার পূর্বে মাতাকে দর্শন ও অনুমতি এবং গঙ্গা দর্শন করে যাবেন। যথা–

গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই-দয়াময় ॥[১২১]

চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৬/৮৯

তিনি বিজয়া দশমী দিনে জগন্নাথের আশীর্বাদ নিয়ে বৃন্দাবনের উদ্দেশে গৌড়ে যাত্রা করেন। উড়িষ্যার বহু ভক্ত চৈতন্যদেবের সাথে বহুদূর পর্যন্ত আসেন। চৈতন্যদেব তাঁদের বিদায় দেন। কিন্তু শীর্ষ ভক্তদের মধ্যে স্বরূপ দামোদর, পুরী গোসাই, জগদানন্দ, হরিদাস, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, রামানন্দ, গদাধর সহ অনেক ভক্ত কটক পর্যন্ত আসেন। রাজা প্রতাপরুদ্র জানতে পেরে সেখানে এসে চৈতন্যদেবের চরণে প্রণতি নিবেদন করেন। তিনি রাজাকে আশীর্বাদ করে বিদায় জানান।

ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌরধাম।
'প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা' যাতে হৈল নাম ॥
রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন ॥[১২২]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৬/১০৭-১০৮

রাজা তাঁর মহাপাত্রদের নির্দেশ প্রদান করেন যে, চৈতন্যদেবের যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন করার জন্য যা যা প্রয়োজন সব ব্যবস্থা করতে। গদাধর পণ্ডিত তাঁর বিরহ সহ্য করতে না পেরে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেন তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য। চৈতন্যদেব ক্ষেত্র সন্ন্যাসের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কারণে তাঁকে সঙ্গে নেননি ।

তিনি যাজপুরে পৌঁছে রাজার মহাপাত্রদ্বয়কে বিদায় দিলেন। কিন্তু রামানন্দ চৈতন্যদেবের সঙ্গে থাকলেন–

দুই রাজপাত্র যেই প্রভু-সঙ্গে যায়।
যাজপুর আসি প্রভু তারে দিলেন বিদায় ॥
এই মত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা ॥[১২৩]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৬/১৪৮, ১৫১

কিন্তু রেমুণা আসার পরে তিনি রামানন্দ রায়কে বিদায় জানালেন। চৈতন্যদেবের যাত্রাপথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ। যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে তাঁকে অনেক কষ্ট করে পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। উড়িষ্যার সীমা শেষ হলেই পিছলদা রাজ্য। এই রাজ্যের রাজা একজন যবন। তিনি ভয়ঙ্কর রাজা এবং মদ্য পান করেন। কিন্তু সেই সময় উড়িষ্যার দুই রাজ অধিকারী চৈতন্যদেবকে বললেন– এই রাজার সাথে সন্ধি করে আপনাকে তাঁর রাজ্য মধ্যে নিয়ে যাবো। তবে এখানে দুই-চার দিন অপেক্ষা করতে হবে। মহাপাত্রগণ যবন রাজার চরের মাধ্যমে রাজার নিকট চৈতন্যদেবের পূর্ণ বিবরণ সহ সংবাদ প্রেরণ করেন। চৈতন্যদেবের ঐশ্বরিক প্রভাবে রাজার মতিগতি পরিবর্তিত হলো। তিনি চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। কিন্তু মহাপাত্রগণ শর্ত দিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় পাঁচ-সাত ভৃত্য নিয়ে দেখা করতে পারবে। রাজা সম্মত হয়ে চৈতন্যদেবকে দর্শন করে মুগ্ধ হলেন এবং প্রণতি নিবেদন করে বিনয় বাক্যে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। বর্ণনা–

বিশ্বাস যাইয়া তাঁরে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল ॥
দূর হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হৈয়া ॥[১২৪]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৬/১৭৬-১৭৭

এভাবে প্রতিকূল পরিবেশে তিনি পিছলদা পর্যন্ত এলেন। যথা–

জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।

দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে নিল ॥
মল্লেশ্বর দুষ্টনদে পার করাইল।
পিছলদা-পর্যন্ত সেই যবন আইল ॥[১২৫]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৬/১৯৫-১৯৬

তিনি তাঁদের বিদায় দিয়ে পানিহাটিতে পৌঁছালেন। সেখানে রাঘব পণ্ডিতের সাথে মিলিত হয়ে তিনি কুমার হট্টে শ্রীনিবাস এর সাথে মিলিত হলেন। কুমার হট্টে তিনি শিবানন্দ ও বাসুদেব গৃহে এবং বাচস্পতি গৃহে অবস্থান করেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের আগমন সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে বহুলোক সমাগম হলে তিনি লোক ভিড় ভয়ে গোপনে কুলিয়া এসে মাধবদাসের গৃহে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি সাত দিন অবস্থান করেন। পরে তিনি অদ্বৈত গৃহ শান্তিপুরে চলে আসেন। জননী শচীদেবীকে দর্শন দিয়ে তাঁর দুঃখ মোচন করেন। কেননা দীর্ঘ তীর্থ ভ্রমণের পরে এই প্রথম দেখা। মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।[১২৬]

রামকেলি ভ্রমণ:

চৈতন্যদেব শান্তিপুর থেকে গৌড়ের রামকেলি গ্রামে রূপ ও সনাতনের সাথে মিলিত হন। গৌড়ের রাজা নবাব হোসেন শাহের রাজধানী হচ্ছে গৌড়। তার নিকটবর্তী গ্রাম হচ্ছে রামকেলি। রূপ ও সনাতন হচ্ছেন নবাব হোসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী এবং কোষাগার সচিব। রাজা প্রদত্ত নাম সাকর মল্লিক ও দবির খাস। চৈতন্যদেবের সঙ্গে সহস্রাধিক ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রভাব শুনে রাজা বিস্মিত হলেন। বিনা দানে একজন ভিক্ষু সন্ন্যাসীর সহিত এত লোক থাকে। নিশ্চয়ই তিনি ঈশ্বরতুল্য! তিনি সন্দেহ করে রাজকর্মচারী কেশবছত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি যবন রাজার খারাপ অভিপ্রায় চিন্তা করে বললেন– তিনি এক সাধারণ ভিক্ষুক। কিন্তু নবাব বিজ্ঞ। তিনি দবির খাস (রূপ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন– যিনি তোমাকে রাজ্য দান করলেন, তাঁর ব্যাপারে তোমার মনকে জিজ্ঞেস করো। তিনি আদেশ জারি করলেন– এই সন্ন্যাসী তাঁর ইচ্ছামত চলবেন। কেউ যেন তাঁর কাজে বাধা প্রদান না করে। রূপ-সনাতন ছদ্মবেশে গভীর রাত্রে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন– আমরা জগাই মাধাইয়ের থেকেও নিকৃষ্ট, তাই আমাদের উদ্ধার করুণ।

তাঁরা বলেন– আমরা ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছদের সেবা করি, গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহী–তাদের সঙ্গে বসবাস করে আমাদের মন কলুষিত হয়েছে, দয়াপরবসে করুণা করুন।[১২৭] চৈতন্যদেব তাঁদের দৈন্যবাণী শ্রবণ করে বললেন– তোমাদের জন্যই আমি এখানে এসেছি। তোমার পত্র পেয়ে তোমাদের মন আমি বুঝতে পেরেছি। আজ থেকে তোমাদের নাম হবে রূপ-সনাতন। যথা–

আজি হৈতে দুঁহার নাম 'রূপ' 'সনাতন'।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ [১২৮]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১/২০৮

কৃষ্ণ তোমাদের শীঘ্র মুক্ত করবেন এই আশীর্বাদ করেন। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সনাতন কৌশলগতভাবে চৈতন্যদেবকে নিবেদন করেন। যথা–

ইহাঁ-হৈতে চল প্রভু! ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥
তথাপি যবন জাতি, না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সঙ্ঘট্ট–ভাল নহে রীতি ॥
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটী।
বৃন্দাবনযাত্রার এই নহে পরিপাটী ॥ [১২৯]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১/২০৮-২১০

এর পরে তিনি কানাইয়ের নাটশালা এসে কৃষ্ণচরিত্র লীলা দর্শন করে সনাতনের কথা চিন্তা করে বৃন্দাবন গমনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তিনি পুনরায় শান্তিপুরের উদ্দেশে গমন করেন।[১২৯(ক)]

শান্তিপুর:

চৈতন্যদেব শান্তিপুরে দশ দিন থাকেন। গৌড়ীয় ভক্ত সকলে আনন্দের সাথে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা হিরণ্যদাস ও গোবর্ধনদাস। তাঁরা ১২ লক্ষ মুদ্রা লাভ করতেন বছরে। তাঁরা চৈতন্যদেবের পূর্বপরিচিত ছিলেন। গোবর্ধন- এর পুত্র রঘুনাথদাস গোস্বামী ছিলেন ষড়ুগোস্বামীর অন্যতম। তিনি সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য চৈতন্যদেবের নিকটে আসেন। সন্ন্যাসের পরে প্রথমবার শান্তিপুরে চৈতন্যদেবের আগমন হলে রঘুনাথ তখন এসেছিলেন। চৈতন্যের বৈরাগ্য শিক্ষা নিজজীবনে পালন করতে গিয়ে সংসার থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পিতা তাঁকে রক্ষী দিয়ে বন্দি করে রাখেন। এগার জন রক্ষীসহ শান্তিপুরে চৈতন্য অনুগ্রহে এসে চৈতন্যদেবকে সংসার বন্ধনের উপায়ের পথ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন –

স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥
মর্কট- বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া ॥
অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥ [১৩০]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৬/২৩৫-২৩৭

তিনি গৌড়ের সকল ভক্তদের আলিঙ্গন করে বিদায় কালে বললেন–এ বছরে আমি বৃন্দাবন যাব। তোমরা নীলাচলে এসো না। সবাইকে বিদায় জানিয়ে জননী শচীদেবীর নিকট বৃন্দাবনে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। [১৩১]

বৃন্দাবন যাত্রা :

বৃন্দাবন দর্শন করার জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের মন ভীষণ চঞ্চল হয়েছে। তিনি সনাতনের কথায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নির্জন ধাম দর্শন করতে একাই বৃন্দাবন যাবেন। বাদিয়া বা বাজিকরদের মতো ঢাকঢোল বাজিয়ে নিজের আগমন ধ্বনি প্রচার করার মতো তিনি বহুলোক নিয়ে বৃন্দাবন যাবেন না। কিন্তু স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের অনুরোধে জলপাত্র, বস্ত্র ও ভিক্ষা করার জন্য বলভদ্র নামে এক ব্রাহ্মণ এবং তাঁর সাথে এক বিপ্র ভৃত্যকে অনুমোদন করলেন। প্রাতঃকালে সবার অলক্ষ্যে জগন্নাথের আশীর্বাণী শীরে ধারণ করে কটককে ডানে রেখে প্রসিদ্ধ পথ পরিহার করে উপপথে ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনি বৃন্দাবনের উদ্দেশে গমন করছেন। কিন্তু বনপথের অবস্থা মহাভয়ঙ্কর। বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, সর্প, হরিণ হাতিসহ বিভিন্ন জীব-জন্তুতে পরিপূর্ণ। চৈতন্যদেব দুই বাহু তুলে প্রেমেমত্ত হয়ে হরিনাম কীর্তন করে চলেছেন। কিন্তু পথের সামনে বাঘ প্রভৃতি জন্তু দেখে তাঁর সঙ্গী দুই জন ভয়ে কম্পিত হচ্ছেন। চৈতন্যদেবের সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তাঁর নিকট সবাই সমান। চৈতন্যদেবের ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবে বনের মানুষেরা অপলক দৃষ্টিতে উৎফুল্ল হয়ে চৈতন্যদেবকে দর্শন করেছে। এমনকি তাঁর কীর্তন শ্রবণ করে বাঘ-হরিণ হাতি সহ বিভিন্ন পশু-পাখি-জন্তুরা কৃষ্ণনাম কীর্তন করছে। এই দৃশ্য দর্শন করে সঙ্গীরা বিস্মিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্ণনা অতীব চমৎকার–

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ' করি প্রভু যবে বৈল।
'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল ॥
নাচে-কুন্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ-সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গে ॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর-জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥[১৩২]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৭/৩৭-৩৮, ৪৩

এই দিব্যভাবে নৃত্য ও কীর্তনে তিনি ভাবে বিভোর হয়ে পথ চলতে থাকেন। বনভূমি দর্শনে বৃন্দাবন স্মৃতি এবং পর্বত দর্শনে গোবর্ধন পর্বতের স্মৃতি হৃদয়ে জাগরিত হয়। এইভাবে তিনি কাশীতে চলে আসেন।

কাশীতে আগমন :

চৈতন্যদেব কাশীতে মনিকর্ণিকায় মধ্যাহ্নকালে আসেন। তপন মিশ্র তাঁকে দেখতে পেয়ে নিকটে গিয়ে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করেন। চৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় তপন

মিশ্রকে কাশীতে যেতে বলেছিলেন। তপন মিশ্র তাঁর আদেশ পালন করে দীর্ঘকাল চৈতন্যদেবের অপেক্ষায় ছিলেন। দীর্ঘ প্রতিক্ষার প্রহর শেষ হলো। প্রভুর দর্শনে কত যে আনন্দ হৃদয়ে, তা তিনি উপলব্ধি করলেন। তপন মিশ্র চৈতন্যদেবকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁর পুত্র ষড়ু গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ ভট্ট তাঁর পাদ-সংবাহন করেন। তপন মিশ্রের বন্ধুবর চন্দ্রশেখর চৈতন্যদেবের সাথে মিলিত হলেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তিনিও চৈতন্যদেবকে দর্শন করে আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছেন। কাশীতে শুধু ষড়দর্শন ব্যাখ্যা করা হয়। কাশীর পণ্ডিতরা শুষ্ক জ্ঞানচর্চা করেন। কোন প্রেমরসসুধা আস্বাদনের কোন পন্থা নেই। তাই তাঁরা তাঁকে পেয়ে আনন্দে উল্লসিত।[১৩৩]

মথুরা গমন :

চৈতন্যদেব কাশীতে দশ দিন থেকে ভক্তদেরকে বিদায় জানিয়ে মথুরার উদ্দেশে পদযাত্রা করেন। পথে প্রয়াগে এসে ত্রিবেণী দর্শন করে সেখানে স্নান করেন। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম স্থল। এই স্থানে কুম্ভ মেলা হয়। পবিত্র তিথিতে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করে পবিত্র হয়ে থাকে। তিনি এখানে তিন দিন থাকেন। তিনি সঙ্গীসহ মথুরা এসে বিশ্রান্তিতীর্থে স্নান করে কেশব দর্শন করেন। প্রেমানন্দে নৃত্য-কীর্তন করেন। তাঁর দিব্যরূপমাধুর্য দর্শন করে লোকেরা চমৎকৃত হয়ে যায়। মথুরায় এসে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের সাথে পরিচয় হয়। তিনি চৈতন্যদেবকে সঙ্গীসহ তাঁর গৃহে নিয়ে ভিক্ষা করান। তিনি মথুরায় বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করান। তবে সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ গৃহে সাধারণত সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা গ্রহণ করতেন না। কিন্তু মাধবেন্দ্র পুরী সনোড়িয়া বিপ্র আচারে বৈষ্ণব বিধায় তাঁর গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁকে দীক্ষা দান করেন। আজ চৈতন্যদেবকে তাঁর গৃহে অতিথি হিসেবে পেয়ে নিজেকে ধন্যাতিধন্য মনে করেছেন।

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেই ত ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন ॥
তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব-আচার।
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ॥ [১৩৪]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৭/১৬৯-১৭০

বৃন্দাবন দর্শন:

বৃন্দাবন হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতি মনোরম। দর্শনেই যেন তৃপ্তি। চৈতন্যদেব মথুরা থেকে বৃন্দাবনে এসে সেই সনোড়িয়া বিপ্রের সাথে বিভিন্ন তীর্থ স্থান ভ্রমণ করেন। যমুনার চব্বিশ ঘাটে স্নান করেন। রাধাকৃষ্ণলীলা বিজড়িত স্থান এই যমুনা।

তিনি স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর, মহাবিদ্যা, গোকর্ণ সহ প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন। দ্বাদশ বন পরিভ্রমণ করেন। গাভী, মৃগ-মৃগী তাঁকে দর্শন করে তাঁর অঙ্গলেহন করে। পিক, ভৃঙ্গরা গীত গায়। ময়ূরগণ নৃত্য করে।

পুষ্প ফলে সুরভিত মধুর বৃন্দাবন। শস্যে ভরা সবুজ শ্যামল বৃক্ষ লতাদি পরিবেষ্টিত বৃন্দাবন দর্শন করে তাঁর কৃষ্ণলীলা চিত্তে জাগ্রত হলে তিনি প্রেমে ভাবাবিষ্ট হন। অন্যান্য তীর্থের থেকে এখানে এসে তাঁর প্রেমের ভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই মনোমুগ্ধকর বর্ণণা পাই–

ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা ॥
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ-মন।
বৃন্দাবনে যাইতে পথে হৈল শতগুণ ॥
সহস্রগুণ প্রেম বাঢ়ে মথুরা-দর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাঢ়ে ভ্রমে যবে বনে ॥ [১৩৫]

চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৭/২০৪, ২১২-২১৩

চৈতন্যদেব অরিট গ্রামে এসে ধানক্ষেতের মধ্যে কৃষের প্রেয়সী ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর লীলা বিজড়িত স্থান রাধাকুণ্ড উদ্ধার করেন। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃতে পদ্মপুরাণের* উদ্ধৃতি দিয়েছেন–

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ২॥ [১৩৬]

চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৮/২

রাধাকুণ্ডের মাটি দ্বারা তিলক তৈরী হয়। চৈতন্যদেব বলভদ্র ভট্টাচার্যকে দিয়ে রাধাকুণ্ডের মাটি সংগ্রহ করে নিলেন। তিনি ক্রমে সুমনসরোবর, গোবর্ধন পর্বত, ব্রহ্মকুণ্ড, মানসগঙ্গা, গোবিন্দ কুণ্ড, গাঁঠুলি গ্রামে গোপাল দর্শন করেন। তিনি এখানে ৩দিন থাকেন। তিনি কাম্যবন, নন্দীশ্বর, পাবনাদি বিভিন্ন কুণ্ড, খদিরবন, ভাণ্ডীরবন, ভদ্রবন, লৌহবন, মহাবন, যমলার্জ্জুন ভঙ্গাদি সহ গোকুল দর্শন করে মথুরা আসেন। তিনি অক্রূরতীর্থ, কালিয়হ্রদ, দ্বাদশ-আদিত্য, কেশীতীর্থ, রাসস্থলী, চীরঘাট, তেঁতুলীতলা, আমলিতলা প্রভৃতি তীর্থ স্থান দর্শন করেন। রাজপুত জাতি এক গৃহস্থ বৈষ্ণব কৃষ্ণদাসের সাথে চৈতন্যদেবের পরিচয় হলে তিনি সঙ্গী হন। [১৩৭]

চৈতন্যদেবের রাসস্থল দর্শন :

শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবনের অনেক দর্শনীয় স্থান দর্শন করেন। কিন্তু তিনি মহারাসস্থান দর্শন করে অভিভূত হন। কৃষ্ণের সর্বোত্তম লীলা হচ্ছে রাসলীলা। মাধুর্যরসের ভক্ত সেই কৃষ্ণ পিয়াসী গোপীদের অনুরাগ-বৃদ্ধির জন্য গোপী শ্রেষ্ঠা রাধাকে নিয়ে তিনি অন্তর্হিত হন যেখানে সেই স্থান চৈতন্যদেব দর্শন করেন। যথা–

এবং রাসরসামোদী গোপীনাং রাগবৃদ্ধয়ে।
একামাদায় সহসা তিরোভূতোঽত্র পশ্য তৎ ॥ ১৩॥ [১৩৮]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্-৪র্থ-প্রক্রম/৯ম সর্গ/১৩

বৃন্দাবন দর্শনে চৈতন্যদেবের প্রেমের উন্মাদ বৃদ্ধি :

চৈতন্যদেব বৃন্দাবনের বিভিন্ন বন, কুঞ্জ, ঘাট প্রভৃতি লীলাস্থান দর্শন করতে করতে কৃষ্ণ প্রেমের বিরহে তিনি উন্মাদের মতো বিভিন্ন স্থানে করুণ কণ্ঠে রোদন করতে করতে লুটিয়ে পড়তেন। তাঁর এই দৃশ্য অবলোকন করে বৃন্দাবনের লতা, বৃক্ষ, পশু-পাখি প্রভৃতি মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং ময়ূরেরা পর্যন্ত নৃত্য ত্যাগ করে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কেকারবে বিলাপ করছিল। এ প্রসঙ্গে পাই–

অনুবনমনুকুঞ্জমীক্ষ্যমাণে, রুদতি বিভাবনুরক্তি-মুক্তকণ্ঠম্।
রুরুদুরিব লতাশ্চ শাখিনশ্চ, দ্বিজ-মৃগরাজিরভাজি মূর্ছয়ৈব ॥ ২৭
বিলপতি করুণস্বরেণ দেবে, জলধরধীরগভীর–নিঃস্বনেঽপি।
চিরমনুবিলপন্তি বাষ্পকণ্ঠাঃ ক্বচন চ লাস্যমপাস্য নীলকণ্ঠাঃ ॥ ২৮ [১৩৯]

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্-নবম অঙ্ক/২৭-২৮

প্রয়াগ যাত্রা:

বৃন্দাবন ভ্রমণ করতে করতে মাঘ মাস শুরু হলো। মাঘমাসে মকরে প্রয়াগে স্নান শুরু হবে। সেই পবিত্র তিথিতে স্নান করার জন্য চৈতন্যদেব সঙ্গীসহ প্রয়াগের উদ্দেশে যাত্রা করেন গঙ্গাপথ ধরে। পথিমধ্যে এক বৃক্ষ তলে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। নিকটে বহু গাভী বিচরণ করছে সেই সময়ে এক গোপ বংশী বাজালে তাঁর বৃন্দাবনের কৃষ্ণ স্মৃতি জাগরিত হলে প্রেমাবেশে অচৈতন্য হয়ে ভূমিতে পড়ে যান।

সেখানে কিছু পাঠান সৈন্য ছিল। তারা মনে করল–এই সন্ন্যাসীকে সঙ্গীরা ধুতুরা সেবন করিয়ে অচেতন করে ধনসম্পদ নিয়েছে। তাই তারা সঙ্গী চার জনকে বেঁধে ফেলে। তাদের কেটে ফেলবে, এই ভয়ে তারা কম্পিত হলো। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যের বাহ্য চেতনা ফিরলে পাঠান সৈন্যদেরকে বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করে তিনি বলেন চার জন সঙ্গীরা আমার সেবক। আমি ভিক্ষুক, নাই কোন ধনসম্পদ। পাঠান সৈন্যদের মধ্যে একজন ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞানী পীর। চৈতন্যকে মান্য করে তাঁর প্রতি ভক্তি জাগ্রত হলে পাঠান পীর চৈতন্যদেবের সাথে দর্শন নিয়ে শাস্ত্রালোচনা করেন। যথা–

'অদ্বয়বাদ' সেই করিল স্থাপন।
তারি শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন ॥
যেই-যেই কহে, প্রভু সকলি খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে, মহা স্তব্ধ হৈল ॥[১৪০]

চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৮/১৭৭-১৭৮

তখন সেই পাঠানরা চৈতন্যদেবের চরণে পতিত হয়ে কৃপা প্রার্থনা করলে তিনি তাঁদের ভক্তে পরিণত করেন। সেই বর্ণনা পাই–

"পাঠান বৈষ্ণব" বলি হইল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥

সেই বিজুলিখান হৈল পরম ভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব ॥[১৪১]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৮/২০১-২০২

শ্রীরূপের মিলনঃ

শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগে এসে ত্রিবেণীতে মকর স্নান করে দশ দিন থাকেন। তিনি এখানে বহু ভক্ত সঙ্গে বিন্দুমাধব দর্শন করেন। প্রয়াগের আড়ৈল গ্রামে বসবাসকারী বল্লভ ভট্টের গৃহে তিনি অতিথি হিসেবে থাকেন। সেখানে রঘুপতি উপাধ্যায় নামক বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সেখানে তাঁকে দর্শনের জন্য বহুলোকের ভীড় হয়। তিনি ভীড় এড়াবার জন্য দশাশ্বমেধে চলে আসেন। শ্রীরূপ তাঁর ভ্রাতা অনুপমকে নিয়ে রাজা হোসেন সাহের রাজকার্য পরিত্যাগ করে সকল ধন সম্পদের মায়া ত্যাগ করে সংসারের বন্ধন মোচন করে প্রয়াগে এসে চৈতন্যদেবের সাথে বিপ্রগৃহে মিলিত হন। তখন সনাতন কারাবন্দি। দশসহস্র স্বর্ণ মুদ্রা তাঁর মুক্তির জন্য মুদি দোকানে রেখে এসেছেন। সনাতনকে পত্র দিয়ে কারামুক্তির পথ বেছে নিয়ে চৈতন্যদেবের দর্শনের কথা জানিয়ে রূপ-অনুপমকে নিয়ে প্রয়াগে আসেন। চৈতন্যদেব সব বিষয় অবগত হয়ে বললেন– সনাতন ইতিমধ্যে কারামুক্ত হয়েছে। তিনি রূপের বিনয়ে মুগ্ধ হন। দশ দিন নিকটে রেখে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্বসহ পারমার্থিক শিক্ষা প্রদান করে তাঁকে বৃন্দাবনে গিয়ে শাস্ত্র রচনা, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বিগ্রহ সেবা সহ ভক্তিতত্ত্ব প্রচারের নির্দেশ প্রদান করেন। যথা–

কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত ॥
শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিল।
প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে সব আচরিল ॥ [১৪২]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/১৯/১০৫, ১০৮

পুনরায় কাশী গমনে সনাতনের সাক্ষাৎ :

চৈতন্যদেব রূপ-অনুপম ও প্রয়াগের ভক্তদের বিদায় দিয়ে বারাণসীতে আসেন। এখানে চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র ও মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের সাথে মিলিত হন। এদিকে গৌড়ের রাজা নবাব হোসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী সনাতন রাজকার্য পরিত্যাগ করায় রাজা তাঁকে কারাগারে বন্দি করেন। রূপের পত্র পেয়ে বিস্তারিত অবগত হয়ে কারারক্ষীকে সাত হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কারা মুক্ত হয়ে ফকির বেশে পাহার-পর্বত বনজঙ্গল নানা কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে রাজ ঐশ্বর্যের মোহ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় চৈতন্যদেবের সংবাদ অবগত হয়ে কাশীতে চন্দ্রশেখরের ঘরের দরজায় এসে হাজির হন। চৈতন্যদেব অন্তর্দৃষ্টিতে জানতে পেরে চন্দ্রশেখরকে বলেন–'দ্বারে একজন বৈষ্ণব এসেছে, তাঁকে ঘরে নিয়ে এসো।' কিন্তু চন্দ্রশেখর দেখলেন একজন দরবেশ দাঁড়িয়ে আছে।

তখন তিনি বলেন– সেই দরবেশকে নিয়ে এসো। সনাতন গৃহে প্রবেশ করে করুণার প্রকাশ চৈতন্যদেবকে দর্শন করে তাঁর শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়ে নিজেকে অত্যন্ত নীচ, হীন জ্ঞানে বিনয়ের সাথে তাঁর স্তুতি করে উদ্ধারের জন্য নিবেদন করেন। তিনি সনাতনকে স্পর্শ করলে সনাতন নিজেকে পাপী বলে গদগদ কণ্ঠে কান্না করেন। করুণাময় চৈতন্যদেব তখন বললেন– তোমাকে স্পর্শ করলে আমি পবিত্র হই। সেই কথা চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন কবিরাজ গোস্বামী–

প্রভু কহে–তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥ [১৪৩]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/২০/৫৫

ভক্তের মহত্ত্ব স্মরণে কৃষ্ণদাস কবিরাজ *হরিভক্তিবিলাসের* একটি শ্লোকের উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেন– চতুর্বেদী হলেও আমার ভক্ত না হলে সে আমার প্রিয় নয়, কিন্তু চণ্ডালও যদি আমার ভক্ত হয় সেই আমার প্রিয়। যথা–

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ [১৪৪]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/২০/৩

চৈতন্যদেব সনাতনের নিকট থেকে কারামুক্তির সংবাদ জেনে তিনি সনাতনকে রূপ-অনুপমের মিলনের কথা বলেন। প্রয়াগে তাঁর দু'ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয় এবং তাঁদের বৃন্দাবন পাঠান। এর পরে সনাতন চৈতন্যদেবের নিকটে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানার প্রার্থনা করলে চৈতন্যদেব কাশীতে বসে সনাতনকে দুই মাস ধরে পারমার্থিক তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন। কৃষ্ণের তিন শক্তি– চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। এছাড়া সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব, অবতার তত্ত্ব, সাধনভক্তির চৌষট্টি প্রকার অঙ্গসহ সকল প্রকার ভাগবত শিক্ষা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি বৈষ্ণব স্মৃতি রচনার বিষয়ে দিগ্‌দর্শন প্রদান করে তাঁকে বৃন্দাবনে যাবার আদেশ প্রদান করেন। যথা–

সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ- বচন।
শ্রীমূর্ত্তি বিষ্ণুমন্দির-করণ লক্ষণ ॥
সামান্য সদাচার, আর বৈষ্ণব আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব স্মার্ত্ত ব্যবহার ॥
এই সংক্ষেপে সূত্র কৈল দিগ্‌দরশন।
যবে তুমি লিখ কৃষ্ণ করাবেন স্ফুরণ ॥ [১৪৫]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/২৪/২৫৫-২৫৭

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে বেদান্ত আলোচনা :

শ্রীচৈতন্যদেব কাশীতে অবস্থান কালে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট সরস্বতীর অনুগামীরা বলেন– চৈতন্যদেব কেশব ভারতীর শিষ্য। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়েও বেদান্ত পাঠ করেন না। সর্বদা নামকীর্তন করে পাগলের মত বিচরণ

করেন। উৎকলের শ্রেষ্ঠ বেদান্তবিৎ সার্বভৌম ভট্টাচার্যকেও তিনি তাঁর ইন্দ্রজাল দিয়ে ভাবুকে পরিণত করেছেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলেন– তিনি কাশীতে এমন কিছু করতে পারবেন না, তবে সবাই সাবধান থাকবে। তৎকালীন ভারতবর্ষে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের পীঠস্থান ছিল কাশী। প্রকাশানন্দ সরস্বতী বারাণসীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের গুরু। উচ্চে তাঁর অবস্থান। বেদান্তের ভাষ্যকার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের অনুগামী। কিন্তু সরস্বতীর অনুগামীরা চৈতন্যদেবের নিন্দায় পঞ্চমুখ। চৈতন্যদেব এসব বিষয় আমলে নেননি। মহারাষ্টীয় বিপ্রের গৃহে সরস্বতীর অনুগামী ও চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সেই সভাতে চৈতন্যদেব বেদান্তের ব্যাখ্যা করেন–

ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল ॥
এই অর্থ–আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ।
শ্রীভাগবত করি সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥
চারিবেদ উপনিষদ্– যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য– শ্রীভাগবত।
ভাগবতশ্লোক উপনিষদ্– কহে এক অর্থ ॥
ভাগবতের সম্বন্ধাভিধেয়– প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥ [১৪৬]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/২৫/৭৯, ৮১-৮২, ৮৪-৮৫

এভাবে চৈতন্যদেব দীর্ঘক্ষণ ধরে বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করলে প্রকাশানন্দ সরস্বতী চৈতন্যদেবের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁর পূর্বকৃত অপরাধ মার্জনাসহ কৃপাশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

প্রকাশানন্দের কৈল প্রভু চরণ বন্দন।
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ধরিল চরণ ॥
তোঁহো কহে–তোমার পূর্ব্বে নিন্দা অপরাধ যে করিল।
তোমার চরণস্পর্শে সব ক্ষয় হৈল ॥[১৪৭]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/২৫/৬১, ৬৫

প্রকাশানন্দ বিজয়ে বারাণসীর সর্বত্র চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়লে প্রকাশানন্দ সরস্বতী শীষ্যসহ চৈতন্যদেবের ভক্ত হন। চৈতন্যদেবের এ এক বিরাট সাফল্য।

নীলাচলে প্রত্যাবর্তন :

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর ভ্রমণ উদ্দেশ্য সাধন করে সনাতন ও কাশীবাসী ভক্তদের বিদায় জানিয়ে পূর্বের পথে বলভদ্রসহ আঠারনালাতে আসেন। সেখানে এসে বলভদ্রকে প্রেরণ করেন পুরীতে তাঁর প্রত্যাগমন বার্তা জানাবার

জন্য। সংবাদ পেয়ে পুরী-ভারতী সহ সকল ভক্তরা নরেন্দ্র সরোবরে এসে শ্রীচৈতন্যদেবের সাথে মিলিত হন। মনে হয় যেন মহাসাগরের সাথে সাগরের মিলন। মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন পর প্রাণের ঠাকুরকে পেয়ে নবজীবন লাভ করেন। জগন্নাথের প্রসাদ একসঙ্গে ভোজন করে বৃন্দাবন ভ্রমণের সকল কাহিনী ভক্তদের সম্মুখে জানালে ভক্তরা মহানন্দে হরিধ্বনি করে নৃত্য কীর্তন করেন। যথা–

শুনিয়া ভক্তের গণ যেন পুনরপি জীলা।
দেহে প্রাণ আইলে, যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা ॥
আনন্দে বিহ্বল ভক্তগণ ধাঞা আইলা।
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা ॥[১৪৮]
চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য/২৫/২২৫-২২৬

অন্ত্যলীলা

নাটক রচনায় শ্রীরূপের প্রশংসা ও আশীর্বাদ দান :

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে বসে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাটকের মঙ্গলাচরণ এবং নান্দীশ্লোক রচনা করেন। তিনি বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে আসার পথে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়। তিনি উড়িষ্যা রাজ্যে সত্যভামাপুর এসে রাত্রিতে স্বপ্নে আদেশ পান, সত্যভামাদেবী পৃথক নাটক রচনার কথা বললেন। যথা–

"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হইবে বিচক্ষণ ॥"
স্বপ্ন দেখি শ্রীরূপ করিল বিচার–।
সত্যভামায় আজ্ঞা– পৃথক্ নাটক করিবার ॥[১৪৯]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১/৩৭-৩৮

শ্রীপাদ রূপ নীলাচলে এসে হরিদাস ঠাকুরের কুটিরে অবস্থান করেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে চৈতন্যদেব শ্রীরূপকে বললেন–

"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজহৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাহাঁতে ॥"[১৫০]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১/৬১

চৈতন্যদেবের নির্দেশে শ্রীরূপ ব্রজলীলা এবং পুরলীলা নিয়ে পৃথকভাবে *বিদগ্ধমাধব* এবং *ললিতমাধব* নাটক রচনা করেন। যথা–

স্বরূপ কহে–কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে।

ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে ॥
আরম্ভিয়াছিলা, এবে প্রভুর আজ্ঞা পাঞা।
দুই নাটক করিতেছে বিভাগ করিয়া ॥
বিদগ্ধমাধব, আর ললিতমাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্‌ভুত সব ॥ [১৫১]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১/১১০-১১২

চৈতন্যপার্ষদদের উপস্থিতিতে সেই সভায় রায় রামানন্দ নাটকের লক্ষণ বিচার-বিশ্লেষণ করে তিনি রূপের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন– তোমার শক্তি বিনা কোন জীবের পক্ষে এইরূপ রচনা করার সাধ্য নেই। যথা–

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে–॥
কবিত্ব না হয় এই–অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥
প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দঘূর্ণন ॥ [১৫২]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১/১৩৮-১৪০

ছোট হরিদাসকে বর্জন:

ভগবান আচার্য নামে এক পরমভাগবত পুরীতে ছিলেন। তিনি একদিন চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করেন। উত্তম সেবার নিমিত্তে ভগবান আচার্য ছোট হরিদাসকে প্রেরণ করেন শিখিমাহিতীর বোন মাধবী দেবীর নিকটে শালি ধানের চাল আনার জন্যে। ছোট হরিদাস তাঁর নিকট থেকে চাল নিয়ে আসেন। উত্তম অন্নে খাদ্য প্রস্তুত করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভোজনের সময় উত্তম অন্নের সংগ্রহ বিষয়ে জানতে পেরে তিনি ছোট হরিদাসকে বর্জনের কথা বলেন। কেননা বৈরাগী হয়ে নারী সম্ভাষণ শাস্ত্র নিষিদ্ধ। তাই তিনি কুসুমের মত কোমল হয়েও এক্ষেত্রে বজ্রকঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন। যথা–

প্রভু কহে–বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ [১৫৩]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/২/১১৬-১১৭

কিন্তু চৈতন্যদেবের পার্ষদগণ হরিদাসকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য বহু অনুনয় বিনয় করেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্তে অটল। একবছর ছোট হরিদাস ক্ষমা মার্জনার জন্য চৈতন্যের অপেক্ষা করে তিনি সবাইকে না জানিয়ে প্রয়াগে গিয়ে ত্রিবেণীতে প্রাণ বিসর্জন দেন। যথা–

রাত্রি অবশেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রয়াগেরে গেলা, কারে কিছু না বলিয়া ॥
প্রভুপদ প্রাপ্তি-লাগি সঙ্কল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল ॥ [১৫৪]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/২/১৪৪-১৪৫

রঘুনাথ দাসের মিলন:

সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাস। গোবর্ধন দাসের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ দাস। তিনি শান্তিপুরে চৈতন্যের নির্দেশে গৃহে এসে সংসার কার্যে মনোনিবেশ করে মনে মনে কৃষ্ণ ভজন করেন। একদিন গভীর রাতে দেখেন তাঁর প্রহরীরা ঘুমিয়ে আছে এই সুযোগে যদুনন্দন আচার্যের সাথে গৃহ ত্যাগ করে বহুকষ্টে বার দিন পরে অর্ধাহারে-অনাহারে থেকে নীলাচলে এসে চৈতন্যচরণে নিজেকে সমর্পণ করেন। তখন চৈতন্যদেব তাঁকে আশীর্বাদ করে স্বরূপ দামোদরের হস্তে সমর্পণ করেন। যথা–

এই রঘুনাথে আমি সোঁপিল তোমারে।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥
তিন 'রঘুনাথ' নাম হয় আমার গণে।
'স্বরূপের রঘুনাথ' আজি হৈতে ইহার নামে ॥[১৫৫]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/৬/২০০-২০১

তিনি এসে জগন্নাথ মন্দিরে সিংহদ্বারে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করেন। পিতা লোকমুখে জানতে পেরে চারশত মুদ্রা, দুই ভৃত্য ও এক জন ব্রাহ্মণ পাঠালেন তাঁর সেবা শুশ্রুষার জন্য। সেই অর্থ দিয়ে চৈতন্যের সেবা করেন। তিনি হৃদয়ে বৈরাগ্য ভাব ধারণ করে নিষ্কিঞ্চন ভজনের জন্য চৈতন্যের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন। চৈতন্যদেব বললেন–

অমানি মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লৈবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥[১৫৬]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/৬/৪৬৫-৪৬৬

তিনি ভিক্ষা ছেড়ে দিয়ে অযাচক বৃত্তি অবলম্বন করেন। এক পর্যায়ে তিনি ফেলে দেওয়া তিন চার দিনের পচা অন্ন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে নিষ্কিঞ্চন বৈরাগ্য সাধনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। যথা–

সিংহদ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে।

সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গা গাই খাইতে না পারে ॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্র্যে ঘরে আনি।
ভাত পাখালিয়া ফেলে দিয়া বহু পানী ॥
ভিতরের দৃঢ় যেই মাজিভাত পায়।
লোণ দিয়া মাখি সেই সব ভাত খায় ॥[১৫৭]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/৬/৩০৯-৩১১

জলকেলি ও গৌড়ীয়দের আনীত দ্রব্য সেবন :

প্রতিবৎসর গৌড়ীয় ভক্তরা রথযাত্রার পূর্বে চৈতন্যদেব দর্শনে পুরীতে আসেন। গৌড়ীয় ভক্তদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য চৈতন্যদেবের আজ্ঞা মালা নিয়ে অদ্বৈত আচার্যকে পরিয়ে দেন। সেই সময় শ্রীচৈতন্যদেবের নেতৃত্বে জগন্নাথ ভক্তগোষ্ঠী ও গৌড়ীয় ভক্তগোষ্ঠী মিলিত হয়ে নরেন্দ্র সরোবরে মহাকীর্তন ও বিভিন্ন প্রকার বাদ্য বাজনাসহ আনন্দ মুখরিত হয়ে জলকেলী করে। নিত্যানন্দ, পরমানন্দপুরী, রামানন্দ, সার্বভৌম, অদ্বৈতাচার্যসহ শীর্ষ স্থানীয় সকল ভক্তরা দিব্যানন্দযোগে পরস্পর জলকেলী করে স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করেন। যথা–

প্রভুও সকল ভক্ত লই' কুতূহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে ॥
অদ্বৈত, চৈতন্য দুঁহে জল-ফেলাফেলি।
প্রথমে লাগিলা দুঁহে মহা-কুতূহলী ॥[১৫৮]
চৈতন্যভাগবত-অন্ত্য/৮/১১২, ১২০

এর পরে রথযাত্রা উৎসব ও জন্মাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গৌড়ীয় ভক্তরা চৈতন্যদেবের জন্য বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এসেছেন। সেই বিষয়ে ভক্তগণ প্রতিদিন গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করে প্রভু আমাদের দ্রবগুলো গ্রহণ করেছেন? ভক্তদের এরূপ ব্যবহারে গোবিন্দ তাঁকে অনুরোধ করে গৌড়ীয়দের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করার জন্য। তখন তিনি ভক্তদের আনন্দ বিধানের জন্য দ্রব্য গ্রহণ করেন। যথা–

আচার্য্যের এই পৈড় পানা সরপূপী।
এই অমৃত গোটিকা মণ্ডা এই কর্পূরকূপী ॥[১৫৯]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১০/১১৫

দ্রব্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে রাঘবের ঝালি।

আরদিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল।
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল ॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপভোগ কৈল।
স্বাদু সুগন্ধ দেখি বহু প্রশংসিল ॥[১৬০]

চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১০/১২৬-১২৭

কভু রাত্রিকালে কিছু করেন উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করেন উপভোগ ॥[১৬১]

চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১০/১২৯

হরিদাসের প্রতি সেবার মাহাত্ম্য প্রকাশ :

হরিদাস ঠাকুর যশোরের বূরণ গ্রামে মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু ছোট বেলা থেকেই তিনি কৃষ্ণনাম কীর্তন করতেন। তিনি বেনাপোল থেকে এসে গঙ্গার তীরে বসবাস করেন। যবন হয়েও হিন্দুর নাম কীর্তন করেন। সেই কারণে কাজীদের নালিশে মুলুকপতি তাঁকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতে তাঁর মৃত্যুদণ্ড প্রদানের আদেশ জারি করেন। কিন্তু শত নির্যাতনেও তাঁর মৃত্যু হলো না। সেই দৃশ্য দর্শন করে মুলুকপতিসহ সবাই তাঁকে মহাপীর হিসেবে আখ্যা দিলেন এবং অপরাধ ক্ষমা করার প্রার্থনা করেন। যথা–

"সত্য সত্য জানিলাঙ,–তুমি মহা-পীর।
'এক'-জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির ॥
যোগী জ্ঞানী যত সব মুখে-মাত্র বলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা-কুতূহলে ॥
তোমারে দেখিতে মুই আইলুঁ এথারে।
সব দোষ, মহাশয়! ক্ষমিবা আমারে ॥[১৬২]

চৈতন্যভাগবত-আদি/১৬/১৫০-১৫২

হরিদাস পরে শান্তিপুরে এসে অদ্বৈতের সাথে নামকীর্তনে যোগদান করেন এবং পরবর্তী সময়ে নিত্যানন্দের সঙ্গে নীলাচলে এসে বসবাস করেন। প্রতিদিন তিনি তিন লক্ষ নাম জপ করেন, এই কারণে তাঁকে 'নামাচার্য' বলা হয়। তিনি বয়সে বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর অভিলাষ চৈতন্যের অপ্রকটের পূর্বে তিনি দেহত্যাগ করবেন। কেননা তিনি চৈতন্যদেবের বিরহ সহ্য করতে পারবেন না, তাই চৈতন্যদেব তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য হরিদাসের কুটিরে পার্ষদভক্তগণ নিয়ে মহাসংকীর্তন শুরু করেন। হরিদাস চৈতন্যের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর দুটি চরণ হরিদাস তাঁর বক্ষের উপর স্থাপন করে বদনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম স্মরণ করে ইহলীলা সংবরণ করেন। যথা–

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ বোলে বারবার।
প্রভু-মুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'- শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রমণ ॥

মহাযোগেশ্বরপ্রায় দেখি স্বচ্ছন্দে মরণ।

ভীষ্মের নির্য্যাণ সভার হইল স্মরণ ॥[১৬৩]

চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১১/৫৪-৫৬

চৈতন্যদেব তাঁর তিরোধানের পরে পঞ্চমুখে হরিদাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। তিনি ভক্তগণসহ হরিদাসের সমাধি দেন। বৈষ্ণব সেবার নিমিত্তে জগন্নাথ মন্দিরে পশারিদের নিকট প্রসাদ ভিক্ষা করে হরিদাসের জন্য মহোৎসব করেন। প্রসাদ দিয়ে সবাইকে তিনি ভোজন করান এবং আনন্দে নৃত্য করেন। ভক্তরা হরিদাসের আজীবন ত্যাগের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে হরিধ্বনি করেন। যথা–

ভোজন করিয়া সবে কৈলা আচমন।

সবারে পরাইলা প্রভু মাল্য-চন্দন ॥

প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বর-দান।

শুনি' ভক্তগণের জুড়ায় মনস্কাম ॥[১৬৪]

চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১১/৮৯-৯০

রাজসিক সেবা বর্জন :

চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী ভাব ধারায় জীবন ধারণ করায় তাঁর মাঝে মাঝে বায়ু ও পীত্তরোগের প্রকোপ দেখা দেয়। জগদানন্দ তাঁর রোগমুক্তির জন্য মানসজ্ঞানে গৌড় থেকে এক কলস সুগন্ধি চন্দনতৈল নিয়ে আসেন। রাত্রিতে ব্যবহার করার জন্য তিনি তাঁকে অনুরোধ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। যথা–

প্রভু কহে–সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।

তাহাতে সুগন্ধিতৈল– পরমধিক্কার ॥

এই সুখ-লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।

আমার সর্ব্বনাশ, তোমাসভার পরিহাস? ॥

পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে।

'দারী সন্ন্যাসী' করি আমারে কহিবে ॥[১৬৫]

চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১২/১০৭, ১১২-১১৩

কিন্তু জগদানন্দ এই কথা শ্রবণ করে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে তৈলপূর্ণ কলসটি তাঁর সম্মুখে ভেঙ্গে ফেলে দেন এবং তিনদিন উপবাস থেকে ঘরে দরজা দিয়ে থাকেন। চৈতন্যদেব তাঁর ক্রোধ প্রশমিত করার জন্যে তাঁর গৃহে মধ্যান্ন ভোজনের প্রস্তাব করেন এবং ভোজন করায় রোষের লাঘব হয়। এ প্রসঙ্গে ড. রাধাগোবিন্দ নাথ বলেছেন– চৈতন্যদেব সন্ন্যাস ধর্ম অত্যন্ত কঠোরতার সাথে পালন করেছিলেন। নিদ্রা, আহার, বিশ্রাম কোন কিছুই সঠিক মতো না হবার কারণে বায়ু ও পিত্ত রোগের লক্ষণ থাকা স্বাভাবিক। চন্দন মিশ্রিত এই তৈলটি ঐ রোগ নিবারণের জন্য। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে সুগন্ধি তৈল ব্যবহার যেমন সন্ন্যাস ধর্ম নষ্ট হবে তেমনি হবে লোকনিন্দা। সবাই মনে করবে কোন স্ত্রীলোকের প্রীতি বিধানার্থে তিনি সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করেছেন। তাই

তিনি রোগনিবারণ বা স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিত্যাগ করে আশ্রমধর্ম রক্ষার্থে সকল আরাম-আয়েস জলাঞ্জলী দেন।[১৬৬] চৈতন্যদেব কলার পাতায় রাত্রে শয়ন করেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের শরীর কৃশ হওয়ায় জগদানন্দ মনে করেন তিনি অঙ্গে ব্যথা পান। তাই তাঁর আরামের জন্য শিমুল তুলা দিয়ে গৈরিক বসনদ্বারা কভার তৈরী করে তোষক ও বালিশ প্রদান করলে চৈতন্যদেব তা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন। সন্ন্যাস ধর্ম কঠিন ধর্ম, তা পালনের জন্য তিনি বদ্ধ পরিকর। তিনি দৈহিক সুখ বা কোন ভক্তের প্রীতি বিধানের জন্য সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেননি। বজ্রের মতো কঠিন হয়ে ধর্ম সাধনার পথ অবলম্বন করেন। তাই–

সন্ন্যাসী-মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমাকে খাট তুলী-গাণ্ডু মস্তক-মুণ্ডন? ॥ [১৬৭]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১৩/১৪

রঘুনাথ ভট্টের মিলনঃ

কাশীতে বসবাসরত তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য ষড়ুগোস্বামীর অন্যতম। কাশীতে চৈতন্যদেবকে তিনি নিজগৃহে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। দীর্ঘদিন চৈতন্যদেবের দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকায় তিনি নীলাচলে আসেন চৈতন্যদেবকে দর্শন করার জন্য। নীলাচলে এসে চৈতন্যদেবের দর্শনে মুগ্ধ হয়ে আট মাস চৈতন্যদেবের সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করার পরে তিনি গৃহে গিয়ে পিতামাতার সেবার সাথে বৈষ্ণব সন্নিধানে ভাগবত অধ্যয়নের আদেশ লাভ করেন। যথা–

অষ্টমাস বহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
'বিভা না করিহ' বলি নিষেধ করিলা ॥
'বৃদ্ধ মাতা-পিতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ [১৬৮]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১৩/১১১-১১২

তিনি তাঁকে কণ্ঠীমালা দিয়ে পুনরায় নীলাচলে আসার আদেশ প্রদান করেন। তিনি কাশীতে গিয়ে পিতা-মাতার সেবাসহ চৈতন্যের আদেশ যথাযথভাবে পালন করেন। চার বছর পরে পিতা-মাতা পরলোক প্রাপ্ত হলে তিনি পূর্বের নির্দেশ মতো নীলাচলে এসে চৈতন্যচরণে আত্মসমর্পণ করলে এবং আটমাস অতিবাহিত হলে তিনি তাঁকে বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের নিকটে সাধন অভিপ্রায়ে যেতে আদেশ করেন। তিনি পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রেষ্ঠ ভাগবত পাঠক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। যথা–

আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ! যাহ বৃন্দাবনে।
তাহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে ॥
ভাগবত পঢ় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ [১৬৯]

চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১৩/১১৯-১২০

কবিকর্ণপূরের প্রতি আশীর্বাদ :

কবিকর্ণপূরের পিতা শিবানন্দ প্রতিবৎসর রথাযাত্রার প্রাক্কালে গৌড়ীয় ভক্তদের সাথে নীলাচলে আসতেন। একবছর বিদায়কালে চৈতন্যদেব শিবানন্দকে বলেন–এইবার যে সন্তানের জন্ম হবে তাঁর নাম রাখবে পুরীদাস। যথাসময়ে পুত্রের জন্ম হলে শিবানন্দ মহানন্দে পুত্রের নাম রাখেন পরমানন্দ-পুরীদাস। স্ত্রী-তিনপুত্র সহ শিবানন্দ নীলাচলে এসে চৈতন্যদেবের দর্শন লাভ করেন এবং চৈতন্যদেবকে প্রণতি নিবেদন করেন। চৈতন্যদেব তাঁর পুত্রের নামকরণ জেনে তিনি তাঁকে পুরীদাস নামেই ডাকেন, উপহাস করেন।

প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম 'পরমানন্দদাস'।
'পুরিদাস' করি প্রভু করে উপহাস ॥
শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইল।
মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল ॥ [১৭০]

চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১২/৪৮-৪৯

কিন্তু চৈতন্যদেব পুরীদাসকে কৃষ্ণনাম বলতে বললে তিনি চুপ করে থাকেন। শিবানন্দ বহু চেষ্টা করলেন কিন্তু পুত্র উচ্চারণ করলেন না। কিন্তু অন্যদিনে চৈতন্যদেব তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ পুরীদাসের মুখে কৃপা করে স্পর্শ করান এবং পুরিদাসকে এক শ্লোক পড়তে বললে তৎক্ষণাৎ পুরীদাস নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করেন। যথা–

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥ [১৭১]

চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১৬/৭

এ প্রসঙ্গে ড. রাধাগোবিন্দ নাথ বলেছেন–পুরীদাসের বয়স মাত্র সাত বৎসর। তিনি তখন লেখাপড়া জানেন না। জন্মের পূর্বেই চৈতন্যদেব তাঁর আশীর্বাদ স্বরূপ নাম রাখেন। সেই বালকের প্রথম সাক্ষাতে তিনি তাঁকে কৃষ্ণনাম বলতে বললে তিনি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ না করে মনে মনে জপ করেন। কেননা দীক্ষা মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণে মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হয়। কিন্তু সেই পুত্রকে পরে চৈতন্যদেব তাঁর মুখে পদাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করালে তৎক্ষণাৎ তিনি অল্প বয়সের হলেও সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের মাধুর্য প্রেমের বর্ণনা দিয়ে শ্রীহরির জয়গান গেয়ে শ্লোক উচ্চারণ করেন। অপূর্ব সুন্দর শ্লোক উচ্চারণে সবাই বিস্মিত হলেন। কেবল চৈতন্যের অসাধারণ কৃপার ফলেই এটি সম্ভব। এই পুরীদাসই হচ্ছে পরবর্তী কালের বিখ্যাত মহাকবি কবিকর্ণপূর। [১৭২]

মাতৃভক্তি :

শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করে মাতৃআজ্ঞায় নীলাচলে বাস করেন। কিন্তু পুত্র বিচ্ছেদে বিরহিণী মাতার প্রতি তাঁর হৃদয়ে ক্ষরণ হয়। অন্তর জ্বালায় তিনি প্রতিবৎসর পণ্ডিত জগদানন্দকে নবদ্বীপে প্রেরণ করেন মায়ের দুঃখ

মোচনের জন্য। সঙ্গে তিনি জগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র এবং মহাপ্রসাদ প্রদান করেন। শচীমাতা জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপের গৃহত্যাগে, স্বামীর তিরোধানে এবং সর্বশেষ অবলম্বন চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণে শত দুঃখকষ্টের মধ্যে কোনক্রমে প্রাণ ধারণ করে আছেন। যদি পুত্র নিমাইয়ের একটু সংবাদ জানতে পারেন, হয়তো মৃতপ্রায় দেহে প্রাণের সঞ্চার হতে পারে এই প্রত্যাশায় চৈতন্যদেব জগদানন্দকে মাতার নিকটে প্রেরণ করেন। প্রতিবৎসর যখন গৌড়ীয় ভক্তরা নীলাচলে আসেন, তখনও তাঁদের নিকট প্রসাদীবস্ত্র এবং মহাপ্রসাদ পাঠান। কিন্তু এবারে মাতার নিকটে কি কি বিষয়ে বলতে হবে তা তিনি জগদানন্দকে বলে দেন। তিনি বলেন–তুমি আমার হয়ে মাতাকে প্রণাম করবে এবং বলবে–প্রতিদিন আমি তাঁর চরণ বন্দনা করি। তিনি যেদিন যা খাওয়াতে চান আমি আবির্ভূত হয়ে সবই গ্রহণ করি। মাকে ত্যাগ করে আমি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছি। আসলে আমি পাগল হয়েই করেছি! ধর্ম রক্ষার্থে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে তোমার আজ্ঞায় আমি আজীবন নীলাচলে বাস করব। আমি সন্ন্যাসী হলেও তোমার অধীন। মাতৃসেবা ত্যাগে সন্ন্যাস ধর্ম রক্ষার্থে পুত্রবৎ সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিও। এই প্রার্থনা সর্বান্তঃকরণে মায়ের চরণে নিবেদন করার জন্য জগদানন্দকে বলেন। সত্যিই চৈতন্যদেবের মাতৃভক্তি অতুলনীয় আর এ জন্যই তাঁকে 'মাতৃভক্তশিরোমণি' বলা হয়ে থাকে। কেননা মাতৃ আদেশ শিরোধার্য করে সন্ন্যাসের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নীলাচল ত্যাগ করেননি। এ প্রসঙ্গে পাই–

তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি–পুত্র তোমার ॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে ॥"[১৭৩]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১৯/৮-১০

অদ্বৈতাচার্যের তর্জা :

জগদানন্দ পণ্ডিতকে অদ্বৈত আচার্য বললেন– আমি একটি সংবাদ দিব, তুমি সেই সংবাদটি চৈতন্যদেবকে বলবে। কিন্তু সেই সংবাদ ছিল তর্জা প্রহেলী আকারে। জগদানন্দ শ্রবণ করে অর্থ না বুঝে শুধু হাসতে থাকেন। তর্জা প্রহেলী হচ্ছে–

বাউলকে কহিয়–লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিয়–হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিয়–কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয়–ইহা কহিয়াছে বাউল ॥"[১৭৪]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১৯/১৯-২০

চৈতন্যদেব এই তর্জা শ্রবণ করে ঈষৎ হেসে মৌন অবলম্বন করেন। কিন্তু সবার পক্ষে স্বরূপ দামোদর অর্থ সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি ইঙ্গিতে বলেন–উপাসনার নিমিত্তে দেবতাকে আহ্বান করা হয়। কিন্তু পূজা নির্বাহ হলে বিসর্জন দিতে হয়। অদ্বৈতাচার্য মহাযোগেশ্বর, তিনি আগম শাস্ত্রের বিধান সম্পর্কে যথেষ্ট বিজ্ঞ। তিনিই জানেন কি অর্থ এই তর্জার! সকল ভক্তরা মনে করেন চৈতন্যদেব নিজেই জানেন না? কিন্তু স্বরূপ দামোদর তর্জার গূঢ় অর্থ জেনে বিষণ্ন মনে থাকেন। কিন্তু যেদিন থেকে তর্জা জানতে পারলেন, সেই দিন থেকে চৈতন্যদেবের কৃষ্ণ বিচ্ছেদ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। রাত দিন তিনি উন্মাদের মতো প্রলাপ করতে থাকেন। রাধাভাবে ভাবিত হয়ে সর্বদা বৃন্দাবনের স্মৃতি জাগরিত হয়। কৃষ্ণপ্রেমে দিব্যোন্মাদের ফলে চৈতন্যদেবের উদ্‌ঘূর্ণাদশা প্রাপ্ত হয়। যথা–

সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা দ্বিগুণ বাঢ়িল ॥
উন্মাদ-প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাঢ়ে অনুক্ষণে॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন।
উদঘূর্ণাদশা হৈল উন্মাদলক্ষণ ॥ [১৭৫]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১৯/২৯-৩১

দীব্যোন্মাদভাব :

শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসের শেষ বার বৎসর কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হয়ে রাধাভাবে ভাবিত হয়ে গম্ভীরায় স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের সাথে কৃষ্ণ বিষয়ক গীতি ও মাধুর্যলীলা আলোচনা করে রাতদিন অতিবাহিত করেন। এসময়ে কৃষ্ণ বিরহে তাঁর দিব্যোন্মাদ ভাব হতো। এই ভাব তাঁর তিনভাবে প্রকাশ পেত। অন্তর্দশা, বাহ্যদশা ও অর্দ্ধবাহ্যদশা। মাঝে মাঝে তাঁর কৃষ্ণস্ফূর্তিতে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হতো। সে বিষয়ে বর্ণনা করা হলো–

সিংহদ্বার:

কৃষ্ণ বিরহে যখন শ্রীমতী রাধারাণীর চরম সংকটাপন্ন অবস্থা, তখন কৃষ্ণ দূত হিসেবে উদ্ধবকে প্রেরণ করেন বৃন্দাবনে। উদ্ধব দর্শনে ব্রজেশ্বরী রাধারাণীর যেরূপ অবস্থা চৈতন্যদেবের তদ্রূপ অবস্থা। তিনি বিচ্ছেদে নিজেকে রাধারূপে ভাবতেন। রাধার মত কৃষ্ণ-পাগলিনী হতেন। এই ভাবটি চিত্তে অসহ যন্ত্রণার সৃষ্টি করে থাকে। সেটিই দিব্যোন্মাদনা ভাব। চৈতন্যদেবের বিরহ প্রশমনে স্বরূপ দামোদর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গান করেন আর রামানন্দ গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির বিভিন্ন শ্লোক ও পদ ভাব বুঝে পাঠ করতেন। এভাবে একদিন রাত্র গভীর হলে সমস্ত ঘরে দরজা দেওয়া থাকলেও তিনি দিব্যোন্মাদে জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে পতিত হলেন। ভক্তরা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে মন্দিরের সিংহদ্বারে গিয়ে পায়। তাঁর বাহ্য জ্ঞান ফিরানোর জন্য স্বরূপ দামোদর উচ্চৈঃস্বরে

কীর্তন করেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে তিনি বললেন– কৃষ্ণ আমাকে দর্শন দিয়ে বিদ্যুতের মতো অন্তর্ধান হলেন। দিব্যোন্মাদ হলে তাঁর চেতনা লোপ পেত এবং নাসিকায় শ্বাস থাকত না। এ প্রসঙ্গে–

সিংহদ্বারের উত্তরদিশায় আছে এক ঠাঞি।
তার মধ্যে পড়ি আছেন চৈতন্যগোসাঞি ॥
দেখি স্বরূপগোসাঞি আদি আনন্দিত হৈলা।
প্রভুর দশা দেখি পুন চিন্তিত হইলা ॥
প্রভুর পড়ি আছে দীর্ঘ–হাত পাঁচছয়।
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥[১৭৬]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১৪/৫৮-৬০

চটক পর্বত :

একদিন চৈতন্যদেব সমুদ্র দর্শন করতে গিয়ে সম্মুখে চটক পর্বত দেখে গোবর্ধন পর্বত মনে করেন। সেই ক্ষণে গোবর্ধনপর্বত স্মরণে তিনি বায়ু গতিতে ধাবমান হলেন। সঙ্গে তাঁর স্বরূপ, রামানন্দ, পুরী-ভারতী, জগদানন্দ, গদাধর সহ বহু ভক্তবৃন্দ। বায়ুবেগে ধাবিত হলে তাঁর দেহে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হয় এবং তিনি অচেতন হন। ভক্তরা সে দৃশ্য দর্শন করে উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্তন করেন এবং শীতল জল দিয়ে অঙ্গ সম্মার্জন করলে তাঁর চেতনা ফিরে আসে। যথা–

প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি' হৈলা চমৎকার ॥
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
সুশীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গ সম্মার্জ্জনে ॥ [১৭৭]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১৪/৯৯-১০০

পুষ্প উদ্যানে বৃন্দাবন ভ্রম:

চৈতন্যদেব স্বরূপ দামোদের ও রামানন্দের নিকট বিলাপ করতেন। কোথায় গেলে আমার প্রাণধন কৃষ্ণকে পাবো! তাঁর বিচ্ছেদ লাঘবের জন্য স্বরূপ দামোদর ভাব অনুসারে গান করতেন এবং রামানন্দ রায় কৃষ্ণকর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ এর শ্লোক ও বিদ্যাপতির পদ পাঠ করে তাঁকে আনন্দ প্রদান করতেন। এই ভাবে একদিন তিনি সমুদ্রতীর ধরে পথ চলতে চলতে আচম্বিতে পুষ্পের উদ্যান দর্শন করেন। সেই উদ্যান দর্শনে তাঁর বৃন্দাবন স্মৃতি জাগরিত হলে তিনি প্রেমে ভাবাবিষ্ট হন। রাসলীলায় হঠাৎ কৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে অন্তর্ধান হলে সখীদের যেরূপ ভাব হয়েছিল, ঠিক তেমনি চৈতন্যদেবের ভাব হয়েছিল। যথা–

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে যাইতে।

পুষ্পের উদ্যান তাহাঁ দেখি আচম্বিতে ॥
বৃন্দাবন-ভ্রমে তাহাঁ পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাহাঁ কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥
রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্ধান কৈলা।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইলা ॥ [১৭৮]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১৫/২৬-২৮

সমুদ্রে যমুনা দর্শন:

শ্রীচৈতন্যদেব প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের চিন্তা করতে করতে একদিন সমুদ্রের কূলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু তিনি সমুদ্রকে যমুনা মনে করে সেখানে একটি কদম্ব বৃক্ষের নিচে কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। সেই মুরলীধর কৃষ্ণের সৌন্দর্য অসমোর্দ্ধ। এই রূপ মাধুর্য দর্শনে তিনি মূর্ছিত হন। সাথে সাথে তাঁর সঙ্গীরা পূর্বের ন্যায় তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনেন। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি বলেন–কোথায় গেল কৃষ্ণ? এই মাত্র দর্শন দিয়ে তিনি বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হলেন। এ প্রসঙ্গে–

এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে–তাহাঁ কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥
কোটিমন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্য হরে জগন্নেত্র-মন ॥
সৌন্দর্য্য দেখিতে ভূমে পড়ে মুর্চ্ছা হঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥[১৭৯]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১৫/৪৮-৫০

সিংহদ্বারে গাভীগণমধ্যে কূর্মাকৃতি:

চৈতন্যদেব একদিন স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ সনে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় কৃষ্ণগীতি ও শ্লোক পাঠ করে রসাস্বাদন করেন। সব দরজা দেওয়া হলেও তিনি কৃষ্ণের বাঁশির শব্দ শুনে ভাবাবেগে উন্মত্ত হয়ে গম্ভীরা থেকে তিনি সিংহদ্বারের দক্ষিণে তৈলঙ্গাগাভীগণের মধ্যে কূর্মের মতো অচেতন হয়ে পড়ে থাকেন। সঙ্গীভক্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে সর্বত্র খুঁজাখুঁজি করে অবশেষে সেখানে পেয়ে পূর্বের ন্যায় তাঁকে সুস্থ করলে তিনি বলেন–কৃষ্ণের বেণুর শব্দ শুনে আমি বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম। তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে এলে? যথা–

ইতি-উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাভীগণমধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা ॥
পেটের ভিতর হস্ত-পদ–কূর্ম্মের আকার।

মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার ॥ [১৮০]

চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১৭/১৪-১৫

সমুদ্র পতন :

একদিন শরৎকালের জ্যোৎস্না রাত্রে চৈতন্যদেব অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের নিয়ে উদ্যানে ভ্রমণ করেন। সে সময়ে তিনি রাসলীলা শ্রবণ করে প্রেমাবেশে নৃত্য কীর্তন করেন। কিন্তু শেষে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধের তেত্রিশ অধ্যায়ের ২২ নং শ্লোকটি অর্থাৎ–

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।

গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥[১৮১]

চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১৮/২

পাঠ করে যখন যমুনাতে গোপীদের সাথে জলকেলির কথা শ্রবণ করেন, তখন তাঁর মধ্যে বৃন্দাবনের রাসলীলার স্মৃতি জাগরিত হলে তিনি উন্মাদের মতো হয়ে যান। সেই সময়ে আচমকা তিনি সমুদ্র দেখতে পেয়ে তাকে যমুনা জ্ঞান করেন। সমুদ্রের তরঙ্গের উপরে চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় তরঙ্গসমূহ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সেই অপূর্ব সৌন্দর্য অবলোকন করে যমুনা মনে করে জলে ঝাঁপ দিলেন। দিব্যোন্মাদের ফলে তাঁর বাহ্য চেতনা লুপ্ত হলো। এদিকে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে না পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেন। এভাবে রাত্রি শেষে স্বরূপ দামোদর এক জালিয়াকে দেখতে পেলেন। জালিয়া প্রেমাবেশে কম্পিত দেহে 'হরি' 'হরি' বলছে। স্বরূপ তাকে জিজ্ঞাসা করেন কাউকে তিনি দেখছেন কিনা ? তখন জালিয়া বলে–

'বড় মৎস্য' বলি আমি উঠাইল যতনে।

মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে ॥

জাল খসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হৈল।

স্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥[১৮২]

চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১৮/৪৫-৪৬

তাই ভূত তাড়াবার জন্য আমি ওঝার কাছে যাচ্ছি। কিন্তু স্বরূপ দামোদর প্রকৃত সত্যটা জানতে পেরে আশ্বস্ত হয়ে বলেন–তোমার কোন ভয় নেই। আমি বড় ওঝা, তোমার ভূত তাড়িয়ে দিচ্ছি। তোমার জালে যে ধরা পড়েছে তিনি চৈতন্যদেব। তখন জেলে বলে তাঁর বিশাল ও বিকৃত দেহ, তিনি চৈতন্যদেব নন। তখন স্বরূপ বলেন– ইহা দিব্যোন্মাদে উদ্‌ঘূর্ণার লক্ষণ। এই সময়ে তাঁর কোনো চেতনা থাকেনা। তাঁর প্রেমাবেশ হলে তাঁর তিন দশার প্রাপ্তি ঘটে। তখন সবাই মিলে পূর্বের মত চৈতন্যের বাহ্য চেতনা ফিরিয়ে আনেন এবং গম্ভীরাতে নিয়ে আসেন। যথা–

কথোক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ প্রবেশিলা।

হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহিঁ উঠিলা ॥

উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজস্থানে।
অর্দ্ধবাহ্যে ইতি-উতি করে দরশনে ॥
তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল–।
অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্য আর ॥[১৮৩]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১৮/৭২-৭৪

জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে :

চৈতন্যদেব রাতদিন কৃষ্ণ প্রেমরসামৃতসিন্ধুতে মগ্ন থাকেন। বৈশাখ মাসের এক পৌর্ণমাসী দিনে তিনি রাত্রিতে জগন্নাথবল্লভ নামক উদ্যানে নিজসঙ্গীসহ ভ্রমণ করেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি বৃন্দাবন মনে করে 'ললিত-লবঙ্গলতা' প্রভৃতি পদ গাইতে থাকেন। এভাবে আচমকা তিনি অশোক তরুতলে শ্যামসুন্দর বনমালী বৃন্দাবনচন্দ্রকে দেখতে পেয়ে দ্রুত ধাবমান হলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই কৃষ্ণ দর্শন দান করে অন্তর্হিত হলে তিনি তাঁকে পেয়েও হারালেন এই অন্তর্জ্বালায় ভূমিতে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। সঙ্গীরা নানা উপায়ে তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনেন। যথা–

কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা ॥
আগে পাইলা কৃষ্ণ, তারে পুন হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ॥[১৮৪]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/১৯/৮১-৮২

স্বরচিত শিক্ষাষ্টক আবৃত্তি :

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলে এসে বাস করেন। সন্ন্যাসকাল মোট চব্বিশ বৎসর। তার মধ্যে ছয় বৎসর তিনি বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করেন। পরবর্তী ছয় বৎসর তিনি ভক্তসঙ্গে কীর্তন সহ নানা ভাগবতীয় আলোচনা ও ভক্তদের শিক্ষা প্রদানে সময় অতিবাহিত করেন। তবে শেষ বার বৎসর তিনি গম্ভীরায় একান্ত আপনজন সঙ্গীদের সাথে রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণ বিরহে দিবানিশি কাটান। তবে এই সময়ে রামানন্দ রায় তাঁকে জয়দেব রচিত *গীতগোবিন্দ*, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের রচিত *কৃষ্ণকর্ণামৃত*, *শ্রীমদ্ভাগবত*, *জগন্নাথবল্লভনাটক* থেকে শ্লোক পাঠ এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ আবৃত্তি করে শুনিয়ে তাঁর কৃষ্ণ বিচ্ছেদ জনিত অসহনীয় যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করেন। সেই সাথে স্বরূপ দামোদর তাঁর ভাবানুসারে বিভিন্ন রাগে গান গেয়ে বিরহের জ্বালা অপনোদনের সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। এভাবে মাধুর্যরস আস্বাদনের নিমিত্তে রাতদিন তিনি অতিবাহিত করেন। সবশেষে তিনি নিজের রচিত (আটটি শ্লোক) শিক্ষাষ্টক থেকে শ্লোক পাঠ করে সেই শ্লোকের রস আস্বাদন করে সেই ভাবে ভাবিত হয়ে থাকেন। যথা–

এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী-দিবস-কৃষ্ণবিরহবিহ্বলে ॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজনার সনে।
রাত্রি-দিনে রসগীত শ্লোক-আস্বাদনে ॥
নানা ভাবে উঠে প্রভুর– হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্যোদ্বেগ আর্ত্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ ॥
সেই-সেই ভাবে নিজ শ্লোক পঢ়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা ॥ [১৮৫]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/২০/২-৫

অদ্বৈতাচার্যের তর্জা পেয়ে চৈতন্যদেবের বিরহানল দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়ায় রাত দিন তিনি গম্ভীরায় ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকেন। যখনই তিনি শিক্ষাষ্টকের যে শ্লোক পাঠ করেন তখনই সেই শ্লোকের সেই ভাব সেই রস আস্বাদন করে সেই ভাবে ভাবাবিষ্ট হয়ে তিনি প্রলাপ করেন। লোক শিক্ষার্থে তাঁর এই মহতী রচনা, যা তিনি নিজে আচরণ করে দেখিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি অন্তরঙ্গ পার্ষদ রামানন্দ রায় ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে দ্বাদশ বৎসর দিবা নিশি কৃষ্ণরসসুধা আস্বাদন করেন। যথা–

যেই যেই শ্লোক জয়দেবে ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে ॥
সেই-সেই-ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই-সেই-ভাবাবেশে করে আস্বাদন ॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে ॥[১৮৬]
চৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য/২০/৫৮-৬০

চৈতন্যদেবের নামপ্রেম মাধুর্য :

শ্রীচৈতন্যদেব সর্বদা 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করতেন এবং জপ করতেন। তিনি হচ্ছেন নামপ্রেমের রসাশ্রিত বিগ্রহ। তাঁর হৃদয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে উন্নত-উজ্জ্বল রসমাধুর্যের আস্বাদন। প্রকৃতপক্ষে মহাপ্রভুর অন্তরে ব্রজের রাইকিশোর গভীরভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ। প্রেমের ব্যাকুলতায় ভাবের আবেশে আহ্বান করছেন উভয়-উভয়কে। রসের সর্বোচ্চ ভূমি হচ্ছে মাদন। 'সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী' হচ্ছে মাদনাখ্য মহাভাব। রাধার মধ্যে এই মহাভাবের প্রকাশ ঘটে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়। 'হরে কৃষ্ণ-হরে রাম' এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার মহাভাব এবং রমণের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় অপ্রাকৃত ভাব সাগরের মতো গৌরহরির হৃদয়ে। তাই এই নামপ্রেমের মাধ্যমে গৌর সর্বদা ব্রজেন্দ্র নন্দন ও গোপীমধ্যমণি রাধাকে আহ্বান করছেন। চৈতন্যের হৃদয়ে সর্বদা নামপ্রেমের আস্বাদন চলছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। শ্রীবদনে উদ্গীরণ হচ্ছে আর হৃদয়ে আস্বাদন– এ অতীব মনোহর। এই নামপ্রেম অকাতারে তিনি নিত্যানন্দকে প্রদান করেন। নিতাই নামপ্রেম আস্বাদনে বিভোর হয়ে

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলে হুঙ্কার করেন। প্রেমের টানে উভয় উভয়ের অন্তরের ভাব জানেন। তাই নিতাই প্রেমের টানে চৈতন্যের আদেশ লঙ্ঘন করে নীলাচলে চৈতন্য দর্শনে এসেছেন। তবে প্রেমের আজ্ঞা লঙ্ঘন হলে হৃদয়ে বিবিধ আনন্দের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী *গৌর-কথা* গ্রন্থে *চৈতন্যচরিতামৃতের* উদ্ধৃতি দিয়েছেন–

"আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যতেক সন্তোষ।
প্রেমে আজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় কোটি সুখ পোষ।"[১৮৭]
গৌর-কথা, ৩য় খণ্ড,

চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম :

ড. দীনেশচন্দ্র সেন *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*-এর ১ম খণ্ডে চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন– স্বয়ং রাধারাণী যেরূপ কৃষ্ণ বিরহে বিরহিণী হয়েছিলেন, তদ্‌রূপ চৈতন্যদেবও কৃষ্ণ বিরহে দিবানিশি অতিবাহিত করতেন। রাধা যেরূপ বৃন্দাবনে তমাল বৃক্ষ দর্শন করে কৃষ্ণ মনে করে আলিঙ্গন করতেন, চৈতন্যদেবও চটক পর্বত দেখে গোবর্ধন পর্বত, বন দেখে বৃন্দাবন, নদী দেখে যমুনা মনে করে কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদ হতেন। চৈতন্যদেব কৃষ্ণ নাম স্মরণ করা মাত্র বক্তার পাদপদ্ম স্পর্শ করে তাকে আলিঙ্গন করতেন। এ সম্বন্ধে ড. দীনেশচন্দ্র সেন উক্ত গ্রন্থে *গোবিন্দদাসের কড়চার* উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যথা–

"কৃষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হৃদয়।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয় ॥
যদি কেহ রাধা বলি উচ্চ শব্দ করে।
অমনি অশ্রুর ধারা ঝর ঝর করে ॥
প্রাণকৃষ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে।
ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে ॥" [১৮৮]

গোপীপ্রেম আস্বাদন ও গম্ভীরা লীলা :

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটলীলার মধ্যে শেষ বার বৎসরকে বলা হয় গম্ভীরা লীলা। ব্রজের রাগানুগা ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা স্বরূপ বিগ্রহরূপে তিনি ছিলেন, যা ব্রহ্মার পক্ষেও দুর্লভ। বৈষ্ণব দর্শন ও ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠ রস হচ্ছে মাধুর্য রস। বৃন্দাবনের গোপীরা ছিলেন এই রসের অধিকারিণী। সমাধিশুদ্ধ অন্তরে রাগানুগা ভক্তির স্ফুরণ হয়ে থাকে। ব্যাসতনয় চিরকুমার পরমহংসাগ্রণী শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষিদের সভায় যে লীলারস ব্যাখ্যা করেছেন, তা চৈতন্যদেব প্রকট লীলার অন্ত্যে আস্বাদন করেছেন। অতি গুহ্য গোপী-প্রেমাস্বাদন লীলার সবাই অধিকারী নয়। তাই তিনি উচ্চস্তরের স্বল্প ভক্তসঙ্গে গোপীপ্রেম আস্বাদন করেছেন। তিনি অধিকাংশ সময় কুঠিয়ার

ভিতরে দ্বার বন্ধ করে ভাবগ্রাহী ভক্তদ্বয় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদর সঙ্গে দিব্যলীলা রস আস্বাদন করতেন, যার কারণে সাধারণ শ্রেণির ভক্তরা চৈতন্যদেবের গোপীপ্রেম অনুভবের বিষয়ে অবগত ছিল না। সবার অলক্ষে অন্তরালে নিভৃত স্থানে কুঠিয়ার মধ্যে যে সকল অপ্রাকৃত লীলা প্রকট করেছিলেন চৈতন্যদেব, তাকেই গম্ভীরা-লীলা নামে বর্ণনা করা হয়েছে। চৈতন্যদেবের এই ভাবমাধুর্য লীলা দুই আত্মসম ভক্ত সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্বামী সারদেশানন্দ *শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব* গ্রন্থে *চৈতন্যচরিতামৃত*- এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন–

"উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত্য ॥
রাত্রি হৈলে স্বরূপ রামানন্দে লইয়া।
আপন মনের ভাব কহে উঘারিয়া ॥" [১৮৯]

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব-১১ অধ্যায়

চৈতন্যদেবের প্রলাপ :

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ *শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত*-এ চৈতন্যদেবের গম্ভীরা-লীলার সময়ে তাঁর দিব্য-উন্মাদনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন–তাঁর ভাব বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কেননা অন্তরঙ্গ ভক্তসঙ্গে তিনি নানাভাবে ভাবিত থাকতেন। ভাবের আতিশয্যে দিব্য-উন্মাদনার ফলে তিনি বলতেন–"আমার প্রাণকৃষ্ণ, আমার ব্রজের কানাই, আমার নয়নানন্দ, আমার হৃদয় চাঁদ কোথায়?" কিন্তু দর্শন না পেয়ে ক্রোধে তিনি বলতেন– কৃষ্ণ তুমি কপট, নিষ্ঠুর, তুমি পুরুষ নও, তুমি বহু বল্লভ। তুমি প্রীতির বিরহ জ্বালা কি বুঝবে? এর পরক্ষণেই তিনি বলতেন– "সখি! কানু- প্রেমের সীমা নেই, তা অতল স্পর্শ।" পুনরায় বলতেন– "প্রীতির আনন্দ যেমন সুধাস্বরূপ, বিরহ-জ্বালা তেমনি কালকূট বিষের মত। কৃষ্ণবিরহে অহর্নিশি যন্ত্রণা পাই। তবুও সেই শঠ আমার প্রাণনাথ।" [১৯০] এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* চৈতন্যদেবের প্রীতির বিষম জ্বালার বর্ণনা পাওয়া যায়–

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্ঠু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥[১৯১]

চৈ.চ-অন্ত্য/২০/১০

অপ্রকটঃ শ্রীচৈতন্যদেব আটচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন লীলাবিলাস করেছেন। আটচল্লিশ বছর বয়সে অর্থাৎ– ১৫৩৩ খ্রি. আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে রবিবারে তিনি দিব্যলীলা সম্পন্ন করে অপ্রকট হন।[১৯২]

তথ্যনির্দেশ:

১. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ*, প্রকাশক সন্দিপন নাথ, সাধনা প্রকাশনী, কলকাতা, ৩য় প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ.৬৮০
২. ড. বিমান বিহারী মজুমদার, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২য় প্রকাশ, এপ্রিল, ২০১৬, পৃ.২১

৩. শ্রীল মুরারিগুপ্তের *শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্*, শ্রীল হরিদাস দাসকৃত, প্রকাশক- শ্রী দেবাশীষ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রকাশকাল ২০০৯, পৃ.২৪
৪. ড. সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, কার্তিক ১৪২৪, পৃ.৮১
৫. কবিকর্ণপূর, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্*, শ্রী মণীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত, প্রকাশক-সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৭, পৃ.৮-৯
৬. ঐ, পৃ.৮
৭. ড. সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ.১৩
৮. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা*, প্রকাশক- ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর নদীয়া, পৃ. ভূমিকা-ঠ
৯. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *শ্রীচৈত্যন্যচরিতামৃতের ভূমিকা*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪২২, পৃ.৩০-৩২
১০. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, *আদিলীলা*, প্রকাশক-সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪২২, পৃ.৬৫২
১১. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ.৬৫১
১২. শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *গৌরগণোদ্দেশদীপিকা*, প্রকাশক-স্বদেশ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ২০০৭, পৃ.০৯
১৩. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ*, ঐ, পৃ.৬৮০
১৪. ত্রিদন্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, মায়াপুর, নদীয়া, ২য় সংস্করণ, ১৮ জুলাই, ২০১৫; পৃ.২৫১-২৫২
১৫. শ্রীল মুরারিগুপ্তের *শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্*, ঐ, পৃ.২৫
১৬. শ্রী অশোক কুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত *গৌরগণোদ্দেশদীপিকা*, ঐ, পৃ.০৬
১৭. শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর গোবিন্দদেব গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, চৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ, ১ম সংস্করণ- ৮/৩/১৯৯৩, পৃ.৬৭-৬৮
১৮. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ*, ঐ, পৃ.৬৮০
১৯. ত্রিদন্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নদীয়া, ২য় সংস্করণ, ২৩-৩-২০১৬, পৃ.৩৬
২০. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ*, ঐ, পৃ.৬৮১
২১. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *চৈতন্যচরিতামৃত*, প্রকাশক, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃ.৮১৬
২২. ত্রিদন্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, ঐ, পৃ.৩৯
২৩. ঐ, পৃ.৪৩
২৪. শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর গোবিন্দদেব গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, ঐ, পৃ.৬৯
২৫. ত্রিদন্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, ঐ, পৃ.৪৫
২৬. শ্রীমদ্ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ সম্পাদিত *চৈতন্যভাগবত*, প্রকাশক, সংকীর্তন বিভাগ, ইস্কন, মায়াপুর নদীয়া, ১ম সংস্করণ, ২০০৭ পৃ.৬২
২৭. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *চৈতন্যচরিতামৃত*, প্রকাশক, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, দ্বদশ সংস্করণ, পৃ.৮৪৪
২৮. ত্রিদন্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, ঐ, পৃ.৪৬
২৯. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ*, ঐ, পৃ.৬৮১
৩০. শ্রীকালীকিশোর বিদ্যারত্ন সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল*, প্রকাশক- বেণীমাধবশীল'স লাইব্রেরী, কলকাতা, জুলাই, ২০১৪, পৃ.৫৫
৩১. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ*, ঐ, পৃ.৬৮১
৩২. ত্রিদন্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, ঐ, পৃ. ৫৪
৩২ ক) ঐ, পৃ.৫৬
৩৩. ড. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রকাশক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২য় প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৯১/বি, ১ম খণ্ড, পৃ.২৯৯,
৩৪. শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল*, গৌড়ীর মঠ, বাগবাজার, কলকাতা, ২৮/১২/১৯৯১ পৃ.৬৩
৩৫. ত্রিদন্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, ঐ, পৃ. ৬১
৩৬. ঐ, পৃ. ৭০
৩৭. ড. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০
৩৮. ঐ, পৃ.২৯৬
৩৯. ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, ঐ, পৃ. ৭১

৪০. ঐ, পৃ.৭২-৭৩
৪১. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ*, পৃ. ৬৮৩
৪২. শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর গোবিন্দদেব গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ.৭৩-৭৪
৪৩. ত্রিদন্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, পৃ.৯২-৯৩
৪৪. মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ গ্রন্থিত *শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত*, বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরি, কলকাতা, এপ্রিল-২০১৮, অখণ্ড সংস্করণ, পৃ.৭৫
৪৫. ত্রিদন্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, পৃ.৯৯
৪৬. শ্রীমদ্ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ সম্পাদিত *চৈতন্যভাগবত*, ঐ, পৃ. ১২৪
৪৭. ড.হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, প্রকাশক- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন, ২০১১/এ, পৃ. ১২৭
৪৮. ত্রিদন্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, পৃ. ১০০-১০৬
৪৯. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ*, পৃ. ৬৯০
৫০. ত্রিদন্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, পৃ. ১২১
৫১. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ*, পৃ. ৬৯১
৫২. ত্রিদন্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, পৃ. ১২২
৫৩. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা*, প্রকাশক-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ- জুন, ২০১১, পৃ. ১০
৫৪. ঐ, পৃ.৩২
৫৫. ত্রিদন্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, পৃ. ১২৭
৫৬. ঐ, পৃ. ১৫৬
৫৭. শ্রীল মুরারিগুপ্তের *শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্*, শ্রীল হরিদাস দাসকৃত, পৃ. ৮২-৮৩
৫৮. রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি. কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ,আগস্ট ২০১৭, পৃ. ৩৮
৫৯. ড. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, পৃ. ২৯৬
৬০. ঐ, পৃ-৩০২
৬১. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পৃ. ১২৮
৬২. পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত *বৃহন্নারদীয়পুরাণ*, নবভারত পাবলিসার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৯৬, পৃ.২৪৮
৬৩. শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর গোবিন্দদেব গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ৭৬
৬৪. ঐ, পৃ. ৭৯
৬৫. শ্রীল মুরারিগুপ্তের *শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্*, শ্রীল হরিদাস দাসকৃত, পৃ. ১৫৬
৬৬. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পৃ-১৩২
৬৭. রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, ঐ, পৃ. ১৫৫
৬৭ ক). ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, ঐ ,পৃ. ২৭২
৬৮. ড. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪
৬৯. ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, পৃ. ২১৫-২১৭
৭০. শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল*, গৌড়ীর মঠ, বাগবাজার, কলকাতা, ২৮/১২/১৯৯১, পৃ. ৯৪
৭১. ঐ, পৃ. ৯৬
৭২. ঐ, পৃ. ১০২
৭৩. ত্রিদন্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, পৃ. ১৬২
৭৪. ঐ, পৃ. ২৮৬
৭৫. ঐ, পৃ. ১৮৭
৭৬. শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর গোবিন্দদেব গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ৮১
৭৭. ঐ, পৃ. ৭৯
৭৮. ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, পৃ. ২৭৭
৭৯. ঐ, পৃ.২৭৯
৮০. শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর গোবিন্দদেব গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ৮০-৮১
৮১. ঐ, পৃ. ৮১
৮২. ঐ, পৃ. ৮২
৮৩. ড. বিমান বিহারী মজুমদার, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*, পৃ.২৫-২৬
৮৪. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ*, পৃ. ৭৩৭
৮৫. ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, পৃ. ২৯৪
৮৬. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, আদি-লীলা, পৃ. ৭৭২
৮৭. ত্রিদন্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, পৃ. ২৯৭

৮৮. ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্‌ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নদীয়া, ২য় সংস্করণ, ২৩-৩-২০১৬, পৃ. ৩০০
৮৯. ঐ, পৃ. ৩০৪
৯০. শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর গোবিন্দদেব গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, চৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ, ১ম সংস্করণ- ৮/৩/১৯৯৩, পৃ. ৩০৭
৯১. ঐ, পৃ. ১০৭
৯২. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, প্রকাশক-সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪২২, মধ্যলীলা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬-১১৭
৯৩. ঐ, পৃ. ১৯৬
৯৪. ঐ, পৃ. ১৯৯
৯৫. ঐ, পৃ. ২২১
৯৬. ঐ, পৃ. ২২৩
৯৭. ঐ, পৃ. ২২৬
৯৮. ঐ, পৃ. ২২৯
৯৯. ঐ, পৃ. ২৩১
১০০. ঐ, পৃ. ৩৯১
১০১. ড. সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ১৭৭
১০২. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্য-১খণ্ড, পৃ. ৪০০
১০৩. ঐ, পৃ. ৪০৪
১০৪. ঐ, পৃ. ৪০৫
১০৫. ঐ, পৃ. ৪০৬
১০৬. ঐ, পৃ. ৪০৭
১০৭. ঐ, পৃ. ৪২০
১০৮. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, *চৈতন্যচরিতামৃত*, *প্রকাশক-দেব সাহিত্য* কুটীর, প্রা.লি. কলকাতা, ১৭ই মার্চ, ২০১৭, পৃ. ২৩৬
১০৯. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্য-১খণ্ড. পৃ. ৪২১
১১০. ঐ, পৃ. ৪২৩
১১১. ঐ, পৃ. ৪২৪-৪২৫
১১২. ঐ, পৃ. ৪৩৯-৪৪০
১১৩. ঐ, পৃ. ৪৪১
১১৪. ঐ, পৃ. ৪৪৩
১১৫. ঐ, পৃ. ৫২৭
১১৫ ক). ঐ, পৃ. ৫১৩-৫১৪
১১৬. ঐ, পৃ. ৫৩১
১১৭. শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর গোবিন্দদেব গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ১৮১
১১৮. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্য-১খণ্ড. পৃ. ৫৭২
১১৯. ঐ, পৃ. ৬১৩
১২০. শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্য-২য় খণ্ড, পৃ. ৫১
১২১. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্য-১খণ্ড. পৃ. ৬৫৫
১২২. ঐ, পৃ. ৬৫৭
১২৩. ঐ, পৃ. ৬৬৩
১২৪. ঐ, পৃ. ৬৬৫
১২৫. ঐ, পৃ. ৬৬৯
১২৬. ঐ, পৃ. ৬৭০
১২৭. ঐ, পৃ. ৩১-৩৫
১২৮. ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রমোদ পুরী সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতনচরিতামৃত*, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, মায়াপুর,

নদীয়া, ২য় সংস্করণ, ১৮ জুলাই, ২০১৫; পৃ. ৩২৩
১২৯. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্য-১খণ্ড. পৃ. ৪০
১২৯ ক). ঐ, পৃ. ৪৯
১৩০. ঐ, পৃ. ৬৭২-৬৭৩
১৩১. ঐ, পৃ. ৬৭৪
১৩২. ঐ, পৃ. ৬৮৫
১৩৩. ঐ, পৃ. ৬৮৯
১৩৪. ঐ, পৃ. ৭০৪
১৩৫. ঐ, পৃ. ৭১২-৭১৩
১৩৬. ঐ, মধ্য-২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৬
১৩৭. ঐ, পৃ. ৭১৮-৭২৮
১৩৮. শ্রীল মুরারি গুপ্তের *শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্*, শ্রীল হরিদাস দাসকৃত, পৃ. ২৬৬
১৩৯. শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম*, পৃ. ৩৬৯
১৪০. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্য-২য় খণ্ড. পৃ. ৭৪৭
১৪১. ঐ, পৃ. ৭১৮-৭৫০
১৪২. ঐ, পৃ. ৭৬৯
১৪৩. ঐ, পৃ. ৮৩০-৮৩১
১৪৪. ঐ, পৃ. ৮৩১
১৪৫. ঐ, পৃ. ১৩৪৫-১৩৪৬
১৪৬. ঐ, পৃ. ১৩৭২-১৩৭৪
১৪৭. ঐ, পৃ. ১৩৬৫-১৩৬৭
১৪৮. শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্য ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০৪-৯০৫
১৪৯. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্য, পৃ. ৮
১৫০. ঐ, পৃ. ১৩
১৫১. ঐ, পৃ. ২৯
১৫২. ঐ, পৃ. ৬৭
১৫৩. ঐ, পৃ. ৮৯
১৫৪. ঐ, পৃ. ৯৫
১৫৫. ঐ, পৃ. ২৯২
১৫৬. ড. সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ৪২৮
১৫৭. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্য, পৃ. ৩১৮
১৫৮. শ্রীমদ্ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ সম্পাদিত *চৈতন্যভাগবত*, পৃ. ৫৪৩
১৫৯. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্য, পৃ. ৩৯৭
১৬০. ঐ, পৃ. ৩৯৮
১৬১. ঐ, পৃ. ৩৯৮
১৬২. ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, পৃ. ১১২
১৬৩. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্য, পৃ. ৪১০
১৬৪. শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্য, পৃ. ৫৪৫
১৬৫. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্য, পৃ. ৪২৮
১৬৬. ঐ, পৃ. ৪২৭-৪২৯
১৬৭. ঐ, পৃ. ৪৩৬
১৬৮. ঐ, পৃ. ৪৪৪
১৬৯. ঐ, পৃ. ৪৪৫
১৭০. ঐ, পৃ. ৪২১
১৭১. ঐ, পৃ. ৫৪১
১৭২. ঐ, পৃ. ৫৪০-৫৪১

১৭৩. ঐ, পৃ. ৬৫১
১৭৪. ঐ, পৃ. ৬৫২
১৭৫. ঐ, পৃ. ৬৫৫
১৭৬. ঐ, পৃ. ৪৭২
১৭৭. ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রমোদ পুরী সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ১০১৯
১৭৮. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্য, পৃ. ৫০০-৫০১
১৭৯. ঐ, পৃ. ৫১১
১৮০. ঐ, পৃ. ৫৬৯
১৮১. ঐ, পৃ. ৬১৪
১৮২. ঐ, পৃ. ৬১৮
১৮৩. ঐ, পৃ. ৬২১
১৮৪. ঐ, পৃ. ৬৭৯
১৮৫. ঐ, পৃ. ৬৯৫
১৮৬. ঐ, পৃ. ৭৫৯
১৮৭. ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, *গৌর-কথা*, তৃতীয় খণ্ড, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন, কলকাতা- রাজ সংস্করণ, ২৬শে জানুয়ারি, ২০১৩, পৃ. ২১৯-২২২
১৮৮. ড. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, পৃ. ২৯৪
১৮৯. স্বামী সারদেশানন্দ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-১৩ম পুনর্মুদ্রণ, জুলাই, ২০১৬, পৃ. ৩১২-৩১৪
১৯০. মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ গ্রন্থিত *শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত*, পৃ. ১০২৫-১০২৬
১৯১. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্যখণ্ড, পৃ. ৭৪৪-৭৪৬
১৯২. ড. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৯

তৃতীয় অধ্যায়
শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনদর্শন

চৈতন্যদেবের দর্শন অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদঃ

চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত দর্শনের নাম হচ্ছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন। কিন্তু তাত্ত্বিক দিক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ বলা হয়ে থাকে। এরূপ ভেদাভেদের কারণ হচ্ছে– ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যেমন ভেদ রয়েছে তেমনি অভেদও রয়েছে। যেমন– অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ। অগ্নি থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি তেমনি ব্রহ্ম থেকে জীবের উদ্ভব হয়েছে। জীব ব্রহ্মের অংশ, তাই অভেদ। আবার অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ আয়তনের ও শক্তির দিক থেকে এক নয়। তেমনি ব্রহ্মের শক্তি এবং জীবের শক্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তাই ভেদ হয়েছে। চৈতন্যদেবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ দর্শন মতে ব্রহ্মের ত্রিবিধ শক্তি রয়েছে– অন্তরঙ্গা শক্তি, মায়াশক্তি ও জীব শক্তি। জীব শক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা হয়ে থাকে। ব্রহ্মের জীব শক্তি থেকে জীবের সৃষ্টি আর মায়া শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি থেকে জড়জগতের সৃষ্টি হয়েছে। আর চিৎশক্তি দ্বারা তিনি স্বরূপে লীলাবিলাস করেন। তাই ব্রহ্ম স্বয়ং তাঁর ত্রিগুণাত্মিকা স্বরূপ শক্তিতে অবস্থান করেন । তাই দেখা যায় যে, একই সঙ্গে দুই বিপরীতমুখী ধর্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ একত্র রয়েছে, যার স্বরূপটি যুক্তি ও তর্কের এবং চিন্তার বোধগম্য নয় বিধায় একে অচিন্তনীয় বলা হয়েছে। আর এ কারণে চৈতন্যদেবের এই দর্শনের নাম দেয়া হয়েছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ। এই দর্শনে মুক্তি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য। কেননা এটি ভক্তির পথে বাধাস্বরূপ। পরম ব্রহ্মকে লাভ করাই হচ্ছে এই দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। তাই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর প্রাপ্তির একমাত্র পথ হচ্ছে ভক্তি। ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রেমলাভ হয় এবং তাঁর দর্শন পাওয়া যায়।[১]

চৈতন্যদেবের দর্শন তত্ত্বের কাঠামোঃ

চৈতন্যদেব গৌড়ীর দর্শনের প্রর্বতক, কিন্তু তিনি তাঁর দর্শনকে লিখিতভাবে রূপদান করার জন্য কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। কেবল শিক্ষাষ্টক তাঁর নিজের রচনা। সেখানে সারগর্ভ হিসেবে তাঁর দর্শনের গভীর তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। চৈতন্যদেব মূলতঃ 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখাও' এই ব্যবহারিক দর্শনের আদর্শ গুরু ছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁর দর্শন সম্পর্কে রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই দুই গোস্বামী চৈতন্যদেবের শিক্ষা ও দর্শনকে শাস্ত্রীয়রূপে প্রকাশ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সনাতন গোস্বামীর রচিত *বৃহৎ ভাগবত* এ দর্শনের উপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রূপ গোস্বামীর রচিত *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ও *উজ্জ্বলনীলমণি* দুটি গ্রন্থ বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তিভূমি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। গোপাল ভট্টের রচিত *হরিভক্তিবিলাস* চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত দর্শন ও শিক্ষার উপর অমূল্য গ্রন্থ। জীব গোস্বামী চৈতন্যদেবের দর্শন ও শিক্ষার উপর *ষটসন্দর্ভ* রচনা করেছেন এবং এর উপর তিনি *সর্বসম্মাদিনী* টীকাও রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে

বলদেব বিদ্যাভূষণ এই দর্শনকে ভক্তিবাদী ব্যাখ্যায় বেদান্ত দর্শনের উপর *গোবিন্দভাষ্য* রচনা করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যদেবের দর্শন ও শিক্ষার সারাৎসার নিয়ে *চৈতন্যচরিতামৃত* রচনা করেছেন।[২]

চৈতন্যদেবের এই ভক্তিবাদ দর্শনে দ্বৈততা রয়েছে। দ্বৈততা ছাড়া ভক্তিবাদের অস্তিত্ব থাকেনা। কারণ ভক্তি ভাবনায় ও প্রকাশে ভক্ত ও ভগবানের প্রয়োজন রয়েছে। এই পৃথক স্বতন্ত্রতা না থাকলে প্রেমের বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় না। ভক্তিতত্ত্বে একজন উপাস্য, অন্যজন উপাসক। একজন ভক্তি গ্রহণকারী, অন্যজন নিবেদনকারী। দু'জনার দুই ক্রিয়া। ভক্ত ভগবানকে সর্বদা প্রভু হিসেবে দর্শন করে আর নিজেকে দাস হিসেবে মনে করে। ভক্তের প্রেমময় আরাধনায় ভগবান প্রসন্ন হন। চৈতন্যদেবের এই দর্শন মতে ব্রহ্ম সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্য হলেও ব্রহ্ম ও জীব স্বরূপত পৃথক সত্তা। চৈতন্যদেবের মতে– বেদান্তের সূত্র গ্রন্থ হচ্ছে ব্রহ্মসূত্র। আর এই ব্রহ্মসূত্রের যথাযথ ভাষ্যগ্রন্থ হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত*। *ভাগবতে* বলা হয়েছে– 'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে'। অর্থাৎ, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা আবার তিনিই ভগবান। *ভাগবতে* কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলা হয়েছে– 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। *ব্রহ্মসংহিতার* পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে–

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দো বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

অর্থাৎ– কৃষ্ণই হচ্ছেন একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান। তাই তাঁর রূপ হচ্ছে সচ্চিদানন্দময়। তিনি অনাদির আদি গোবিন্দ। তিনি সর্বকারণের কারণ। *নারদ পঞ্চরাত্রে* বর্ণনা করা হয়েছে–

শক্তয়ঃ সর্বভাবানাম্ অচিন্ত্যা অপৃথক্স্থিতাঃ।
স্বরূপেনৈব দৃশ্যন্তে দৃশ্যন্তে কার্যতস্তু তাঃ ॥

অর্থাৎ, এই যে কার্যের মধ্য দিয়ে শক্তির প্রকাশ ঘটেছে, তা সগুণ ব্রহ্মেরই। আর এই সগুণ ব্রহ্মই কৃষ্ণ। ব্রহ্ম স্বরূপ শক্তির বলে নিজের মধ্যে নিজেই রয়েছেন। তিনি জ্ঞানময় ও আনন্দময়। পরমব্রহ্মের যে তটস্থাশক্তি বা জীবশক্তি, তা থেকে জীবাত্মার প্রকাশ ঘটে থাকে। অর্থাৎ, ব্রহ্ম থেকেই জীবের প্রকাশ। ব্রহ্মের মায়া শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি থেকে মায়াময় পরিদৃশ্যমান জড়জগতের সৃষ্টি। জীব মায়ার দ্বারা মুগ্ধ হয়, তাই জীব মায়াবদ্ধ বা মায়াবশ আর ব্রহ্মের অধীন মায়াশক্তি তাই ব্রহ্ম মায়াধীশ।

চৈতন্যদেবের মতে ব্রহ্মের মায়াশক্তির পরিণাম জড় জগৎ হলেও ব্রহ্ম পরিণামী হন না। বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেও ব্রহ্মের শক্তি অপরিণামীই থেকে যায়। এই অচিন্তনীয় বিষয় বুঝানোর জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃতে* একটি উদাহরণ দিয়েছেন–

মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥

অর্থাৎ, পরশমণির স্পর্শে লোহা সোনায় পরিণত হলেও পরশমণি কিন্তু অবিকৃতই থাকে। এইরূপভাবে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করলেও তাঁর শক্তির কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। তিনি অবিকৃত থাকেন। তাই ব্রহ্ম অপরিণামীই থাকেন। অতএব, চৈতন্যদেবের মতে ব্রহ্মের শক্তির পরিণাম, এ কারণেই এই মতবাদের নামান্তর হচ্ছে শক্তিপরিণামবাদ।[৩] চৈতন্যদেবের মতে ব্রহ্মের যে অন্তরঙ্গাশক্তি তা তিনটি বৃত্তিতে বিভক্ত, যথা– সৎ, চিৎ ও আনন্দ। এ কারণে কৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বলা হয়ে থাকে। কারণ এটিই তাঁর স্বরূপ। এই তিনটি বৃত্তিকে আবার তিনটি পৃথক পৃথক শক্তি হিসেবে *বিষ্ণুপুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে। যথা–

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে।

অর্থাৎ, সৎ এর সন্ধিনী, চিৎ এর সংবিৎ এবং আনন্দের হ্লাদিনী। ব্রহ্মের বা কৃষ্ণের এই হ্লাদিনী শক্তিই রাধা। হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ দিয়ে ব্রহ্ম নিত্য আনন্দ আস্বাদন করে থাকেন।[৪] আনন্দ আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণ তাঁর হ্লাদিনী শক্তি দিয়ে রাধাকে সৃষ্টি করেন। কেননা একত্বে তো আনন্দ লাভ হয় না, তাই দ্বৈতের প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করেছেন– রাধা হচ্ছেন পূর্ণ শক্তি এবং কৃষ্ণ হচ্ছেন শক্তিমান। তত্ত্বের দিক থেকে রাধা-কৃষ্ণের মধ্যে কোন ভেদ নেই। কিন্তু লীলারস আস্বাদনের নিমিত্তে একসত্তা দুইরূপ ধারণ করেন। *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাওয়া যায় যে–

রাধা– পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ– পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥[৫]
চৈ. চ. আদি/৪/৯৬, ৯৮

হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তির সারভূতা রাধা সম্পর্কে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেম সার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা , নাম 'মহাভাব'॥
চৈ. চ. আদি/৪/৬৮

রাধা রাণী হচ্ছেন কৃষ্ণ প্রেমের মহাভাব স্বরূপিণী। তিনি কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠা প্রেয়সী। তাই তাঁকে কান্তা শিরোমণি বলা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বলা হয়েছে–

মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥
চৈ. চ. আদি/৪/৬৯

এই হ্লাদিনী শক্তিরূপা রাধা দ্বারা কৃষ্ণ প্রেমাস্বাদন করে থাকেন। এ কারণে রাধা রাণীর প্রেমকে সাধ্য শিরোমণি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাওয়া যায়–

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।

হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥[৬]

চৈ. চ. আদি/৪/৬০

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।

যাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥[৭]

চৈ. চ/ মধ্য/৮/১৪৭-১৪৮

চৈতন্যদেব তাঁর জীবনের শেষ ১২ বছর পুরীতে বাহ্যচেতনাশূন্য হয়ে দিব্যভাবে ও রাধার ভাব অনুকরণ করে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বিভোর ছিলেন। কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার যে প্রেম, চৈতন্যদেব তা শেষ জীবনে আস্বাদন করেছেন। সে কারণে চৈতন্যদেবের মতে কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমভাব সর্বশ্রেষ্ঠ।

চৈতন্যদেবের দর্শনের বৈশিষ্ট্য:

সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিতাপ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করাই মানুষের মূল লক্ষ্য। চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী চারটি ভক্তিবাদী সম্প্রদায় নিম্বার্ক, রামানুজ, মধ্বাচার্য ও বল্লভাচার্যের মতে– ভাগবতে বর্ণিত পাঁচ প্রকার মুক্তিই হচ্ছে জীবের চরম মুক্তির লক্ষ্য। পাঁচ প্রকার মুক্তি হচ্ছে– সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাষ্টি। কিন্তু চৈতন্যদেবের মতে এই পাঁচ প্রকার মুক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের লক্ষ্য নয়। তাঁরা মুক্তি যাচ্ঞা করেন না। কেননা মুক্তি স্বার্থময়। চৈতন্যদেবের মতে জীবের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা। সেটি লাভ করা যাবে শুদ্ধ ভক্তি থেকে। এই শুদ্ধ ভক্তি লাভের জন্য দরকার কৃষ্ণ সম্বন্ধ। তাই এই দর্শনের মতে বেদের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব স্বীকার করে অনুশীলন করা হয়। সম্বন্ধ বলতে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ বুঝায়। কৃষ্ণ হচ্ছে বিষয়, অভিধেয় হচ্ছে ভক্তি আর প্রয়োজন হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম। তাই একমাত্র ভক্তি দ্বারাই সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায়। এটি চৈতন্যদেবের দর্শনের মূল লক্ষ্য। এই দর্শনের চরমস্তরের দৃষ্টান্তে দেখা যায়– কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের বিশুদ্ধ নিষ্কাম প্রেম। এই গোপীদের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠা হচ্ছেন রাধা রাণী। তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণের সর্বাধিক প্রিয়া বা কান্তা শিরোমণি। কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছে চৈতন্যদেবের দর্শনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের উন্নত-উজ্জ্বল রসের সাহিত্যিক রূপ।[৮]

চৈতন্যদেব প্রয়াগে ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, ভাবতত্ত্ব সম্বন্ধে যে দর্শন ও শিক্ষা রূপকে প্রদান করেছিলেন, রূপ তা *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যথা–

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যানাবৃতম্।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ভ. র. সি-পূর্ব/১/১১

সমস্ত অভিলাষ শূন্য হয়ে জ্ঞান ও কর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়ে ভক্তির অনুকূলে কৃষ্ণ উপাসনা করতে হবে, সেটি উত্তম ভক্তি। অর্থাৎ, এই ভক্তি হচ্ছে জ্ঞান ও কর্মের ঊর্ধ্বে। জ্ঞান ও কর্ম হচ্ছে ভক্তির অনুগত।[৯] এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* চৈতন্যদেব ও রামানন্দের সংলাপের মধ্যে পাওয়া যায়–

প্রভু কহে,– এহো উত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে, কান্তভাব– প্রেমসাধ্যসার॥
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব- রসের গুণ– পরে পরে হয়।
এক-দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি-রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥[১০]
চৈ. চ. মধ্য/৮/৭৯, ৮৫-৮৬

চৈতন্যদেবের দর্শনের উপাস্য বিগ্রহ:

চৈতন্যদেবের দর্শন মতে, একমাত্র আরাধ্য হচ্ছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণ, যাঁকে বিভিন্ন ভক্তরা পঞ্চ রসে সাধনা করে দিব্যানন্দ লাভ করেছেন। চৈতন্যদেবের মতে এই কৃষ্ণ গোলোকবিহারী। তাঁর নরলীলার মধ্যে গোপবেশ ও নবকিশোর লীলাই সর্বোত্তম। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥[১১]
চৈ. চ. মধ্য/২১/১০১

চৈতন্যদেবের দর্শন মতে এই উপাস্য কৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান। তবে তাঁর ভক্ত প্রেমময় কৃষ্ণের থেকে প্রেম ভিন্ন কোন ঐশ্বর্য যাচ্ঞা করেন না। শুধু কৃষ্ণপ্রীতিরসে ও অনুরাগে তাঁর সেবা করে আনন্দ পাওয়াই কাম্য। ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের এমন অপূর্ব সম্মিলন চৈতন্যদেবের এই বৈষ্ণব দর্শনের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

চৈতন্যদেবের এই দর্শনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ভক্তির মধ্যে রাগানুগা ভক্তি। এটি বৈধীভক্তির শৃঙ্খলা মুক্ত। রাগাত্মিকা ভক্তির অনুসরণে ভক্তি। কেননা রাগানুগা ভক্তি হচ্ছে ইষ্টের প্রতি পরম আবিষ্টতা। সাধন ভক্তি থেকে সৃষ্টি হয় রতি, রতি থেকে প্রেম, প্রেম থেকে স্নেহ, স্নেহ থেকে মান, মান থেকে প্রণয়, প্রণয় থেকে রাগ, রাগ থেকে অনুরাগ এবং সবশেষে মহাভাবের স্তরে পৌঁছায়। মহাভাব স্বরূপিণী হচ্ছেন শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী রাধা রাণী। আর রাধা রাণী হচ্ছেন রাগাত্মিকা ভক্তির প্রধান। তবে এটি নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম। কিন্তু সাধন সিদ্ধ নয়। তাই এটি অনুকরণীয় নয় অনুসরণীয়। এ কারণে চৈতন্যদেব বলেছেন– রাগাত্মিকা ভক্তির অনুসরণে রাগানুগাভাবে জীব সাধন করতে পারে। এটিকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যে রাগময়ী ভক্তি বা মঞ্জরী সাধনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চৈতন্যদেবের এই অভিনব দর্শনের কারণেই অন্যান্য ভক্তিবাদী দর্শনের থেকে এটি অনন্য দর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।[১২]

রূপ ও সনাতনের প্রতি চৈতন্যদেবের ভক্তি ও তত্ত্ব সিদ্ধান্ত শিক্ষা:

চৈতন্যদেব প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে রূপের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে তাঁকে ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন– কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণপ্রেম লাভের জন্য মুক্তি কামনা করবে না। প্রেম লাভের জন্য ভক্ত অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা করবে। এ কারণে বৈধী ভক্তির অনুশীলন করতে হবে। ভক্তিবীজ ঈশ্বরের অনুগ্রহে হৃদয়ে জাগরিত হয়। ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হলে তাকে বর্ধিত করার জন্য নিয়মিত জল সিঞ্চনের প্রয়োজন হয়। আর সেই প্রয়োজনটিই হচ্ছে শাস্ত্র শ্রবণ ও নামকীর্তন। তাই রূপ গোস্বামী চৈতন্যদেবের এই শিক্ষাকে তাঁর প্রতিভাদীপ্ত লেখনী দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য *'উজ্জ্বলনীলমণি'* নামক গ্রন্থ রচনা করেন, যা বৈষ্ণব দর্শন ও রস সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। এটি চৈতন্যদেবের দর্শন শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত অলংকার ও রস সাহিত্য এবং দর্শন শাস্ত্র হিসেবে সমাদৃত। এর মধ্যে বৈষ্ণব দর্শনের সারমর্ম নিহিত আছে।[১৩]

চৈতন্যদেব কাশীতে সনাতন গোস্বামীকে দু'মাস ধরে বৈষ্ণব দর্শন ও শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। তিনি সনাতনকে বেদের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। সম্বন্ধ বলতে কি বুঝায়? কার সঙ্গে সম্বন্ধ? সম্বন্ধ বলতে কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের শাশ্বত ও নিত্য সম্পর্ককে বুঝায়। কৃষ্ণ ঈশ্বর, জীব তাঁর নিত্য দাস। এ প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের শিক্ষা *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাওয়া যায়–

জীবের 'স্বরূপ' হয়– কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥[১৪]
চৈ. চ. মধ্য/২০/১০৮

অভিধেয় হচ্ছে ভক্তি এবং প্রয়োজন হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম। ভক্তির চূরান্ত লক্ষ্য প্রেম লাভ করা। চৈতন্যদেব সনাতনকে ভক্তির অঙ্গগুলোর মধ্যে পঞ্চাঙ্গের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন– যদি এই পাঁচটি ভক্তির অঙ্গ ভক্ত জীবনে সঠিকভাবে অনুশীলন করে তবে তিনি অবশ্যই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

'সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন'॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥[১৫]
চৈ. চ. মধ্য/২২/৭৪-৭৫

চৈতন্যদেবের ব্যবহারিক জীবনের দর্শন হচ্ছে– 'নিজ আচরি ধর্ম জীবেকে শিখায়'। তিনি লোক দেখানো সাধনাকে ঘৃণা করতেন। তাই বাহ্য সাধনা থেকে অন্তর সাধনাই শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়টিকেই চৈতন্যদেব সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং নিজ জীবনেও অন্তর সাধনার অনুশীলন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অন্তর সাধনার

স্বরূপ হচ্ছে– সখীভাবে আনুগত্যে থেকে অহৈতুকী ভক্তির দ্বারা শুদ্ধভাবে, শুদ্ধ হৃদয়ে গভীর ভাবানুরাগে রাধা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা রস আস্বাদন করা। আর এই অন্তর সাধনাকেই বলা হয় মঞ্জরীভাবের সাধনা।[১৬]

চৈতন্যদেবের মতে পঞ্চভক্তিরসের সাধনা:

চৈতন্যদেবের মতে ভক্তি সাধনা করার জন্য পঞ্চ রসই একমাত্র পথ। এই পঞ্চরসের সাধনা করলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যাবে। পঞ্চভক্তি রস হচ্ছে– শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। নিম্নে বর্ণনা করা হল–

শান্তরস:

এই রসে কৃষ্ণকে ঐশ্বর্যময় মূর্তিতে সাধনা করা হয়ে থাকে। ভক্ত ঈশ্বরকে পরম শক্তিমান হিসেবে চিন্তা করে ভগবানের সঙ্গে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সম্পর্ক তৈরি করে।

দাস্যরস:

এই ভক্তিরসে ভগবান প্রভু এবং ভক্ত তাঁর নিত্য দাস। দাস্যরসে ভগবানের প্রতি সেবা নিষ্ঠার আধিক্য বেশি। এরমধ্যেই তিনি আনন্দ পান।

সখ্যরস:

এই রসের ভক্তিতে শান্তের নিষ্ঠা ও দাস্যের সেবাধিক্য রয়েছে এবং কৃষ্ণের প্রতি সখ্যভাব থাকায় সেবার সংকোচভাব থাকেনা। এখানে শান্তের একনিষ্ঠতা ও দাসের সেবা উভয় গুণই রয়েছে। এই রসের ভক্ত হচ্ছেন সুবল ও শ্রীদাম।

বাৎসল্য রস:

এই ভক্তি রসে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা ও সখ্যের সংকোচহীনতা আছে এবং অধিকতর গাঢ় মমত্ববুদ্ধি ও পাল্য-পালকের সম্বন্ধ রয়েছে। এ রসের ভক্ত হচ্ছেন বৃন্দাবনের নন্দ ও যশোদা।

মধুর রস: মধুর রসের ভক্তি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে 'কান্তা প্রেম সর্বসাধ্য সার'। এখানে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সংকোচহীনতা, বাৎসল্যের মমতাধিক্য রয়েছে। এই রসে পঞ্চ রসের গুণের সমাহার ঘটেছে। এছাড়া এখানে নিজ অঙ্গ দ্বারা কান্তের সেবা করার সুযোগ রয়েছে। এই কারণে এই রস সর্বশ্রেষ্ঠ। একে মাধুর্য রসও বলা হয়ে থাকে। এই রসের শ্রেষ্ঠা হচ্ছেন রাধা রাণী। কেননা তিনি কান্ত শিরোমণি। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

> এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার।
> অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥[১৭]

চৈতন্যদেবের রাগানুগা ভক্তি সাধনের শিক্ষা:

চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করা কালে রামানন্দের সঙ্গে আলোচনার সময় রাগানুগা ভক্তির উল্লেখ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ড. লায়েক আলি খান তাঁর *প্রসঙ্গঃ বৈষ্ণব সাহিত্য* গ্রন্থে *চৈতন্যচরিতামৃতের* উদ্ধৃতি দিয়েছেন–

রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
চৈ. চ- মধ্য/৮

রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী হচ্ছেন গোপীগণ। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হচ্ছেন রাধা রাণী। তাই গোপীরাই শুধু কৃষ্ণকে রাগাত্মিকা ভক্তিতে সাধন করতে পারেন। কিন্তু জীবের পক্ষে এই সাধনা সম্ভব নয়। কেননা জীব নিত্যসিদ্ধ নয় আর গোপীরা নিত্যসিদ্ধ। তাই তারা কৃষ্ণপ্রেম লাভের যোগ্যা। রাগাত্মিকা ভক্তি সহজাত। ইষ্টে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাই রাগ। এই রাগাত্মিকা ভক্তির পরাকাষ্ঠা হচ্ছেন গোপীগণ।

চৈতন্যদেবের শিক্ষা সম্পর্কে জীব গোস্বামী ভক্তি সন্দর্ভে বর্ণনা করেছেন– রাগাত্মিকা ভক্তি হচ্ছে সাধ্যরূপা, ভক্তি লক্ষণা। সাধন প্রকরণে এর প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবে রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগামী ভক্তি হচ্ছে রাগানুগা ভক্তি। অর্থাৎ, সখীভাবে অনুসরণ বা অনুগামী হয়ে এই ভক্তি সাধন করা যায়। কেননা রাধা মহাভাবস্বরূপিণী। তাঁর সখীরাও মহাভাবরূপা। অতএব, তাঁদের সেবাও স্বতন্ত্রময়ী, তাই এই সেবায় জীবের স্বরূপত কোন অধিকার নেই। কারণ জীব হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্য দাস। একমাত্র আনুগত্যময়ী সেবাতে জীবের অধিকার রয়েছে। তাই সখীদের মধ্যে কোন সখীর অনুগত হয়ে ব্রজের রাধাকৃষ্ণের নিত্য প্রেম সেবা করাই জীবের সাধ্য-সাধনা।[১৮]

চৈতন্যদেবের জীবন দর্শন:

চৈতন্যদেবের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, তাঁর ব্যবহারিক জীবনে তিনি আদর্শ ও আশ্রম ধর্ম রক্ষা করার জন্য কত কঠোর ছিলেন এবং কত ত্যাগ স্বীকার করে ও কষ্ট সহ্য করে ধর্ম রক্ষা এবং তাঁর আদর্শ প্রচার করেছিলেন। তিনি এক দিকে বজ্রের মতো কঠোর এবং অন্যদিকে কুসুমের মতো কোমল হৃদয়ের ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যে চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও শিক্ষাই উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ। চৈতন্যদেবের ত্যাগের মহিমায় তাঁর ব্যবহারিক জীবন ও আদর্শ অত্যন্ত সরল এবং সাদাসিধে ছিল। চৈতন্যদেবের দর্শন ও শিক্ষা মানুষের মন পবিত্র করার ও অনাড়ম্বরভাবে ধর্ম চর্চা করার জন্য অতি সাধারণ পথ। এই মতের মধ্যে ছিল– ভদ্রতা, নম্রতা, বিনয়, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বৈষম্যহীনতা, অহিংসা, ক্ষমা, দয়া, মহানুভবতা প্রভৃতি গুণ ও বৈশিষ্ট্য। চৈতন্যদেবের মতে, যাগ-যজ্ঞ, পূজা-অর্চনা, বেদপাঠ, তপস্যা, ধ্যান এগুলো বাহ্য সাধনা। নিজের চিত্ত শুদ্ধির জন্য সাধনা করতে হয়। তাই তাঁর এই ধর্ম পথ রাজসিক কর্মকাণ্ডস্বরূপ যাগ-যজ্ঞ পরিহার করে শুধুমাত্র ঈশ্বরের নাম শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও প্রেম লাভ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম সকল জীবের মঙ্গল সাধন করে থাকে। ধর্মই বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল বিধানের জন্য একমাত্র প্রকৃত পথ। এ কারণে চৈতন্যদেবের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল– সর্ব জীবে সাম্য দর্শন। জীব সেবা করতে হবে। প্রতিটি জীবের প্রতি মমত্ববোধ, সেবাপরায়ণতা, পরোপকার, মনুষ্যত্বের মর্যাদা, অধিকার, অপরের দুঃখ দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। প্রকৃত মানুষ হলেই ধর্মের গুণবৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হবে। চৈতন্যদেব এই সকল আদর্শ ও নীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি তাঁর

জীবনেই আচরণের মাধ্যমে শিক্ষার দ্বারা উল্লিখিত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মহত্ত্বের ও ক্ষমার দৃষ্টান্ত হিসেবে নদীয়ার নৃশংস উগ্রচণ্ডমূর্তিধারী জগাই-মাধাইয়ের প্রতি করুণা প্রকাশ। জাতিভেদের বিষবৃক্ষের মূল উৎপাটন করে তিনি সমাজে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। দীন-দরিদ্র খোলা বেচা শ্রীধরের প্রতি হাস্য-রসিকতা ও সুমধুর ব্যবহারের মাধ্যমে তার প্রতি ভালবাসা আদান-প্রদান করেছিলেন। কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত চাপাল-গোপালের উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেছিলেন। হরিদাস ঠাকুর জন্ম সূত্রে বিধর্মী হলে তাঁর অধিকার ও মর্যাদার জন্য তিনি হৃদয় থেকে উৎসারিত প্রেমের দ্বারা তাঁর মৃত দেহ সমাহিত করে শ্রাদ্ধের জন্য পুরীতে ভিক্ষা করেছিলেন। ঘৃণ্য ও সংক্রামক কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত বাসুদেব তাঁর পরিবার ও সমাজ থেকে পরিত্যক্ত হলে চৈতন্যদেবই তাঁকে আলিঙ্গন করে রোগ থেকে মুক্তি দিয়ে সমাজে প্রীতি ও মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। নারী সম্ভাষণের জন্য ভদ্রোচিত আচরণের সুযোগ নিয়ে সাধু ব্যক্তির সাধুত্ব যাতে নষ্ট না হয়, সে কারণে তিনি ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর প্রতি কঠোর আদেশ প্রদান করেছিলেন। অর্থাৎ, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর নারী সম্ভাষণ নিষিদ্ধ করেছিলেন, যার দৃষ্টান্ত ছোট হরিদাস। ভক্তদের অনুরোধ সত্ত্বেও আদর্শ ও ধর্মের গ্লানি যাতে না হয়, সে কারণে তিনি ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তাই এই উদাহরণের মাধ্যমে ধর্ম ও আদর্শ রক্ষার জন্য চৈতন্যদেবের চরিত্রের উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছে। সুবুদ্ধি রায়ের জীবন সংকটে তিনি মুক্তির বাণী দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁর ব্যবহারিক জীবনে অগণিত ভক্ত, শিষ্য এবং দর্শক-শ্রোতাদের আচরণ ও শিক্ষা দ্বারা ধর্মের মর্ম বাণীর গভীর অর্থ শিখিয়েছিলেন।[১৯] তিনি রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করে বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন এবং আদর্শের বিষয়ে ত্যাগের সারকথা বলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥[১৯(ক)]

চৈ. চ. অন্ত্য/৬/২৩৬-২৩৭

তিনি রূপ ও সনাতনকে একান্তভাবে শিক্ষা দান করেন। বৈষ্ণব ধর্মের দর্শন ও সাহিত্য এবং স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করা, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করা, মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা এবং বৈষ্ণব ধর্মের শিক্ষা প্রচার করা– এই চারটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি তাঁদের বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন।

রঘুনাথ ভট্টের পিতা তপন মিশ্রের প্রতি চৈতন্যদেব যে উপদেশ বাণী দিয়েছিলেন, তাতে দেখা যায়– একমাত্র কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমেই সিদ্ধি লাভ করা যাবে। বিভিন্ন ভক্ত ও শিষ্যের প্রতি অজস্র উপদেশ-বাণী রয়েছে তাঁর সমগ্র জীবনের পরতে পরতে। চৈতন্যদেবের এই উপদেশ ও বাণীই হচ্ছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তি। হরিনাম সংকীর্তনেই যে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের ফল পাওয়া যায়, এ সম্বন্ধে *চৈতন্যভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।

হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥[২০]

চৈ. ভা. আদি/১৪/১৪৩

চৈতন্যদেবের বিনয়, ভক্তি ও সহিষ্ণুতার এবং হরিকীর্তনের যোগ্যতার প্রসঙ্গে শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে–

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥[২১]

চৈ. চ. অন্ত্য/২০/২১

সমাজ বিপ্লবে চৈতন্যদেবের দর্শন ও শিক্ষা:

চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে সমাজ সংস্কার ও সমাজ বিপ্লব। কেননা চৈতন্যদেবের শিক্ষা ও দর্শনে জাতিভেদ, উঁচু-নীচু, বিদ্বান-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র ও স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য দূর হয়েছে। সমাজের অধিকার বঞ্চিত মানুষ মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করেছে। চৈতন্যদেবের এ আন্দোলন সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।[২২]

যে নামকীর্তন পূর্বে ছিল গৃহের আঙ্গিনার মধ্যে সীমাবদ্ধ সেই নামকীর্তনকে চৈতন্যদেবই একমাত্র যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে সংকীর্তন শোভাযাত্রায় পরিণত করেছেন। ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সহস্র সহস্র নর-নারী তাঁর পতাকাতলে সামিল হলে তাঁর এই নাম সংকীর্তনের অহিংস আন্দোলন ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম গণসংগীত হিসেবে বিদিত হয়েছে। কেননা– তিনি বলেছেন, কলিযুগে একমাত্র নাম সংকীর্তন শ্রবণেই মুক্তি হবে। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এই রকম মুক্তির বাণী অন্যকোন মহাপুরুষ প্রচার করেননি। তাই বিদগ্ধ সমাজে চৈতন্যদেবের এরূপ দর্শন ও শিক্ষাকে চৈতন্যদেবের অভিনব অবদান বলে স্বীকার করা হয়েছে। ধর্মান্ধ মধ্যযুগে জাতিভেদের লৌহ প্রাচীর, কৌলীন্য প্রথা, হিন্দু সমাজের কুসংস্কার প্রবলভাবে মাথাচারা দিয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলার মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্ব ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। চৈতন্যদেব তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা দ্বারা আন্দোলনের মাধ্যমে জাতি ভেদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। সমাজের বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিলেন এবং তা দূর করেছিলেন। এ কারণে চৈতন্যদেব সমাজে ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখা দিয়েছিলেন। আপামর মানুষের কাছে তিনি কলিযুগের অবতাররূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে চৈতন্যদেব নিষ্পেষিত, নির্যাতিত, অবহেলিত হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ পুনর্গঠক ছিলেন। কেননা তিনি ঘোষণা করেছিলেন– "চণ্ডালো হপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ"। চৈতন্যদেব প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন– "তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন"।

চৈতন্যদেবের চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনগণের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা এবং সমাজের পতিতদেরকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। চৈতন্যদেব ঘোষণা করেছিলেন–"কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার"।

তিনি নিজে ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান হয়েও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। চৈতন্যদেবের এই সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মানবিক গণতন্ত্রের আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।[২৩]

ব্যবহারিক জীবনে চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও শিক্ষাঃ

রঘুনাথ ভট্টকে পিতামাতার সেবা এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অধ্যয়নের জন্য চৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রদানঃ চৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তপন মিশ্র কাশীতে বাস করতেন। তাঁর এক মাত্র পুত্র রঘুনাথ ভট্ট যিনি ষড়্গোস্বামীদের একজন। রঘুনাথ ভট্ট গৃহ ছেড়ে পুরীতে চৈতন্যদেবের নিকট আজীবন তাঁর সঙ্গী হওয়ার জন্য আসেন। কিন্তু পিতৃ-মাতৃ ভক্ত চৈতন্যদেব রঘুনাথ ভট্টকে শিক্ষা প্রদান করেন যে, তোমার ধর্মকর্ম করার জন্য পুরীতে থাকতে হবে না, গৃহে গিয়ে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রুষা কর। তাদের সন্তুষ্ট কর, তুমি ছাড়া তাদের সেবা-শুশ্রুষা করার জন্য অন্য কেউ নেই, সেটিই তোমার ধর্ম। ভক্তি দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবত পুরাণ থেকে জ্ঞান-ভক্তি লাভ করতে হলে শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন কর, তাহলে তোমার সর্বসিদ্ধি হবে। এইভাবে চৈতন্যদেব নিজ জীবনে বাস্তবমুখী শিক্ষাদান করেছেন, যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করতে পারা যায়। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

"বৃদ্ধ মাতা-পিতার যাই' করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥
* * *
ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্"॥[২৪]
চৈ. চ. অন্ত্য /১৩/১১৩, ১২১

দীন ও দরিদ্রদেরকে অন্ন, বস্ত্র ও অর্থ দান এবং অতিথি সেবায় চৈতন্যদেবের শিক্ষা দানঃ

চৈতন্যদেব শুধু ধার্মিক ও নীতিবাদী এবং অধ্যাপক শিরোমণিই ছিলেন না– তিনি নদীয়ায় গৃহস্থ জীবনে থাকা অবস্থায় পতিত, অসুস্থ, দীন-দরিদ্র ও দুঃখী অসহায় মানুষকে অন্ন, বস্ত্র ও অর্থ দান করে তাদের সেবা করতেন এবং দুঃখ অপনোদনের জন্য চেষ্টা করতেন। তাঁর গৃহে প্রায়শই ১০-২০জন সন্ন্যাসী অতিথি হিসেবে আসতেন। তিনি নিজ হাতে তাঁদের সেবা করতেন। তিনি মনে করতেন অতিথি নারায়ণ। তাই গৃহস্থের অতিথি সেবা পরম ধর্ম। অতিথি সেবা করে তিনি পরম আনন্দ লাভ করতেন। সে কারণে তিনি গৃহস্থদের উদ্দেশে উপদেশ দিয়েছেন– গৃহস্থের অতিথি সেবা নারায়ণ জ্ঞানে এবং পরম আদরের সঙ্গে করা উচিত। মনুসংহিতার বর্ণনা অনুযায়ী যদি কারও অতিথি সেবায় সামর্থ্য নাও থাকে তবুও অতিথিকে আসনের জন্য তৃণ, শয়নের জন্য ভূমি, পাদ ধৌতের জন্য জল এবং সুমধুর বাক্য দ্বারা তাঁর সেবা সম্পাদন করতে হবে। কেননা এগুলির কোন অভাব হয় না। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যভাগবতে* পাওয়া যায়–

দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।

অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি ॥

কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।

সবা' নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ॥

সন্ন্যাসীগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।

তুষ্ট করি' পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিক্ষায়েন ধর্ম্ম।

"অতিথির সেবা–গৃহস্থের মূলকর্ম্ম॥

যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট- দোষে।

সেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে॥[২৫]

চৈ. ভা. আদি/১৪/১২, ১৪, ১৯, ২১, ২৩

সকল জীবকে সম্মান প্রদর্শন করা প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের শিক্ষা: চৈতন্যদেব জীবসেবা করেছেন ঈশ্বর জ্ঞানে। প্রতিটি জীবের মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন। তিনি ঈশ্বর আরাধনার জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অস্পৃশ্য, চণ্ডাল ও নর-নারীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের অধিকারের কথা বলেছেন। জাতি-বর্ণের বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙ্গে সমাজে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেছেন। জীবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা যায়। তাই তিনি নিজ জীবনে সাধনালব্ধ ধর্মকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে ঘোষণা দিয়েছেন দৃঢ় কণ্ঠে– 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।' সমাজ জীবনে এটি চৈতন্যদেবের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিক।[২৬]

হরিনামের দ্বারা মহাপাপীদের উদ্ধারের ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের শিক্ষা:

নবদ্বীপে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ও রাজশক্তির আশ্রয়ে জগাই ও মাধাই দুই ভাই দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ও মহাপাপী ছিল। সমাজে এমন কোন হীনপাপ বা জঘন্যকর্ম ছিল না, যা এই দুই ভাই করেনি। চৈতন্যদেব এই দুই ভাইকে হরিনামের দ্বারা উদ্ধার করেছিলেন। এই দুই ভাই মহাপাপীর জীবন ত্যাগ করে সংসার বিরাগী হয়ে পথে পথে সর্বদা কৃষ্ণ নাম কীর্তন করতো এবং আত্ম-অনুশোচনায় দগ্ধীভূত হয়ে ক্রন্দন করতো। সম্মুখে যাকে দেখতে পেতো তার নিকটে গিয়ে পদ স্পর্শ করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতো। চৈতন্যদেবের হরিনামের শিক্ষা এমন হলো যেন-পরশমণির স্পর্শে লোহা স্বর্ণ হলো। চৈতন্যদেবের এই নাম ধর্মের আন্দোলন ছিল পাপের বিরুদ্ধে নামের শক্তির, উগ্রতার বিরুদ্ধে বিনয়ের, হিংসার বিরুদ্ধে শান্তির জয়যাত্রাস্বরূপ। এই হচ্ছে চৈতন্যদেবের হরিনামের শিক্ষা।[২৭]

চৈতন্যদেবের করুণায় জগাই-মাধাইয়ের এমন পরিবর্তনে নদীয়াবাসী অভিভূত। সবাই বলেছেন, 'নিমাই সাধারণ মানুষ নন, তিনি মহাপুরুষ।' মাধাইয়ের গঙ্গাঘাট মার্জনেও সকলের প্রতি করুণাত্মক কণ্ঠে ক্ষমাভিক্ষা চাওয়ার ক্ষেত্রে সে ঘাটের নাম হয় 'মাধাইয়ের ঘাট'। *চৈতন্যভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায়।
'মাধাইর ঘাট' বলি' সর্ব্বলোকে গায়॥ [২৭(ক)]
চৈ. ভা./মধ্য/১৬/৯৪

ঈশ্বর সাধনায় সকল জাতি-বর্ণের অধিকারের ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের শিক্ষা :

চৈতন্যদেবের সময় সমাজে ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদের ধর্মীয় যাগ-যজ্ঞে অধিকার ছিল। কিন্তু চৈতন্যদেব সকল শ্রেণির মানুষকে ধর্ম ও কর্মে অধিকার প্রদানের জন্য বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা প্রদান করেছিলেন। তাঁর এই শিক্ষার ফলে সমাজের উঁচু বর্ণ থেকে নিম্ন বর্ণের সকলের মিলনের ফলে সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে কয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব বেত্তা সেই গুরু হয়॥
চৈ. চ. মধ্য/৮/১২৭
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুলে বিপ্র নহে কৃষ্ণ ভজনে যোগ্য ॥
যেই ভজে, সেই বড় অভক্ত হীন, ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥
চৈ. চ.

চৈতন্যদেবের এই সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে সকল জাতি-বর্ণ ফিরে পেয়েছে নিজ নিজ ধর্মের অধিকার।[২৮]

ভিক্ষুক শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভিক্ষার ঝুলি থেকে খুদ কণা গ্রহণ ও অন্ন গ্রহণে চৈতন্যদেবের শিক্ষা:

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নদীয়ার দীন-দরিদ্র ভিখারি ছিলেন। তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে যা পেতেন তা ঈশ্বরকে সমর্পণ করে ভোজন করতেন এবং পথে পথে ঈশ্বরের নাম কীর্তন করতেন। মনেপ্রাণে সততার মহান প্রতীক ছিলেন। শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকলেও তিনি সর্বদা সুখী ছিলেন। চৈতন্যদেব এই ভিক্ষুকের অন্তরের বিশুদ্ধভাব জানতে পেরে অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিদের অমৃত ভোজন ত্যাগ করেও দরিদ্র শুক্লাম্বরের ভিক্ষার ঝুলি থেকে জোর করে খুদ কণা গ্রহণ করে আনন্দিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যভাগবতে* পাওয়া যায়–

এত বলি' হস্ত দিয়া ঝুলির ভিতর।
মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্বর॥

শুক্লাম্বর বলে,"প্রভু কৈলা সর্ব্বনাশ।
এ তণ্ডলে খুদ-কণ-বহুত প্রকাশ"॥
প্রভু বলে, "তোর খুদকণ মুঞি খাও।
অভক্তের অমৃত উলটি' নাহি চাও"॥[২৯]
চৈ. ভা-মধ্য/১৬/১২৫-১২৭

এছাড়া অন্য এক দিন সবার সম্মুখে চৈতন্যদেব শুক্লাম্বরের নিকট অন্ন গ্রহণ করার ইচ্ছা ব্যাক্ত করলেন যে, তোমার অন্নের স্বাদ অমৃতস্বরূপ, 'তাই আমাকে অন্ন ভোজন করাও'। এই হচ্ছে চৈতন্যদেবের অধম পতিতদের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম। তিনি ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অমৃত খাবার বাদ দিয়ে সমাজের নীচ, দরিদ্র ও পতিতদের অন্ন জোর করে গ্রহণ করতেন। এখানেই তিনি সমাজকে শিক্ষাদান করছেন যে– প্রেমের ক্ষেত্রে কোন জাত, বর্ণ নেই। চৈতন্যদেবের দৃষ্টিতে সবাই মানুষ। তাই জীবকে প্রেম শিক্ষা দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যভাগবতে* পাওয়া যায়–

"তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়।
কিছু ভয় না করি, বলিলাঙ দৃঢ়"॥
ব্রহ্মাদির যজ্ঞভোক্তা শ্রীগৌরসুন্দর।
শুক্লাম্বর-অন্ন খায়– এ বড় দুষ্কর॥
হেন প্রভু বলে,– "জন্ম যাবৎ আমার।
এমত অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর॥[৩০]
চৈ. ভা-মধ্য/২৬/২, ২৪-২৫

শূদ্র রামানন্দ রায়ের নিকট থেকে ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণে চৈতন্যদেবের শিক্ষা :

প্রদ্যুম্ন মিশ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পুরীতে চৈতন্যদেবের নিকট থেকে কৃষ্ণকথা শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে চৈতন্যদেব বললেন– কৃষ্ণকথা বা ভাগবত শাস্ত্র আলোচনার উত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন রামানন্দ রায়। তুমি তাঁর নিকট শ্রবণ কর। কিন্তু প্রদ্যুম্ন মিশ্র রামানন্দ রায়ের গৃহে গিয়ে জানতে পারেন, তিনি দেবদাসীদের *জগন্নাথবল্লভ নাটকের* অভিনয় বিষয়ে নৃত্যকলা শিক্ষা দিচ্ছেন। যেহেতু রামানন্দ রায় আশ্রমে গৃহস্থ এবং বর্ণে শূদ্র ছিলেন, তা তিনি জেনেও ভাবলেন চৈতন্যদেব যেহেতু তাঁর নিকট পাঠিয়েছেন তাই তিনি এসেছেন, কিন্তু যখন জানলেন তিনি কি রকম ভক্ত যে, দেবদাসীদের নৃত্যকলা শিক্ষা দিচ্ছেন- এরূপ মনোভাবে মিশ্র ফিরে আসেন। পরে চৈতন্যদেবের নিকট গেলে চৈতন্যদেব সব শুনে রামানন্দের শুদ্ধঅন্তরের অবস্থা এবং যোগ্যতার বিষয়ে বললে প্রদ্যুম্ন মিশ্র তা গভীরভাবে অনুধাবন করে রামানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে রামানন্দের নিকট থেকে ভাগবত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ করে মুগ্ধ হয়ে চৈতন্যদেবের নিকট রামানন্দকে অপ্রাকৃত স্তরের ভক্ত ও আচার্য বলে প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

তাঁর ফল কি কহিমু, কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই, প্রায়-সিদ্ধ তাঁর কায় ॥
রাগানুগ-মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ-তুল্য, তাতে 'প্রাকৃত' নহে মন।
আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছে হয় যদি, পুনঃ যাহ তথা ॥
* * *
রামানন্দ রায়-কথা কহিলে না হয়
'মনুষ্য' নহে রায়, কৃষ্ণভক্তিরসময় ॥
'গৃহস্থ' হইয়া নহে রায় ষড়্বর্গের বশে।
'বিষয়ী' হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥[৩১]
চৈ. চ. অন্ত্য/৫/৫০-৫২, ৭১, ৮০

চৈতন্যদেব তাঁর শিক্ষা প্রদান করেছেন যে– যোগ্য শুদ্ধ আচার্যকে মর্যাদা প্রদান করতে হবে। যিনি উপযুক্ত গুরু বা আচার্য তাঁর নিকট ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেছেন– 'যেই কৃষ্ণ তত্ত্ব বেত্তা, সেই 'গুরু' হয়।' ব্রাহ্মণ বা কোন পণ্ডিত সন্ন্যাসী হলেও গুরু হতে পারেনা, যদি সে কৃষ্ণতত্ত্ব বেত্তা না হয়। এখানে রামানন্দ রায় একজন গৃহস্থ ও শূদ্র বর্ণের হলেও চৈতন্যদেব নিজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী হয়েও রামানন্দের নিকট শাস্ত্র শ্রবণ করেছেন এবং তাঁকে আচার্যের মর্যাদা দিয়েছেন। তাই তিনি উচ্চ কুলের ব্রাহ্মণ প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে শিক্ষা দিয়েছেন যে– রামানন্দ রায়ের নিকট থেকে শাস্ত্র শ্রবণ করতে। তাই চৈতন্যদেব শিক্ষা প্রদান করছেন– শূদ্র বর্ণের ও গৃহস্থ আশ্রমের হলেও রামানন্দ রায় উচ্চস্তরের কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা আচার্য, তাই তাঁর নিজের এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্রের গুরু হওয়ার যোগ্য। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

সন্ন্যাসী-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব নাশ।
নীচ-শূদ্র-দ্বারা করেন ধর্মের প্রকাশ॥
'ভক্তি', 'প্রেম', 'তত্ত্ব' কহে রায়ে করি' 'বক্তা'।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র-সহ হয় 'শ্রোতা' ॥[৩২]
চৈ. চ- অন্ত্য/৫/৮৪-৮৫

ছোট হরিদাসকে দণ্ড দ্বারা সকল মানুষকে চৈতন্যদেবের শিক্ষা:

ছোট হরিদাস চৈতন্যদেবের সংকীর্তন ভক্ত ছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবকে কীর্তন করে শুনাতেন এবং সুকণ্ঠী কীর্তনীয়া ছিলেন। পুরীতে ভগবান আচার্যের আদেশে ছোট হরিদাস মাধবী দেবীর গৃহে ভিক্ষা করে শালি ধানের সুগন্ধি সরু চাল এনেছিলেন। চৈতন্যদেব তা জানতে পেরে হরিদাস আশ্রমের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছেন– এ

কারণে তাঁকে আজীবনের জন্য পরিত্যাগ করেছিলেন। কেননা সন্ন্যাসীর নারী সম্ভাষণ নিষিদ্ধ। সন্ন্যাসী অর্থাৎ সর্বত্যাগী, কায়-মন-বাক্যে তাঁরা ত্যাগী। বৈরাগী হয়েও যদি কেউ মনে মনে বিষয়-বাসনা চিন্তা করে অর্থাৎ ষড়রিপু বশ না করতে পারে, তাহলে তাঁর সন্ন্যাস ধর্ম হবে না। তাই চৈতন্যদেবের ত্যাগের ধর্ম অনুসারে হরিদাস আশ্রমধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছেন। একে ক্ষমা করলে বা শাস্তি প্রদান না করলে ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্য ধর্মের আদর্শ বিনষ্ট হবে। এই কারণে শিক্ষা প্রদানের জন্য চৈতন্যদেব এইরূপ দণ্ড প্রদান করেন। ছোট হরিদাস ক্ষমা না পাওয়ায় অনুতপ্ত হয়ে ত্রিবেণীতে আত্মাহুতি দেন। এই দৃষ্টান্ত চৈতন্যদেবের জীবনদর্শনে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাওয়া যায়–

প্রভু কহে,– "বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥
* * *
মহাপ্রভু–কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে?
প্রিয় ভক্তে দণ্ড করেন ধর্ম বুঝাইতে ॥
দেখি' ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বস্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে ॥[৩৩]

চৈ. চ-অন্ত্য /২/১১৭, ১৪৩, ১৪৪

সন্ন্যাস আশ্রমের কঠোরতার ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের শিক্ষা:

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস জীবনে ভূমিতে শয়ন করতেন। তিনি সন্ন্যাস জীবনে কঠোর নিয়মকানুন পালন করার কারণে তাঁর শরীর ক্ষীণ ও পাতলা হয়েছিল। তিনি কলাগাছের বাকলের উপরে শয়ন করতেন। যেহেতু তিনি ক্ষীণ-পাতলা শরীরের অধিকারী, সে কারণে কলার বাকলে শয়ন করায় তাঁর শরীরে ব্যাথা হতো। সেই কষ্টে জগদানন্দ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে চৈতন্যদেবের শয়নের জন্য শিমুল তুলার তোষক ও বালিশের ব্যবস্থা করলে চৈতন্যদেব রুষ্টচিত্তে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কেননা সন্ন্যাসীর বিষয়ভোগ নিষিদ্ধ। সন্ন্যাস ধর্মে তাকে ভূমিতেই শয়ন করতে হবে। সে কারণে সুখের উপকরণ গ্রহণ নিষিদ্ধ। তাই চৈতন্যদেব তাঁর জীবনে সন্ন্যাস ধর্ম অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে পালন করে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, সন্ন্যাসী কখনও যেন সুখের পথে বিন্দুমাত্র কঠোরতার ব্রত শিথিল না করে। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাওয়া যায়–

এক তূলি-বালিশ গোবিন্দের হাতে দিলা।
'প্রভুরে শোয়াইহ ইহায়'–তাহারে কহিলা ॥
* * *
সন্ন্যাসী-মানুষ আমায় ভূমিতে শয়ন।
আমারে খাট-তুলি-বালিশ মস্তক-মুণ্ডন![৩৪]

চৈ. চ. অন্ত্য/১৩/৮, ১৫

চৈতন্যদেবের শ্রদ্ধা, সম্মান ও বিনয়ের শিক্ষা:

চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হলেও সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। কেউ তাঁর নিন্দা করলেও তিনি খুশি ও আত্মসচেতন হতেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হয়েও বেদান্ত পাঠ না করে কেন ভাবুকের মতো নৃত্য কীর্তন করেন? এই কারণে তৎকালীন বারাণসীর সন্ন্যাসী শিরোমণি ও বিখ্যাত বৈদান্তিক শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতী চৈতন্যদেবের নিন্দা করতেন। চৈতন্যদেব প্রতিনিন্দা না করে শ্রদ্ধা, সম্মান, ভক্তি-বিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রকাশানন্দ সরস্বতীর বেদান্ত সভায় উপস্থিত হয়ে সকলকে যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে পাদ ধৌত করে সেই স্থানে বসে পড়লেন। তখন সকল সন্ন্যাসীরা হতচকিত হয়ে চৈতন্যদেবকে তাঁদের সঙ্গে উচ্চাসনে আসন গ্রহণ করার অনুরোধ করলে চৈতন্যদেব বললেন, আমি মূর্খ ও নিচু সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী কিন্তু আপনারা কত মহান ও উচ্চ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী এবং বিদগ্ধ পণ্ডিত। তাই আমার যোগ্য স্থান হচ্ছে এই স্থান। এইভাবে চৈতন্যদেব অন্যের নিন্দা না করে শ্রদ্ধা-সম্মান এবং ভক্তি-বিনয় দ্বারা নিজে আচরণ করে সবাইকে শিক্ষা প্রদান করেছেন, যা তাঁর জীবন দর্শনের অতুলনীয় বিষয়। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাওয়া যায়–

সবা নমস্করি' গেলা পাদ-প্রক্ষালনে।
পাদ প্রক্ষালিয়া বসিল সেই স্থানে ॥
ইহাঁ আইস গোসাঞি, শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস, কিবা অবসাদ ॥
প্রভু কহে,– আমি হই হীন-সম্প্রদায়।
তোমা-সবার সম্প্রদায়ে বসিতে না যুয়ায় ॥
বেদান্ত-পঠন, ধ্যান,– সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি' কর কেনে ভাবুকের কর্ম্ম ॥[৩৫]
চৈ. চ–আদি/৭/৫৯, ৬৩-৬৪, ৬৯

রঘুনাথ দাসকে গৃহস্থাশ্রমে ও বৈরাগ্য ধর্মে চৈতন্যদেবের শিক্ষা:

সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা হিরণ্যদাসের ভ্রাতা গোবর্ধনদাসের পুত্র রঘুনাথ দাস। তিনি বর্ণে কায়স্থ এবং আশ্রমে গৃহস্থ ছিলেন। গোবর্ধনদাসের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ দাস ঐশ্বর্যের মধ্যে পালিত হয়েছেন। গৃহে অপ্সরাসম সুন্দরী স্ত্রী রয়েছে, তবুও রঘুনাথ দাস সংসারের মায়ামোহের প্রতি উদাসীন ছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে চৈতন্যদেবের সঙ্গী হওয়ার জন্য শান্তিপুরে দেখা করে তাঁর মনোভিলাষ ব্যক্ত করেন। তখন চৈতন্যদেব বললেন– তুমি গৃহস্থ, সংসারে তোমার স্ত্রী, পিতা-মাতা রয়েছে, তাদের প্রতি তুমি দায়িত্ব-কতর্ব্য পালন কর। মর্কট বৈরাগ্য ত্যাগ করে অনাসক্ত হয়ে বিষয় ভোগ কর। বাহিরে তুমি সকল প্রকার কর্ম করবে কিন্তু অন্তরে

বৈরাগ্যভাব রাখবে। তাই তোমার গৃহত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই। এইভাবে সংসারে কর্তব্য কর্ম পালন করে অনাসক্ত হয়ে কৃষ্ণের চিন্তা কর। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাওয়া যায়–

প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজ-ঘরে যায়।
মর্কট-বৈরাগ্য ছারি' হৈলা 'বিষয়ী-প্রায়' ॥
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব-কর্ম।
দেখিয়া ত' মাতা-পিতার আনন্দিত মন ॥[৩৬]
চৈ. চ. অন্ত্য/৬/১৪-১৫

কিন্তু পরবর্তীকালে যখন রঘুনাথ দাস সংসারের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে চৈতন্যপ্রেমে বিভোর হয়ে পুরীতে গিয়ে বৈরাগ্য ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ পরমহংস স্তরের সাধনা বা নিষ্কিঞ্চন ভজনের বিষয়ে চৈতন্যদেবের নিকট শিক্ষা প্রার্থনা করলেন তখন চৈতন্যদেব বললেন– যেহেতু বিষয়-বাসনারূপ জাগতিক মোহ পরিত্যাগ করে ত্যাগের ধর্মে প্রবেশ করেছ, সেহেতু তুমি শ্রেষ্ঠ পথের অনুসন্ধানকারী, তাই আমার শিক্ষা হচ্ছে– জাগতিক কোন কথা শ্রবণ করবে না বা অন্য কিছু বলবে না। জড় কামনা-বাসনা চর্চা দ্বারা বৈরাগ্য সাধন পথে চিত্তের পবিত্রতা থাকে না। রাজকীয় ও সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ করবে না এবং অভিজাত শ্রেণির ন্যায় রাজকীয় বস্ত্র পরিধান করবে না। কেননা শরীরে, মনে ও চিত্তে নির্মল থাকতে হবে এবং ইন্দ্রিয়কে বশ করতে হবে। নিজে কোন প্রকার সম্মানের চিন্তা না করে জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সম্মান প্রদর্শন করবে এবং কৃষ্ণ নাম সর্বদা জপ ও কীর্তন করবে, কেননা নিরুপাধী এবং নির্মৎসর না হলে হৃদয়ে চিদানন্দ রূপ প্রকাশিত হবে না। রাধাকৃষ্ণ এই যুগল মাধুর্যরসের আরাধনার জন্য বৃন্দাবন যেতে হবে না বা কোন জাগতিক প্রতিষ্ঠা লাভে আড়ম্বরপূর্ণ পূজা-পার্বণের প্রয়োজন হবে না। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে। এইভাবে চৈতন্যদেব তাঁর নিজ জীবনের আচরিত ধর্ম রঘুনাথ দাসকে শিক্ষা দান করেছেন। এই রঘুনাথ দাস পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের শিক্ষালাভ করে নিষ্কিঞ্চন সাধনার পথে ষড়ুগোস্বামীর অন্যতম হয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের শিক্ষা বিষয়ে *চৈতন্যচরিতামৃতের* অন্ত্যে পাই–

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥[৩৭]
চৈ. চ. অন্ত্য/ ৬/২৩৬-২৩৭

বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে দিগ্বিজয় করা নয় এ ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের শিক্ষা:

কেশবাচার্য কাশ্মীরের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি ছিলেন। তিনি বিদ্যাদেবী সরস্বতীর বর প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা সমগ্র ভারত জয় করে সবশেষে নবদ্বীপে বিজয় অর্জন করতে এসেছিলেন। নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত অর্থাৎ, চৈতন্যদেবের নিকট তিনি পরাজিত হয়ে আত্ম-অনুশোচনায়

সরস্বতী দেবীর কাছে জানতে পারেন যে, তিনি বিদ্যাদেবীরও প্রভু। তাই তিনি চৈতন্যদেবের চরণে আত্মসমর্পণ করে উপদেশ প্রার্থনা করলে চৈতন্যদেব কেশবাচার্য পণ্ডিতকে বললেন– বিদ্যা অর্জনের দ্বারা দিগ্বিজয় করা কাজ নয়। বিদ্যার দ্বারা প্রকৃত সত্যকে জেনে সেই সত্যের আরাধনা করতে হয়। তাই গর্ব, দম্ভ ও অভিমানরূপ উপাধি পরিত্যাগ করে পরমপদ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করাই শ্রেষ্ঠ। তাই এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

সেই সে বিদ্যার ফল জানিত নিশ্চয়।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি হয় ॥[৩৮]
চৈ. ভা-আদি/১৩

পাণ্ডিত্য পরিহার করে গুরুদেবের নিকট থেকে দীক্ষার মাধ্যমে ঈশ্বরের করুণা লাভের ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের শিক্ষা:

চৈতন্যদেব নবদ্বীপে থাকা অবস্থায় নিমাই পণ্ডিত হিসেবে তিনি তাঁর বিদ্যার গর্ব প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যা থাকলেও প্রেমভক্তি লাভ করতে পারেননি। তাই তিনি যখন বিষ্ণুর চরণ দর্শন করে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন তখন সেই শুভ সময়ে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীল ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে সেখানে চৈতন্যদেবের দর্শন হওয়াতে তিনি ঈশ্বরপুরীকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর নিকট থেকে ইষ্ট মন্ত্র লাভের প্রার্থনা করেন এবং ঈশ্বরপুরী তখন তাঁকে দীক্ষামন্ত্র দান করলে চৈতন্যদেবের মধ্যে ঈশ্বর প্রেমের মহাভাব জাগ্রত হওয়ায় তিনি হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলে উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলেন। এই হচ্ছে মন্ত্রের শক্তি। তাই চৈতন্যদেব শিক্ষা দিলেন– এযাবৎ তাঁর পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল, তাই ঈশ্বর প্রেম লাভ হয়নি। যেই তিনি গর্ব পরিত্যাগ করে গুরুদেবের নিকট আত্মসমর্পণ করে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করলেন, সেইমাত্র অর্থাৎ, মন্ত্র শক্তির কারণে তাঁর ঈশ্বরের দিব্যভাব ও প্রেম লাভ হলো। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

তবে তান স্থানে শিক্ষা– গুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর-মন্ত্রের গ্রহণ ॥
প্রেমভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর ॥
আর্ত্তনাদ করি' প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
"কোথা গেলা, বাপ কৃষ্ণ, ছাড়িয়া মোহরে?"[৩৯]
চৈ. ভা-আদি/১৭/১০৭,১১৮-১১৯

চৈতন্যদেবের নাম শিক্ষার উপদেশ:

চৈতন্যদেব বলেছেন, কলিযুগের যুগধর্ম হচ্ছে নাম সংকীর্তন। নাম সংকীর্তনের ফলে সর্বসিদ্ধি লাভ হবে। নাম সংকীর্তনের ফলে জাত ও বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে একই পতাকার নিচে সামিল হওয়া যাবে। ঈশ্বরের নাম স্মরণ

ও কীর্তনের জন্য শুদ্ধাশুদ্ধ বা দিনক্ষণের কোন নিয়ম নেই। সর্বদা ঈশ্বরের নাম কীর্তন করা যাবে। এই নামের মধ্যে প্রতিটি মানুষের কল্যাণ নিহিত আছে। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যভাগবতে* পাওয়া যায়–

কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ-বিনু প্রভু আর কিছু না বাখানে ॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর' ধ্যান ॥[৪০]
চৈ. ভা-মধ্য/১/২৪২, ৩৩৬

জগদুদ্ধারের নিমিত্তে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের শিক্ষা:

সমাজ, দেশ ও জাতির প্রতি চৈতন্যদেবের যে উদ্দেশ্য ও কর্তব্য তা শুধু একমাত্র তিনিই জানতেন। শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তিনি নদীয়ার পথে পথে হরিনাম কীর্তন করে সকল শ্রেণিপেশার মানুষকে একত্রিত করার চেষ্টা করেও শান্তি স্থাপনের জন্য পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারেননি। সমাজের সবাই চৈতন্যদেবের আদর্শ ও ধর্মের মর্মবাণী হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। তাই তিনি সংকল্প করলেন যে, আমি এমন পথ অবলম্বন করে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তির বাণী প্রচার করবো যে, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে আমার কথা শ্রবণ করবে। সে কারণে তাঁর বিশ্বাস ছিল সমাজ ও দেশের মানুষ সন্ন্যাসীকে গভীর শ্রদ্ধাভক্তি করবে এবং তাঁর বাণী অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করবে। তাই গৃহস্থ জীবনে সংসারের চার দেয়ালের মধ্যে নিজেকে বন্দি না রেখে জগৎ ও জীবোদ্ধারের নিমিত্তে প্রতি দ্বারে দ্বারে গিয়ে ধর্মের বাণী গ্রহণ করার জন্য ভিক্ষা প্রার্থনা করবেন। এই কারণে তিনি মূলত সন্ন্যাস গ্রহণ করে জগৎকে শিক্ষা দিলেন যে, আত্মসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে মানবের পরম মঙ্গলের জন্য তাঁর এই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যভাগবতে* পাওয়া যায়–

ভাল লোক তারিতে করিলুঁ অবতার।
আপনে করিলুঁ সব জীবের সংহার ॥
দেখ কালি শিখা-সূত্র সব মুড়াইয়া।
ভিক্ষা করি' বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া ॥
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে॥
তবে মোরে দেখি' সে-ই ধরিবে চরণ।
এই মতে উদ্ধারিব সকল ভুবন ॥
জগৎ উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে ॥
যেরূপে করিবা প্রভু জগত-উদ্ধার।

তুমি সে জানয়ে তাহা কে জানয়ে আর ॥[৪১]

চৈ, ভা-মধ্য/২৬/১৩১-১৩৪, ১৪০, ১৪৭

জননীর পদ-ধূলি লই' প্রভু শিরে।

প্রদক্ষিণ করি' তানে চলিলা সত্বরে ॥

চলিলেন বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহ হইতে।

সন্ন্যাস করিয়া সর্ব্ব জীব উদ্ধারিতে ॥[৪২]

চৈ. ভা-মধ্য/২৮/৬২-৬৩

অপরের উপকারের মাধ্যমে জন্ম সার্থক করার ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের শিক্ষা:

সমগ্র প্রাণি জগতের মধ্যে মানবই শ্রেষ্ঠ। কারণ মানুষের বুদ্ধি আছে। সে জ্ঞান অর্জন করে অপরের উপকার করে নিজের জন্মকে সার্থক করতে পারে, যা মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মানুষই শ্রেষ্ঠ। শুধু মনুষ্য জন্ম লাভ করে নিজের স্বার্থ ও উন্নতি নিয়ে চিন্তা করলেই হবে না, অন্যের মঙ্গলের জন্য নানাবিধ কর্ম করতে হবে। যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা মন, বাক্য, দেহ, প্রাণ ও অর্থ দ্বারা অপরের উপকারার্থে কর্ম করে থাকেন। তাদের জন্ম সার্থক। তাই চৈতন্যদেব সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, অপরের উপকারের মাধ্যমে এ দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক করতে হবে। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।

জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥[৪৩]

চৈ. চ. আদি/৯/৪১

গুণ্ডিচা মন্দির মার্জনের দ্বারা মন ও হৃদয় শোধনে চৈতন্যদেবের শিক্ষা:

চৈতন্যদেব রথযাত্রার পূর্বে নিজে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন করার জন্য রাজ পুরোহিত কাশীমিশ্র ও রাজসভা পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিলেন। চৈতন্যদেব ও তাঁর সঙ্গী-পার্ষদদের নিয়ে মার্জনী দ্বারা ও ঘটে জল দিয়ে মন্দিরের ভিতর-বাহির, নাট মন্দির, সিংহাসন নিজবস্ত্র দ্বারা ধৈত করেন। মন্দির মার্জনা করার অর্থ নিজের হৃদয় ও মনের শোধন করা। তাই মন্দির মার্জনার শেষে সবাইকে লক্ষ করে বললেন– এখন মন্দিরের পরিবেশ নির্মল, স্নিগ্ধ ও শীতল বলে মনে হয়। ঠিক এইভাবে নিজের মন ও হৃদয় শোধন করা হলে স্নিগ্ধ, নির্মল ও শীতল বলে মনে হবে। এইভাবে চৈতন্যদেব নিজে আচরণ করে সবাইকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জন।

মহাপ্রভু নিজ-বস্ত্রে মার্জিলেন সিংহাসন ॥

শত ঘট জলে হৈল মন্দির- মার্জন।

মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন ॥
নির্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥
এইমত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্মল কৈল যেন নিজ মন ॥[৪৪]
চৈ. চ. মধ্য/১২/১০১-১০৩, ১৩০

চৈতন্যদেবকে ব্রাহ্মণের অভিশাপ প্রদান এবং পরিবর্তে ব্রাহ্মণকে চৈতন্যদেবের ক্ষমা প্রদান:

নদীয়ায় চৈতন্যদেব রাত্রে গৃহের মধ্যে নৃত্যকীর্তন করতেন। এক ব্রাহ্মণ জানতে পেরে চৈতন্যদেবের অপূর্ব নৃত্য দর্শন আকাঙ্খায় গৃহে প্রবেশের চেষ্টা করলে দ্বার রক্ষক ব্রাহ্মণকে বাধা প্রদান করলে তিনি মনকষ্টে নিজ গৃহে ফিরে যান। পরের দিন গঙ্গা ঘাটে স্নানের সময় চৈতন্যদেবের সঙ্গে ব্রাহ্মণের দেখা হলে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে চৈতন্যদেবকে অভিশাপ দিয়ে বললেন– 'তোমার দ্বাররক্ষী যেমন আমাকে নৃত্য দর্শনের জন্য দ্বারে প্রবেশ করতে দেয়নি, ঠিক তেমনি তুমিও এই সংসারে থাকতে পারবেনা, তোমার সংসার নাশ হবে'। এই বলে উন্মত্তের ন্যায় উপবীত ছিন্ন করেন। চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণের এই অভিশাপ শ্রবণ করে আনন্দিত মনে বললেন– তোমার অভিশাপ যেন আমার জীবনে বর হয়। চৈতন্যদেবের সহাস্য স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ও বচনে ব্রাহ্মণ আত্মঅনুশোচনায় ক্ষমা ভিক্ষার জন্য চৈতন্যদেবের চরণে পতিত হলে চৈতন্যদেব সস্নেহে আলিঙ্গন করে তাঁকে ক্ষমা করে প্রেম প্রদান করেন। এই হচ্ছে চৈতন্যদেবের অকৃত্রিম প্রীতির শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যমঙ্গলে* বর্ণনা করা হয়েছে–

তোর নৃত্য দেখিবারে বড় ছিল সাধ।
পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এক তাতে দিল বাধ ॥
না দিল যাইতে মোরে বাহির-দুয়ারে।
তেমনি বাহির তুমি হইবে সংসারে ॥
ইহা বলি' উপবীত ছিণ্ডিলেক ক্রোধে।
ক্রোধে অচেতন বিপ্র– নাহি পরবোধে ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু হরিষ অন্তর।
ব্রাহ্মণের শাপ মোরে বড় হৈল বর ॥
শুনিঞা পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
তুলিয়া ত মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গনে ॥[৪৫]
চৈ. ম. মধ্যখণ্ড/৮/৫২-৫৪, ৫৬, ৬৫

চৈতন্যদেবের স্কন্ধে আরোহণ করে উড়িয়া স্ত্রীলোকের জগন্নাথ দর্শন:

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে চৈতন্যদেব লোকের ভিড়ের কারণে দূর থেকে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করেছিলেন। তখন উড়িয়ার এক স্ত্রীলোক বহু লোকের ভিড়ের কারণে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে না পেরে গভীর আবেগে দর্শন

উৎকণ্ঠায় পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের গরুড় স্তম্ভে চড়ে চৈতন্যদেবের স্কন্ধে পা রেখে ভাবাবেশে অপলক নেত্রে জগন্নাথ দর্শন করছিল। তখন চৈতন্যদেবের সেবক গোবিন্দ এই দৃশ্য দর্শন করে সেই স্ত্রীলোকটিকে সেখান থেকে নামাবার চেষ্টা করলে চৈতন্যদেব গোবিন্দকে নিষেধ করলেন। সেই স্ত্রীলোকটি প্রথমে দর্শন উৎকণ্ঠায় এবং পরে দর্শনের তন্ময়তার কারণে বুঝতে পারেনি যে– চৈতন্যদেবের স্কন্ধে পা দিয়ে জগন্নাথ দর্শন করছে। পরে স্ত্রীলোকটি বুঝতে পেরে দ্রুত নেমে অপরাধের অনুশোচনায় চৈতন্যদেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে প্রার্থনা করল। চৈতন্যদেব স্ত্রীলোকটির আর্তি দেখে বললেন– এই নারীর জগন্নাথ দেবের প্রতি এত ভক্তি আছে, যা জগন্নাথ আমার মধ্যে দেননি। এই নারী জগন্নাথদেবকে তার তনুমন দিয়ে এতই গভীরভাবে ভাবাবিষ্ট যে, তিনি গরুড়স্তম্ভে এক পা এবং আমার কাঁধে অপর পা দিয়েছেন, কিন্তু তার কোন বাহ্য জ্ঞান নাই। এই কথা বলে তিনি সেই স্ত্রীলোকটির প্রশংসা করে বললেন যে– তিনি মহাভাগ্যবতী। তার প্রসাদে যদি জগন্নাথে আমার আর্তি জন্মে– এই বলে স্ত্রীলোকটির চরণ বন্দনা করলেন। এখান থেকে চৈতন্যদেব শিক্ষাদান করলেন যে, ভক্তের অকৃত্রিম ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। নারী বা পুরুষ কি? হৃদয়ে শুদ্ধ ভক্তি থাকলে অজান্তে ভগবৎ দর্শনে কোন অপরাধ হলে কোন ক্ষতি নেই। কারণ জগতের নাথকে দেহমন অর্পণ করে দিয়ে তিনি জগন্নাথ দর্শন আকাঙ্ক্ষায় গরুড় স্তম্ভে ও চৈতন্যদেব একজন সন্ন্যাসী হলেও, তাঁর স্কন্ধে পা দিয়ে জগন্নাথ দর্শন করছেন। এটি ভক্তিভাবের উচ্চ পর্যায়। কত লোক জগন্নাথ দর্শনে আসে। কতজনার এই স্ত্রীলোকের মত অবিচল একনিষ্ঠ ভক্তির তন্ময়তা আছে? চৈতন্যদেব যেখানে সন্ন্যাস ধর্মের কারণে স্ত্রীলোক থেকে দূরে থাকতেন, সেখানে তিনি জগন্নাথের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন এবং নিজে তার নিকট ভক্তির প্রার্থনা করেছেন।[৪৬] এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

আস্তে-ব্যস্তে সেই নারী ভূমেতে নামিলা।
মহাপ্রভুরে দেখি' তাঁর চরণ বন্দিলা ॥
তার আর্তি দেখি, প্রভু কহিতে লাগিলা।
"এত আর্তি জগন্নাথ মোরে নাহিদিলা !
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে, তাহা নাহি জানে ॥
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্তি আমার বা হয়! "[৪৭]
চৈ. চ. অন্ত্য/১৪/২৭-৩০

জগদানন্দ পণ্ডিতের বিষয় ভোগের অভিলাষ পরিত্যাগে চৈতন্যদেবের শিক্ষা:

চৈতন্যদেবের পার্ষদ ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন জগদানন্দ পণ্ডিত। চৈতন্যদেবের সকল প্রকার সুখ-দুঃখের চিন্তা করতেন জগদানন্দ। তিনি গৌড় থেকে চন্দন মিশ্রিত এক কলস সুগন্ধি তেল অনেক কষ্ট করে পুরীতে নিয়ে

আসেন। জগদানন্দের ইচ্ছা চৈতন্যদেব এই তেল মস্তকে ব্যবহার করলে বায়ু-কফ-পিত্ত জনিত রোগ দূর হয়ে যাবে। কিন্তু চৈতন্যদেব সর্বত্যাগী আশ্রম সন্ন্যাসী। তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে সন্ন্যাস ধর্ম পালন করেন। সন্ন্যাসীর জন্য এই সুগন্ধি তেল ব্যবহার নিষিদ্ধ। কেননা শুভ্র বস্ত্রে কালো দাগ যেমন দৃশ্যমান, তেমনি সন্ন্যাসীর সামান্য সুখে তাঁর আশ্রম ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন হবে। মস্তকে সুগন্ধি তেল ব্যবহারে মানুষ তাঁকে দারী সন্ন্যাসী বলে উপহাস করবে। তাই জগদানন্দের এ রাজসিক সুখের অভিলাষ তিনি মনে প্রাণে পরিত্যাগ করেন। তাঁর জীবন দর্শন ছিল- 'নিজে আচরি ধর্ম জীবকে শিখায়।' এ বিষয়ে *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাওয়া যায়–

প্রভু কহে,– "সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল,–পরম ধিক্কার!

* * *

পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাবে।
'দারী সন্ন্যাসী' করি' আমারে কহিবে ॥[৪৮]

চৈ. চ. অন্ত্য/১২/১০৮, ১১৪

চৈতন্যদেবের স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের শিক্ষা :

চৈতন্যদেব ৪৮ বৎসর প্রকটকালীন সময়ের মধ্যে দার্শনিক বিষয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, রামানন্দ রায়, রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে গভীরভাবে শাস্ত্র আলোচনা করেছেন। শেষ ১২ বৎসর তিনি পুরীতে জগতের মঙ্গলের জন্য তাঁর শিক্ষার সারমর্ম রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের নিকট প্রকাশ করেন এবং আটটি শ্লোক রচনা করেন। তাই *শিক্ষাষ্টক* নামে পরিচিত। এই আটটি শ্লোকের মধ্যে চৈতন্যদেবের সমগ্র দর্শনের সারতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। চৈতন্যদেব তাঁর রচিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে নাম সংকীর্তনের জয়যাত্রা ঘোষণা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর *চৈতন্যচরিতামৃতের* অন্তে চৈতন্যদেবের *শিক্ষাষ্টক* সংকলিত করেন এবং তার ভাবার্থ প্রকাশ করেন। যথা–

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ ॥[৪৯]

চৈ. চ. অন্ত্য/২০/১২

অর্থাৎ– কৃষ্ণ নামসংকীর্তন হচ্ছে চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী, সংসার সমুদ্ররূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাপনকারী। সমস্ত জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণকারী এটি বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দ সমুদ্রের ন্যায় সতত বর্ধনকারী, প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্বাদনস্বরূপ এবং সর্বাত্মক তৃপ্তিজনক, তাই সেই নামসংকীর্তন সর্বোৎকর্ষের

সঙ্গে জয়লাভ করুক।[৫০] চৈতন্যদেবের নাম সংকীর্তনের বিজয় যাত্রা সম্পর্কে শ্রীতারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী *মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব* (নীলাচল লীলা) গ্রন্থে *চৈতন্যচরিতামৃতের* উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যথা–

সঙ্কীর্তন যজ্ঞ করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
নামসঙ্কীর্তন হৈতে সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস ॥

চৈতন্যদেব কলিযুগে সবার জন্য সকল অবস্থায় নাম সংকীর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন। নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে সকল প্রকার অনর্থের নাশ হবে এবং হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেমের উন্মেষ ঘটবে, এটিই কলিযুগের শাস্ত্রবিহিত একমাত্র ধর্ম। জ্যোৎস্না রাত্রে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম যেভাবে বিকশিত হয়ে স্নিগ্ধ হাস্যে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনিভাবে নামসংকীর্তনের দ্বারা বদ্ধ জীবের হৃদয় স্ফটিকের মতো আলোকিত হয় এবং কৃষ্ণ প্রেমের আনন্দ ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয়।[৫১] *শিক্ষাষ্টকের* ২য় শ্লোক হচ্ছে–

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

অর্থাৎ– হে ভগবান! তোমার বহু নাম রয়েছে, প্রতিটি নামে তুমি সর্বশক্তি প্রদান করেছ। সেই নাম নিয়মিত স্মরণ করার জন্য কালাকাল বিচার করনি। তুমি জীবের কল্যাণের জন্য এরূপ করুণা বিতরণ করার পরেও দুর্দৈব এইরূপ যে, সেই দুর্লভ নামচিন্তামণির প্রতি আমার অনুরাগ জন্মেনি। এই শ্লোক প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করেছেন–

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল, দেশ, নিয়ম, নাহি, সর্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব–নামে নাহি অনুরাগ![৫২]

চৈ. চ. অন্ত্য/২০/১৭-১৯

এই কৃষ্ণ নাম অভেদতত্ত্ব। সচ্চিদানন্দ প্রকাশের ২টি দিক রয়েছে, একটি স্বরূপে অপরটি নামরূপে। এ সম্বন্ধে শ্রীতারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী *মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব* (নীলাচল লীলা) গ্রন্থে *পদ্মপুরাণের* উদ্ধৃতি দিয়েছেন–

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

অর্থাৎ– নাম-চিন্তামণি স্বরূপ কিন্তু নামী কৃষ্ণ অভিন্নতাবশত চৈতন্যরস বিগ্রহস্বরূপ এবং এই নাম পূর্ণশুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত। তাই চৈতন্যদেবের শিক্ষা অনুসারে ঈশ্বরের যে কোন নাম যে কোন সময় স্মরণ-কীর্তন করলে জীবের

পরম মঙ্গল হবে। তাঁর নাম ধরে ডাকলে এক সময় তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে।[৫৩] চৈতন্যদেবের *শিক্ষাষ্টকে* বর্ণিত ৩য় শ্লোক হচ্ছে–

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

অর্থাৎ– যিনি তৃণের থেকেও নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করেন, তরুর থেকেও সহিষ্ণু হন, নিজে মানহীন হয়েও অন্যকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তিনিই সর্বদা হরিনাম করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর অনূদিত *শিক্ষাষ্টক* গ্রন্থে *চৈতন্যচরিতামৃত* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন–

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয় ॥

* * *

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি, 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান ॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥[৫৪]

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর *শিক্ষাষ্টকের* উক্ত শ্লোকের তাৎপর্যে *ভাগবতের* ২/১/১১ শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন–

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥

অর্থাৎ–হে রাজন! বিশ্বসংসারে যাঁরা মহান একনিষ্ঠ ভক্ত, যাঁরা মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁরা আত্মারামযোগী পুরুষ সবার পক্ষেই শ্রীহরির নাম শ্রবণ ও কীর্তন–এটি পরমার্থে সাধন ও সাধ্য বলে নির্ণীত হয়েছে।[৫৫] *শিক্ষাষ্টকের* চতুর্থ শ্লোক–

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

অর্থাৎ– হে জগদীশ! আমি অর্থ, জনবল বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা যে, জন্ম-জন্মান্তরে যেন তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি লাভ হয়। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

"ধন, জন নাহি মাগোঁ, কবিতা সুন্দরী।
'শুদ্ধভক্তি' দেহ' মোরে, কৃষ্ণ! কৃপা করি' ॥
অতিদৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি-দান।
আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমান ॥[৫৬]

চৈ. চ. অন্ত্য/২০/৩০-৩১

শিক্ষাষ্টকের ৫ম শ্লোক –

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

অর্থাৎ– হে নন্দপুত্র শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমার নিত্যভৃত্য, কর্মফলস্বরূপ বিষময় ভবমহাসমুদ্রে পতিত হয়েছি। অনুগ্রহ করে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিকণা সদৃশ চিন্তা কর। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করেছেন–

"তোমার নিত্যদাস মুই, তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥
কৃপা করি 'কর মোরে পদধূলি-সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥"[৫৭]

চৈ. চ. অন্ত্য/২০/৩২-৩৪

শিক্ষাষ্টকের ৬ষ্ঠ শ্লোক–

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

অর্থাৎ– হে প্রাণনাথ! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়ন থেকে অশ্রু ঝরে পড়বে? বাক্ রুদ্ধ হয়ে গদগদ স্বর ধ্বনিত হবে এবং আমার সর্বাঙ্গ আনন্দে পুলকিত হবে?[৫৮] এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাওয়া যায়–

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
'দাস' করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥"
রসান্তরাবেশে হইল বিয়োগ-স্ফুরণ।
উদ্বেগ, বিষাদ, দৈন্যে করে প্রলাপন ॥[৫৯]

চৈ. চ. অন্ত্য/২০/৩৭-৩৮

শিক্ষাষ্টকের ৭ম শ্লোক–

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥

অর্থাৎ– হে গোবিন্দ! তোমার বিরহে এক নিমেষ আমার নিকট এক যুগ বলে মনে হচ্ছে, নয়ন থেকে বর্ষার ধারার মতো অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে এবং বিশ্বজগৎ শূন্যময়– এইরূপ মনে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ'-সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥

গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।

তুষানলে পোড়ে,– যেন না যায় জীবন ॥[৬০]

চৈ. চ. অন্ত্য/২০/৩৯-৪১

শিক্ষাষ্টকের শেষ শ্লোক–

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

অর্থাৎ– এই পাদরতা দাসীকে তিনি আলিঙ্গন দ্বারা পেষণ করুক বা দর্শন না দিয়ে মর্মাহত করুক, সে লম্পট পুরুষ যেমনই আমার প্রতি বিধান করুক না কেন, সে অন্য কেউ নয়। সেই আমার প্রাণনাথ।[৬১] এ প্রসঙ্গে তারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী *মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব* (নীলাচল) গ্রন্থে *চৈতন্যচরিতামৃতের* উদ্ধৃতি দিয়েছেন–

আমি কৃষ্ণপদ দাসী তেহো রসসুখরাশি।

আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।

কিবা না দেয় দরশন জারেন আমার তনুমন।

তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥[৬২]

চৈতন্যদেবের রচিত এই শিক্ষাষ্টকের শ্লোকগুলো বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় যে, প্রথম শ্লোকে চৈতন্যদেব কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তনের জয়গান গেয়েছেন। এটি একমাত্র সাধনার পথ। ২য় শ্লোকে নাম ও নামী অভেদ বস্তু, নিষ্ঠার মাধ্যমে সাধনে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়। ৩য় শ্লোকে হরিনাম কীর্তনের অধিকারী সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এখানে শুধু দৈন্যের আবৃতি অভিনয় করলে হবে না। অভিমান, গর্ব শূন্য হয়ে মনের মধ্যে প্রকৃত দৈন্য ও বিনয়ের প্রকাশ ঘটাতে হবে। ৪র্থ শ্লোকে বিশ্ব জগতের জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনিত্যতার আত্মোপলব্ধিতে পরম করুণাময়ের নিকট অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা করা হয়েছে। ৫ম শ্লোকে বিষময় সংসাররূপ ভবসমুদ্র থেকে উদ্ধারের জন্য হৃদয়ের করুণাত্মক আহাজারি, যা দাস্যভাবের অনন্য শিক্ষা। ৬ষ্ঠ শ্লোকে ঈশ্বরের নাম স্মরণে অষ্টসাত্ত্বিকভাবের আকাঙ্ক্ষার নিমিত্তে উৎকণ্ঠা। কারণ উৎকণ্ঠা বা ব্যকুলতাই হচ্ছে ভক্তির প্রাণশক্তি। ভক্তির উৎকণ্ঠা দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এটি চৈতন্যদেবের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিক। সপ্তম শ্লোকে গোবিন্দ বা কৃষ্ণ বিরহের সর্বোত্তম ভাব প্রকাশিত হয়েছে। চৈতন্যদেব নিজ জীবনে গোবিন্দ বিরহের সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করে সাধন করেছেন। গোবিন্দ বিরহে সবকিছু শূন্যময়। অষ্টম শ্লোকে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত মাধুর্যরসের ভাব প্রকাশিত হয়েছে। বৃন্দাবনে রাধারাণী কৃষ্ণকে লাভ করার জন্য যে মহাভাবের স্তরে সাধন করেছেন চৈতন্যদেবও সেই ব্রজরসের সর্বোত্তম অবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন। সেই প্রাণনাথ যতই আমাকে দুঃখ-কষ্ট দিক না কেন তিনি শুধু আমারই প্রাণনাথ। শিক্ষাষ্টকের তাৎপর্যের শেষে বলা যায় যে, নির্মল প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, প্রেম ছাড়া সবই নিস্ফল। প্রেমেই মহানন্দ লাভ এবং ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়। তাই প্রেমলাভে প্রয়াসী হওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এটি হচ্ছে চৈতন্যদেবের শিক্ষার সারমর্ম।[৬৩]

চৈতন্যদেবের সারশিক্ষা:

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর অনূদিত *শিক্ষাষ্টক* গ্রন্থে *চৈতন্যভাগবতের* উদ্ধৃতি দিয়ে চৈতন্যদেবের শিক্ষার কথা বর্ণনা করেছেন–

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"
"প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥"
চৈ. ভা

তাই চৈতন্যদেবই এই যুগে এমন সরল বিধান প্রদান করেছেন যে, একমাত্র মহামন্ত্র জপকীর্তনে সিদ্ধি লাভ হবে। তিনি পূর্ণরূপে বিধিনিষেধ উঠিয়ে দিয়েছেন। চৈতন্যদেব আরও বলেছেন যে, একমাত্র কৃষ্ণকে লাভ করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নাম সংকীর্তন। কেননা এর মাধ্যমেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। এ বিষয়ে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর অনূদিত *শিক্ষাষ্টক* গ্রন্থে *চৈতন্যচরিতামৃতের* উদ্ধৃতি দিয়েছেন–

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥"
চৈ. চ.

তাই চৈতন্যদেব এই যুগে হরিনাম সংকীর্তন যে মানুষের উদ্ধারের একমাত্র পথ বলে নির্দেশ করেছেন, সে বিষয়ে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর অনূদিত *শিক্ষাষ্টক* গ্রন্থে বৃহন্নারদীয় পুরাণের উদ্ধৃতি দিয়েছেন –

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

তাই চৈতন্যদেবের শিক্ষার মূল তাৎপর্য হচ্ছে– তাঁর শিক্ষার অনুসারীকে অত্যন্ত বিনয়ী, সহিষ্ণু ও নিজে মানহীন হয়েও অন্যকে সম্মান দিয়ে এই নামকীর্তনের নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে। সেটিই চৈতন্যদেবের শিক্ষার উল্লেখযোগ্য বিষয়, যা *শিক্ষাষ্টকের* ৩য় শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে–

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"[৬৪]

চৈতন্যদেবের অন্ত্যজীবনে গম্ভীরা লীলার ক্ষেত্রে শিক্ষা:

কৃষ্ণ বিরহে চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদভাব:

সন্ন্যাস পরবর্তী ২৪ বৎসরের মধ্যে ১২ বৎসর চৈতন্যদেব অন্তরঙ্গ পার্ষদসঙ্গে গম্ভীরা লীলা করেছেন। তিনি পুরীতে একান্তে কৃষ্ণলীলা ভাবনায় গভীরভাবে নিমগ্ন ছিলেন। কৃষ্ণ বিরহে তিনি উন্মাদের মতো প্রলাপ করতেন। তবে সেটি ছিল দিব্যোন্মাদভাব। এইরূপ অবস্থায় স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায় তাঁকে শান্ত করতেন। স্বরূপ দামোদর চৈতন্যদেবের ভাব অনুসারে জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*, চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির পদ মধুর সুরে গাইতেন এবং রামানন্দ রায় ভাবরসের অবস্থা অনুসারে *ভাগবত*, *কৃষ্ণকর্ণামৃত* ও *জগন্নাথবল্লভ* নাটকের শ্লোক শ্রবণ করিয়ে তাঁকে শান্ত করতেন। কখনো শুধু হরিনাম কীর্তনের মাধ্যমে তাঁর বাহ্য চেতনা ফিরিয়ে আনতেন। চৈতন্যদেব রাত্রিতে বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে স্বপ্নে দর্শন করলে স্বপ্নভঙ্গের পরে কৃষ্ণ বিরহে উন্মাদের মতো প্রলাপ করতেন। রাত জেগে কৃষ্ণ লীলা আস্বাদন, নৃত্য ও গীত করতেন এবং উচ্চৈঃস্বরে নামসংকীর্তন করতেন। এইভাবে তিনি কৃষ্ণ বিরহে পাগলের মতো আচরণ করতেন। কিন্তু সেটি সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। সেটি ছিল তাঁর দিব্যোন্মাদভাব। চৈতন্যদেবের প্রলাপ সম্বন্ধে *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাওয়া যায়–

এতেক প্রলাপ করি,' প্রেমাবেশে গৌরহরি।
সঙ্গে লঞা স্বরূপ-রামরায় ॥
কভু নাচে, কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্ছা যায়।
এই রূপে রাত্রি-দিন যায় ॥[৬৫]

চৈ. চ. অন্ত্য/১৬/১৫০

তথ্যসূত্র :

১. সনৎ কুমার নস্কর 'ভক্তিবাদী ধারায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও তার অনুশাসন' *প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা*: বিশেষ সংখ্যা-২০২১, অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য গবেষণা কেন্দ্র, সংস্কৃত বিভাগ, ঢা. বি. পৃ. ৮৫-৮৬
২. ঐ. পৃ. ৮৭-৮৯
৩. ঐ. পৃ. ৮৯-৯১
৪. ঐ. পৃ. ৯১-৯২
৫. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, নদীয়া, ১ম সংস্করণ, ৮ই মার্চ, ১৯৯৩, পৃ. ২১-২২
৬. ঐ. পৃ. ২০
৭. ড. সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১৭৯
৮. সনৎ কুমার নস্কর 'ভক্তিবাদী ধারায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও তার অনুশাসন' *প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা*: বিশেষ সংখ্যা-২০২১, পৃ. ৯৩
৯. শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী সম্পাদিত *শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ২১ মার্চ, ২০০৮, পৃ. ৫
১০. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ১৩৮
১১. ঐ. পৃ. ২৫৯

১২. সনৎ কুমার নস্কর 'ভক্তিবাদী ধারায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও তার অনুশাসন' *প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা*, পৃ. ৯৫-৯৬
১৩. ঐ. পৃ. ১০২
১৪. শ্রীমদ্ভভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ২৪৩
১৫. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্য (২য় খণ্ড), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪২২, পৃ. ১০৯১
১৬. সনৎ কুমার নস্কর, ঐ. পৃ. ১০২
১৭. ড. লায়েক আলি খান, *প্রসঙ্গঃ বৈষ্ণব সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১ম দে'জ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ২০৩- ২০৫
১৮. ঐ. পৃ. ২৯৭-২৯৮
১৯. সনৎ কুমার নস্কর, ঐ. পৃ. ১০২-১০৩
১৯ক). শ্রীমদ্ভভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ৩৫৬
২০. শ্রীমদ্ভভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, নদীয়া, ২য় সংস্করণ, ২৩ মার্চ, ২০১৬, পৃ. ৯৯
২১. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, দ্বাদশ সংস্করণ, ২০১৬ পৃ. ৮১৮
২২. সনৎ কুমার নস্কর, ঐ. পৃ. ৭৫
২৩. ঐ. পৃ. ৯৬-৯৮
২৪. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, পৃ. ৬১০-৬১৩
২৫. শ্রীমদ্ভভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, পৃ. ৯৪
২৬. ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল, 'শ্রীচৈতন্য স্মরণে' *পরেশ চন্দ্র মণ্ডল রচনা-সংকলন*, অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য গবেষণা কেন্দ্র, সংস্কৃত বিভাগ, ঢা. বি. ১ম প্রকাশ, জুন-২০২১, পৃ. ২৫৯
২৭. ঐ. পৃ. ২৬২-২৬৩
২৭ক). শ্রীমদ্ভভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, পৃ. ২২৮
২৮. ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল, 'হিন্দুধর্ম ও মানবতা' *পরেশ চন্দ্র মণ্ডল রচনা-সংকলন*, পৃ. ৩৮৬
২৯. শ্রীমদ্ভভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, পৃ. ২৩২
৩০. শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী, *শ্রীচৈতন্য ভাগবত*, ইসকন, মায়াপুর, নদীয়া, ১ম সংস্করণ, ২০০৭, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮
৩১. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, পৃ. ২৬৮-২৭৪
৩২. ঐ. পৃ. ২৭৬-২৭৯
৩৩. ঐ. পৃ. ৯৮-১০৮
৩৪. ঐ. পৃ. ৫৮৬-৫৮৮
৩৫. শ্রীমদ্ভভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ ৪৫
৩৬. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, পৃ. ৩০৮-৩০৯
৩৭. ঐ. পৃ. ৩৫৪-৩৫৫
৩৮. ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল, 'শ্রীচৈতন্য স্মরণে' *পরেশ চন্দ্র মণ্ডল রচনা-সংকলন*, পৃ. ২৫৯-২৬১
৩৯. শ্রীমদ্ভভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত* ঐ. পৃ. ১২১-১২২
৪০. শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী, *শ্রীচৈতন্য ভাগবত*, পৃ. ১৭৪-১৭৮
৪১. ঐ. পৃ. ৪০২-৪০৩
৪২. ঐ. পৃ. ৪১১
৪৩. শ্রীমদ্ভভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ৫৩
৪৪. ড. বিধানচন্দ্র বিশ্বাস, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ভারত, ১৩ম পূনর্মুদ্রণ, ২০১৯ পৃ. ২৯৫-৯৬
৪৫. শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপভাগবত মহারাজ সম্পাদিত *শ্রীচৈতন্যমঙ্গল*, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলকাতা, ২৮ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ১২৮, ১২৯
৪৬. শ্রী তারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী, *মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব* (নীলাচল লীলা), শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির, নদীয়া, ১ম প্রকাশ, জন্মাষ্টমী ২০১২, পৃ. ১২৯৬-১২৯৮
৪৭. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, পৃ. ৬২৭-৬২৮
৪৮. ঐ, পৃ. ৫৭৩-৫৭৫
৪৯. ঐ, পৃ. ৮১৬
৫০. ঐ, পৃ. ৮১৬
৫১. শ্রীতারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী, *মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব* (নীলাচল লীলা), পৃ. ১৩৯২-১৩৯৬
৫২. শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ সম্পাদিত, *শ্রীশিক্ষাষ্টক*, মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, নদীয়া, ৮ম সংস্করণ, ১২ নভেম্বর ২০১৫, পৃ. ১৩-১৪
৫৩. শ্রীতারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী, *মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব* (নীলাচল লীলা) পৃ. ১৪০০-১৪০১
৫৪. শ্রীমৎ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ, *শ্রীশিক্ষাষ্টক*, পৃ. ১৯
৫৫. ঐ. পৃ. ২৩

৫৬. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, পৃ. ৮২১-৮২২
৫৭. ঐ. পৃ. ৮২২
৫৮. শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ, *শ্রীশিক্ষাষ্টক*, পৃ. ৩৩
৫৯. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, পৃ. ৮২৩
৬০. ঐ. পৃ. ৮২৪
৬১. শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ, *শ্রীশিক্ষাষ্টক*, পৃ. ৪৩
৬২. শ্রীতারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী, *মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব* (নীলাচল লীলা), পৃ. ১৪১৯-১৪২০
৬৩. ঐ. পৃ. ১৪১৫-১৪১৬, ১৪২৬-১৪২৭
৬৪. শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ, *শ্রীশিক্ষাষ্টক*, পৃ. ৫২
৬৫. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, পৃ. ৭২৩

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যদেবের সমাজসংস্কার ও সমাজকল্যাণ

সমাজ সংস্কার:

হিন্দু সমাজে কঠোর জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা ছিল। এছাড়া বাল্য বিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, বিধবা বিবাহ নিষেধ, বাল্য-বিধবার দুর্দশা ও কঠোর জীবনযাত্রা, সতীদাহ, স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অনধিকার প্রভৃতি ছিল। এ সকল কারণে সমাজের মানুষ দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করত।[১]

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের বসবাস ছিল। পাশাপাশি বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক ছোট ছোট দল গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধদের মধ্যে আবার সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং বৈষ্ণবদের মধ্যেও সহজিয়া সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তান্ত্রিক সম্প্রদায় সমাজে সবচেয়ে প্রবল ছিল । তাদের মধ্যে আবার মতভেদ ছিল। যেমন– বেদাচারী, শৈবাচারী, বৈষ্ণবাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, সিদ্ধান্তাচারী, কৌলাচারী প্রভৃতি। এই সকল তান্ত্রিক সম্প্রদায় ধর্মের নামে বীভৎস আচরণ করে সমাজে উৎপাতের সৃষ্টি করত। যেমন– তারা নগ্ন হয়ে স্ত্রী-পুরুষ একসাথে মৃতদেহের উপরে বসে মৃতের মাথার খুলিতে সুরা পান করত। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি। এই সমাজ ধ্বংসকারী তান্ত্রিকদের সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় মিলিত হয়। ধর্মের প্রকৃত সাধন চর্চা না করে তারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য মনগড়া পথ প্রবর্তন করে এবং শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা দিয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হত। এই সহজিয়া সম্প্রদায় আবার বহু শাখায় বিভক্ত ছিল। যথা– আউল, বাউল, শাই, দরবেশ, নেড়া প্রভৃতি। এছাড়া সখীভাবক, কিশোরী, কর্তাভজা, গৌড়বাদী, ভজনী, জগন্মোহিনী, রাম বল্লভি, পাগলনাথি, গোবরাই, সাহেবধানী প্রভৃতি সম্প্রদায় ছিল। এসকল সম্প্রদায় শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত না মেনে নিজেদের ইচ্ছামত নিয়ম তৈরি করে অশাস্ত্রীয় ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন করে সমাজের সর্বাত্মক ধ্বংসলীলায় মত্ত হত।

কিন্তু চৈতন্যদেব সমাজের এই বীভৎসরূপ দর্শন করে সমাজের জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর যুদ্ধ করেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে এই প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় একমাত্র স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও প্রেমভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বজনীন ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। "আমার ও আমার সেবকদের কোন জাতি নাই"[২] – তিনি সর্বত্র অটল নির্ভীকতার সঙ্গে এই কথা প্রচার করেন। তিনি মনে করেছিলেন, সমাজ সংস্কার করে জাতিভেদ প্রথা থেকে সমাজকে মুক্ত না করলে সবাইকে একই পতাকাতলে আনা সম্ভব হবে না। জাতিভেদের কারণে হিন্দু ধর্মের নিম্ন বর্ণের মানুষেরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল।

চৈতন্যদেব ধর্ম চর্চার জন্য সকলকে সমান অধিকার প্রদান করেন। তিনি সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে সমাজের বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ও নীচু বর্ণকে অর্থাৎ সকলকে প্রীতির মাধ্যমে একই পতাকাতলে এনেছিলেন। তিনিই সমগ্র ভারতবর্ষে প্রথম প্রেমের অভয় পতাকা উড্ডয়ন করে ঘোষণা দিয়েছিলেন 'চণ্ডালো ঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ'। সমাজের ইতর জাতির উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করলে সামাজিক খর্বতা হলেও হরিভক্তির হানি হয় না। যিনি হরিভক্তি পরায়ণ, তিনিই শ্রেষ্ঠ, এখানে জাতির কোন প্রশ্ন নেই। জাতিভেদ সংস্কারে তিনি ছাড়া কেউ এমন কথা বলেননি। তিনি ও তাঁর সঙ্গী এবং পার্ষদদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, কবি, বৈদান্তিক ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ভক্তগণকে এই ব্রাহ্মণ্যবাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে কৃষ্ণদাস বলে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি শূদ্র রামানন্দ রায়কে দিয়ে ভাগবত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়েছিলেন।

চৈতন্যদেবের শত শত ভক্ত বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য। তিনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কাশীর বেদান্ত সমাজের অগ্রণী প্রবোধানন্দ সরস্বতী, দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত কুলভূষণ, ঈশ্বর ভারতী প্রভৃতি পণ্ডিতদেরকে শাস্ত্র বিচারে পরাজিত করে তিনি তাঁর অসাধারণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের মাধ্যমে দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ভক্তিবাদ ও ভগবৎ প্রেমের প্রবর্তক ছিলেন। তিনি দেখেছিলেন "ফলস্য কারণং পুষ্পং ফলাৎ পুষ্পং বিনশ্যতি। জ্ঞানস্য কারণং শাস্ত্রং জ্ঞানাৎ শাস্ত্রং প্রণশ্যতি।" জ্ঞানের উদয়ের জন্য সব কিছু। তাই জ্ঞান ও ভক্তির ফল দুর্লভ প্রেম প্রাপ্ত হলে অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই।[৩]

চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির তরঙ্গ সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে হরিনাম সংকীর্তন ও রাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্তনের দ্বারা বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেমের ও ভক্তির বন্যায় প্লাবিত করলেন। এখানে হিন্দুধর্মের আচার-বিচার নিয়ম নীতির কোন আনুষ্ঠানিকতা ছিলনা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই অংশ গ্রহণ করতে পারত। সমাজের নিম্ন থেকে উচ্চ বর্গের সকলেই অর্থাৎ–স্ত্রীলোক, শূদ্র ও চণ্ডাল সবাইকে প্রেমের ধর্মে দীক্ষিত করে বিলুপ্ত ভগবৎ প্রেম হৃদয়ে জাগরিত করা তাঁর লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল। তিনি এইভাবে ধর্মের নামে অনাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করে সমাজ সংস্কার সাধন করে সমাজকে জাতিভেদ প্রথার বিষবৃক্ষ থেকে মুক্ত করেছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক হিসেবে বিশ্বে সকলের নিকট শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।[৪]

হোসেন শাহের সময় কায়স্থ ভূস্বামীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ার কারণে সমাজে তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কারণে ব্রাহ্মণদের প্রভাব কমতে থাকলে এইরূপ অবস্থায় রঘুনন্দন তাঁর 'শূদ্রাহ্নিকাচারতত্ত্বম্'-এ দ্বিজাতিতত্ত্ব নামে এক অদ্ভূত তত্ত্ব সমাজে প্রকাশ করেন। তাঁর ঘোষণা মতে সমাজে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া অন্য কোন বর্ণের অস্তিত্ব থাকবে না। শূদ্রদের প্রধান কাজ হচ্ছে ব্রাহ্মণদের সেবা করা। আরেকজন স্মার্ত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ যদি কোন শূদ্র নারীর সঙ্গে

ব্যভিচার করে থাকে, তাহলে ঐ ব্রাহ্মণের কোন দোষ হবে না। তবে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করে তবে শূদ্রের কঠোর দণ্ডভোগ করতে হবে। শূদ্ররা গুরু পদে থাকতে পারবে না। শূদ্রদের নিকট থেকে ব্রাহ্মণদের দান গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। সমাজে স্ত্রী লোকদের প্রকৃত ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্ত্রীলোকের বেদ পাঠের অধিকার ছিল না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের 'পাতিব্রত্য' ই ছিল সধবা স্ত্রীদের ধর্ম।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে নবদ্বীপ ছিল বাংলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। নবদ্বীপে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও শ্রেণিপেশার লোক বসবাস করত। নগরে-গ্রামে নিম্নবর্ণের লোক বসবাস করত। সমাজে দুর্নীতি ও চরিত্রহীনতা ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করেছিল। কেননা তখন সমাজে তান্ত্রিকদের বামাচার এবং মুসলমানদের উপ-পত্নী প্রথার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বাংলাতে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার উপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল এবং সমাজে ভয়ঙ্কর সংকট দেখা দিয়েছিল। বহু মানুষ এই সংকটে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। অনেক নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা তখন নিরূপায় হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। কেননা অনেক গাজী, পীর ও আমলারা হিন্দুদের নির্যাতন করেছিল। এ পরিস্থিতিতে সমাজের বর্ণ বিভাগের কঠোরতা, সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে জাতিভেদের বিষবাষ্প, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব, নব্য ন্যায়ের শুষ্ক পাণ্ডিত্য প্রভৃতির কারণে সমাজে ভয়ঙ্কর সংকট দেখা দিয়েছিল। প্রচলিত কোন ধর্মের বিধান দ্বারা বা কৌশল দ্বারা এর থেকে মুক্তির কোন বিকল্প পথ সমাজে ছিল না। এমনি বিষময় পরিস্থিতিতে চৈতন্যদেব হিন্দু সমাজ রক্ষার্থে তাঁর প্রেমভক্তি ধর্ম দ্বারা সপার্ষদসহ কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে বর্ণ বৈষম্য ও জাতিভেদ দূর করেছিলেন। এইভাবে তিনি নীচ-পতিত নারী-পুরুষদের উদ্ধার করে সমাজ সংস্কার করে মানবকল্যাণ করেছিলেন।[৫]

জাত-পাত বিরোধী হচ্ছে চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিধর্ম:

চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিধর্ম জাত-পাত বিচারের বিরোধী ছিল। তাঁর ধর্মে চণ্ডাল ও অস্পৃশ্যরাও মানুষ। তারাও ঈশ্বরের ভক্ত হতে পারে। কেননা *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

নীচজাতি হৈলে নহে ভজনে অযোগ্য।
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছাড়।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার ॥

মানুষের মনুষ্যত্বই হচ্ছে মানবের মূল্যবান সম্পদ। এটি ছিল চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের সিদ্ধান্ত। ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ। সবাইকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করা যায়। হৃদয়ে ভক্তি জাগ্রত হলে ঈশ্বরের স্মরণে তখন পাপ ও দুর্ভাগ্য দূর হয়ে থাকে, মন পবিত্র হয়, জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় এবং মননের ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষতা চলে আসে। কেননা জ্ঞান অর্জন হচ্ছে চেষ্টার ফল মাত্র। কিন্তু ভক্তি হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত। প্রেমভক্তি অনুশীলনের ফলে মানুষের অহমিকা বিলুপ্ত হয়ে থাকে। তাই চৈতন্যদেবের এই প্রেমভক্তি আন্দোলনকে তৎকালীন সমাজের বহুজাতিক লোক সমর্থন করেছিল। নিজ নিজ অধিকার রক্ষার জন্য বহু সম্প্রদায়ের লোক চৈতন্যদেবের দলে এসেছিল। তখন বহু ব্রাহ্মণ

সম্প্রদায় চৈতন্যদেবের ভক্তি ধর্মের দ্বারা সবকিছু ভুলে গিয়ে চৈতন্যদেবের ধর্ম গ্রহণ করেছিল। চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি ধর্ম জাত-পাতের বিরোধী ছিল বলেই বিভিন্ন জাত ও সম্প্রদায়ের লোক চৈতন্যদেবের ধর্মে আসতে পেরেছিল।[৬]

ব্রাহ্মণদের কুসংস্কার দূর করার জন্য ভক্তিধর্মের ভিত্তিতে চৈতন্যদেবের সাংগঠনিক কার্যক্রম:

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে সমাজের ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবদের ঘোর বিরোধী ছিল। বৈষ্ণবদের ধর্মকে উপহাসের চোখে দেখত। জ্ঞান-কর্মকাণ্ডের ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে ভক্তিধর্ম চর্চা করা এত সহজ ছিল না। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে।
ভক্তি হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে ॥
দেখিলে বৈষ্ণবমাত্র সবে উপহাসে।
* * *
আর্যাতর্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।

কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজের এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ চৈতন্যদেবের ভক্ত তৎকালীন বৈষ্ণব অগ্রগণ্য অদ্বৈত আচার্য মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দ্বিগম্বর হই সর্ব বৈষ্ণবেরে বোলে ॥
সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সবা লৈয়া ॥

এরূপ অশান্তিময় পরিবেশে চৈতন্যদেব আর্বিভূত হয়েছিলেন। সমাজ থেকে ব্রাহ্মণদের কুসংস্কার দূর করার জন্য চৈতন্যদেব তাঁর পার্ষদের সঙ্গে নিয়ে প্রেমভক্তি ধর্ম প্রচারের জন্য সংগঠন তৈরি করেছিলেন। তিনি এইরূপ সাংগঠনিক কার্যক্রমের দ্বারা কুসংস্কার দূর করার জন্য ও সমাজের কল্যাণের জন্য পতিতদের উদ্ধারের নিমিত্তে যে সকল কাজ করেছিলেন এ বিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল–

১। চৈতন্যদেবের যোগ্য নেতৃত্বে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে প্রভাবশালী বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠন করা হয়েছিল। সেখানে কোন জাতপাতের ভেদ ছিল না। চৈতন্যদেব সাধুসন্তদের ও কীর্তনীয়াদের সংগঠিত করেছিলেন।

২। তিনি ঘরে ঘরে নাম প্রচারের ব্যবস্থা করেন এবং প্রতি ঘরে নাম প্রচার করার জন্য নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে দায়িত্ব দেন।

৩। চৈতন্যদেব উচ্চ শ্রেণির ব্রাহ্মণ হয়েও সমাজের বিভিন্ন জাত-বর্ণের ও শ্রেণি-পেশার লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক করেছিলেন।

৪। চৈতন্যদেব বিশাল দলবল নিয়ে নদীয়ার নগর-গ্রামে শোভাযাত্রাসহ নগর সংকীর্তন করতেন। এখানে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করতে পারত।

৫। চৈতন্যদেব রাজনৈতিক ক্ষমতাধর দুই পাষণ্ড ও দুর্বৃত্তকে উদ্ধার করে তাঁর প্রেমধর্মের মহিমা প্রকাশ করেন।

৬। চৈতন্যদেবের বড় বিপ্লব হচ্ছে যে, তিনি নদীয়াবাসীদের নিয়ে বিশাল জনসমুদ্রতুল্য কীর্তনশোভাযাত্রা সহযোগে কাজীর নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন।

৭। চৈতন্যদেব ভক্তিধর্মের উপর নাটক মঞ্চস্থের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। তিনি রুক্মিণীর অভিনয় করে সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

চৈতন্যদেবের সংকীর্তন আন্দোলনে কোন আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপার ছিল না। ভক্তি থাকলে বৈদিক ক্রিয়াকর্মের কোন প্রয়োজন নেই। চৈতন্যদেবের এইরূপ প্রেমভক্তি ধর্মের কারণে সমাজে নুতন সংস্কৃতি তৈরি হয়। ফলে নুতন এক সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদের নব্যন্যায় ও জ্ঞানের শুষ্ক চর্চা মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু ভক্তি মানুষকে মানুষের কাছে টেনে নেয়। চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ্যবাদের জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডকে পাশকাটিয়ে ভক্তি দ্বারা জাতবর্ণের ভেদাভেদ অগ্রাহ্য করে সমাজে প্রেমভক্তিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ফলে সমাজে থেকে জাত-পাত-বর্ণ বৈষম্য দূর হয়েছিল। যার কারণে অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত স্ত্রীলোকেরা বৈষ্ণব ধর্মের উদারতার কারণে তাদের অধিকার ফিরে পেল। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এল। এইভাবে চৈতন্যদেব তাঁর পার্ষদদের নিয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের কুসংস্কার সমাজ থেকে দূর করে সমাজের কল্যাণ করেছিলেন।[৭]

অস্পৃশ্য-চণ্ডালসহ নিম্নবর্ণের মানুষের সমাজ জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় চৈতন্যদেবের সমাজসংস্কার ও সমাজকল্যাণঃ

চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি ধর্মের সুবাতাস নদীয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর কীর্তন শোভাযাত্রায় অস্পৃশ্য-চণ্ডাল দলে দলে যোগ দিয়েছিল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে হরিনাম সমুদ্রে অবগাহন করেছিল। চৈতন্যদেবের মানব মুক্তির আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষ সামিল হয়েছিল। চৈতন্যদেব সর্ব জীবের কল্যাণের জন্য এবং আর্তের সেবা করার ক্ষেত্রে হরিনামকেই মূলমন্ত্র হিসেবে সবাইকে পথ দেখালেন। জাত-বর্ণের ভেদাভেদ ঘুচে গেল। চৈতন্যদেবের এইরূপ আন্দোলনের ফলে নবদ্বীপ জনসমুদ্রে পরিণত হল। চৈতন্যদেবের জীবনী বাংলা সাহিত্যে এক নুতন শাখার আবির্ভাব ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ও রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও চৈতন্যদেবের অবদান অতুলনীয়। তাঁর মানব মুক্তির বাণী ছিল কালজয়ী– 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ'।

মানবমুক্তির মহামন্ত্র হচ্ছে 'হরেকৃষ্ণ' নামধ্বনি। কীর্তনের ঐক্যে বর্ণবৈষম্য ভুলে সবাই সাম্যের গানে সুর মিলালেন। বাংলার সমাজ, ধর্ম, কাব্য, সাহিত্য-সঙ্গীতে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এবং চিন্তাচেতনায়

চৈতন্যদেবের প্রভাব ছিল অকল্পনীয়। তিনিই পতিত-দলিত মানুষকে আত্মপ্রত্যয় দিয়ে মানুষকে মানুষ হিসেবে বাঁচার সাহস জুগিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে বর্ণবৈষম্য, জাত-পাতের বিষবৃক্ষ, শুচিতা-অশুচিতা, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতার কারণে সমাজ যখন মারাত্মকভাবে জর্জরিত এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের কূট কৌশলতার করালগ্রাসে বিধ্বস্ত, তখন চৈতন্যদেব এই ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। তিনি শুধু পতন-উন্মুখ হিন্দু সমাজকে রক্ষাই করলেন না, মানুষের হৃদয়ে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। তাই অস্পৃশ্য-চণ্ডালসহ নিম্নবর্ণের অগণিত মানুষকে সংস্কার দ্বারা সমাজধর্মে ফিরিয়ে এনে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চৈতন্যদেব সমাজের কল্যাণ করেছেন । তবে তিনি শুধু প্রেমধর্মের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, বাঙালি জাতির ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির পরোক্ষ নিয়ন্ত্রকও ছিলেন।[৮]

জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্য গণ-আন্দোলনের প্রথম রূপকার শ্রীচৈতন্যদেব:

বাংলার অসহযোগ আন্দোলনে প্রথম নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি হচ্ছেন চৈতন্যদেব। তিনি সমাজ সংস্কারের অবিসংবাদিত সংগঠক ছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করে 'বাদিসিংহ' উপাধি লাভ করেছিলেন এবং পাণ্ডিত্যের জন্য 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছিলেন। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল 'বিশ্বম্বর' অর্থাৎ বিশ্বের যিনি পালনকর্তা। প্রকৃতপক্ষে কর্মের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছিলেন গণ-মানুষের তিনিই প্রতিনিধি। তিনি তাঁর ভক্তি আন্দোলনের দ্বারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছিলেন, যার অনন্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে শাসনকর্তা কাজীর নিষেধাজ্ঞা। *চৈতন্যভাগবতে* পাই–

সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন।
দেখি মোরে কোন কর্ম করে কোনজন ॥
দেখোঁ আজি পোড়ঙ কাজীর ঘরদ্বার।
কোন কর্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার ॥

তিনি শুধু বলেই ক্ষান্ত হননি। বাস্তবে নবদ্বীপের শাসনকর্তা কাজীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গণ-আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর কীর্তন শোভাযাত্রা জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল।

তিনি জাতিভেদ প্রথার ও বর্ণবৈষম্যের তীব্র বিরোধী ছিলেন। সামাজিক সংস্কার হিসেবে বর্ণবৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথা দূর করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন নিম্ন বর্ণের ও জাতের লোকেরা চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম গ্রহণ করার কারণে একশ্রেণির মানুষ হীনভাবে সমালোচনা করেছিল। চৈতন্যদেব বলিষ্ঠভাবে তার প্রতি-উত্তর দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবে মরে ॥

তাঁর মুখে নিঃসৃত হয়েছিল জাতিভেদ ও বর্ণ বৈষম্য দূর করার যুগান্তকারী অহিংস বাণী– 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ'। বর্ণবৈষম্য ও জাতিভেদ দূর করেই তিনি তুষ্ট হননি, নারীর অধিকার এবং তাদের শিক্ষার

জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। নারীরা যেন সমাজে নারীর সুশিক্ষায় নেতৃত্ব দান করতে পারে, এটিও তিনি চেয়েছিলেন। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে– নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবী, অদ্বৈত পত্নী সীতা দেবী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী প্রভৃতি নারীরা পরবর্তীকালে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তাঁরা সমাজে ধর্মগুরুও হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি একাধারে কুসংস্কারসহ অত্যাচারের বিরোধী ছিলেন, অন্যদিকে ছিলেন শিক্ষা সংস্কারক, সমাজ সংস্কারক ও নব সংস্কৃতির উদ্যোক্তা।

তিনি শুধু বচনে নয়, বাস্তবেও সমাজের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। মন্ত্রের পরিবর্তে গীত, মন্দিরে বিগ্রহ পূজার পরিবর্তে মনের পবিত্রতা, জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে ভক্তিপ্রেমকে গ্রহণের শিক্ষা দিয়েছিলেন। এভাবেই তিনি গণ-আন্দেলনের মাধ্যমে সমাজ থেকে জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তাই তিনি সমাজসংস্কার করে মানব কল্যাণের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।[৯]

চৈতন্যদেবের সমাজ সংস্কার ও নব মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা:

চৈতন্যদেব জ্ঞানবাদী, কর্মবাদী, মায়াবাদী, ভোগবাদী প্রভৃতি মতবাদ অস্বীকার করে জীবে দয়া ও ঈশ্বরের প্রতি অবিচল ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিটি আন্দোলনের একটি মুখ্য স্লোগান থাকে, কেননা তাতে মুক্তির চেতনা জাগ্রত হয়ে থাকে। তেমনি চৈতন্যদেবের মানব ধর্ম প্রতিষ্ঠার স্লোগান ছিল নাম সংকীর্তন। এটি ছিল জাত-পাতের ভেদ দূর করার ঐক্যের মূল মন্ত্র। চৈতন্যদেবের দর্শন অনুযায়ী অস্পৃশ্যরাও তাঁর সমাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। জগন্নাথপুরীর রথযাত্রার অনুষ্ঠানেও তিনি দলিত ও অস্পৃশ্য সহ সকল সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে নাম সংকীর্তনসহ শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি প্রেমের মহোৎসব করে মহামিলন মেলার সৃষ্টি করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে বাঙালির বিভিন্ন জাত-বর্ণ ও সম্প্রদায়ের লোককে একত্রিত করা এত সহজ ছিল না। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁর সরল প্রেমধর্মের দ্বারা এটি করতে পেরেছিলেন। সর্বত্র তাঁর বিজয় ধ্বনি প্রচারিত হয়েছিল। তিনি নিজে উচ্চ শ্রেণির ব্রাহ্মণ হয়েও এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও ব্রাহ্মণ সমাজের কুসংস্কার ও অশাস্ত্রীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছিলেন বলে সমাজ পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন। তিনি অপরাপর সম্প্রদায়ের মানুষদেরকেও প্রেম প্রদান করেছেন এবং অন্যান্য ধর্মকেও সম্মান প্রদর্শন করেছেন। ব্রাহ্মণদের কঠোর রীতি-নীতির শৃঙ্খলা ভেঙে দিয়ে শুধু মানবধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেমভক্তি দিয়ে বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, নির্যাতিত, সমাজ-জাতি-পরিবার থেকে পরিত্যক্ত মানুষদেরকে আপন করে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। 'পদ্যাবলীতে' সংগৃহীত একটি শ্লোক উচ্চারণ করে মানবের নব ধর্মের পরিচয় দিয়েছিলেন। যথা–

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি ন শূদ্রঃ।
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতি বা ॥"

অর্থাৎ–আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, শূদ্র নই, গৃহস্থও নই এবং বনবাসী সন্ন্যাসীও নই। এই হচ্ছে চৈতন্যদেবের নব মানব ধর্মের বাণী। নতুন করে ব্যাখ্যা দিলেন মানব ধর্মের, সকল মানুষের প্রতি সমদৃষ্টি অর্থাৎ সাম্যবাদের প্রকাশ ঘটালেন। এই বিষয়ে *চৈতন্যচরিতামৃতের* অন্ত্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে–

"আমি তো সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টির ধর্ম্ম।
চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম" ॥

চৈতন্যদেবের এরূপ সাম্যবাদের নীতিতে সমাজে মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তাই চৈতন্যদেবের প্রদর্শিত প্রেমধর্ম বাঙালির প্রথম গণ-জাগরণ হিসেবে খ্যাত। ড. বিমান বিহারী মজুমদারের মতে– চৈতন্যদেবের সমকালীন যেসকল ভক্তরা ছিল, তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কর্মকার, সুবর্ণ বণিক, মুসলমান, সূত্রধর, সন্ন্যাসী, উড়িয়া, রাজপুত প্রভৃতি সম্প্রদায় ও শ্রেণি-পেশার লোক আশ্রয় পেয়েছিল। এভাবে তিনি মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক সামাজিক বলয় নির্মাণ করেছিলেন।

ধর্মের নামে উগ্রতা এবং পরমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করায় তৎকালীন সমাজে মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ তৈরি করে এক জাতবর্ণের সঙ্গে অন্য জাতবর্ণের সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। এমনই সামাজিক সংঘাতময় পরিবেশ থেকে সকল মানুষকে মুক্তি প্রদান করার জন্য সবাইকে মুক্ত আকাশের নিচে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে একত্রিত করেছিলেন। সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-অহিন্দু, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, জাত-পাতের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মুক্ত আকাশের নিচে একত্রিত হতে বিন্দুমাত্র সংঙ্কোচ বোধ করেনি। এইভাবে চৈতন্যদেব সাম্যের নীতিতে ও উদারতার দ্বারা সমাজ সংস্কার করে নব মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১০]

নামকীর্তনরূপ নবসংস্কৃতি দ্বারা দলিত ও পতিতদের উদ্ধারের মাধ্যমে চৈতন্যদেবের সমাজসংস্কার ও সমাজকল্যাণ:

চৈতন্যদেব লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, অবহেলিত, নির্যাতিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও সংস্কারের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে এক ঐতিহাসিক সংস্কারের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, যা ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক বিরল দৃষ্টান্ত। যেমনটি তিনি বলেছেন মানবের মনুষ্যত্বের মর্যাদায় জাতিভেদের ভয়ঙ্কর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য–

নীচ জাতি নহে ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্তহীন, ছাড়।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥
চৈ. চ. অন্ত্য/৪/৬৬-৬৭

চৈতন্যদেবই তো জাতিভেদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন করে সমাজ বিনির্মাণের পথ প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর এই ঐক্য ও সাম্যের আন্দোলনের ফসল হিসেবে পরবর্তীকালে নিম্নস্তরের মানুষ সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এবং ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অধিকার ও সম্মান পেয়েছিল। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত যে নব সংস্কৃতিরূপ 'নামকীর্তন' সেখানে আচার-বিচার ও অনুষ্ঠানের কোন রীতি-নীতি ছিলনা, ছিল শুধু ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা ঐক্যের সূত্র। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নামকীর্তনকে নতুন মাত্রা হিসেবে সংযোজন করলেন। চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মের কারণে নুতন সংস্কৃতির আবহে সমাজে এক নুতন সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। প্রেমভক্তির আন্দোলনকে নগরে-গ্রামে-পল্লীতে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি নিরন্তর প্রচেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁর পার্ষদ ও পরিকরবৃন্দ দ্বারা তৎকালীন সমাজে সংহতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি শক্তিশালী সামাজিক ভিত্তিরূপ সংগঠন তৈরি করেছিলেন। এক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের অবদান অনস্বীকার্য। ব্যয়বহুল ও ক্রিয়াপূর্ণ যাগযজ্ঞের বিধিবিধানকে গুরুত্ব না দিয়ে সমাজে সংহতি স্থাপনের জন্য ভক্তিধর্মকে সমাজের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরলেন। তাঁর এই ধর্মে অংশগ্রহণের জন্য কোন বেদপাঠের শিক্ষা, অর্থ-সম্পদ, জাত-বর্ণের স্থান, শাস্ত্র জ্ঞান, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম এমনকি দীক্ষা-পুরশ্চর্যার বিধি পর্যন্ত তুলে দিলেন। কেননা প্রেমের ধর্মে এসবের কোন প্রয়োজন নেই। শুধু ভক্তি দ্বারা হরিনাম স্মরণ করলেই মুক্তি হবে। এমন সরল পথের সন্ধান পেয়ে জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের দেওয়াল কাটিয়ে হাজার হাজার মানুষ চৈতন্যদেবের প্রেমের স্রোতে গা ভাসিয়েছিল। এই অনাড়ম্বর ও সরল পথের বর্ণনা *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাওয়া যায়–

"দীক্ষা পুরশ্চর্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে॥
আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষয়ে করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥"

চৈ. চ. মধ্য/১৫

চৈতন্যদেবের এই উদার বাণীর কারণে মূর্খ, পতিত, অবহেলিত নানা শ্রেণি-পেশার মানুষদেরকে তাঁর দলে ভিড় জমাতে কোন বেগ পেতে হয়নি। তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংহতির বার্তা চৈতন্যদেবের নিকট থেকে প্রচারিত হওয়ার কারণে চৈতন্যদেবের জয়ধ্বনিতে মানব সমাজ মুখরিত ছিল। এক্ষেত্রে তাঁর দান অপরিসীম। মধ্যযুগের কুসংস্কার ও শুষ্ক নব্যন্যায়ের তীক্ততার কারণে যারা ধর্ম সাধনার জন্য পথ হারিয়েছিল, তারা চৈতন্যদেবের আলোর নিশানায় মুক্তি পাওয়ার জন্য আশ্রিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের এই শিক্ষার ফলে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন ধর্মমতের সম্প্রদায়গুলো সবভুলে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন করে মুক্তির পথ হিসেবে চৈতন্যদেবের আদর্শকে গ্রহণ করেছিল। কেননা সেটি ছিল প্রেমের পথ, কারণ এর বিকল্প কোন পথ আর ছিল না।

চৈতন্যদেবের নামসংকীর্তনরূপ যে নগর শোভাযাত্রা, তার মাধ্যমে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দূর হলো। জাত-বর্ণ-বৈষম্য ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ল। কীর্তন পদযাত্রার সময়ে সমাজের একেবারে নিচু ও পতিতকেও সম্মান করা হতো। এ প্রসঙ্গে গোবিন্দের কড়চায় পাওয়া যায়–

"মুচি যদি ভক্তিসহ ডাকে কৃষ্ণধনে।
কোটী নমস্কার করি তাহার চরণে॥"

এইভাবে জাত-বর্ণের দেয়াল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। হে অমৃতের সন্তানগণ! তোমরা বিভেদ ভুলে প্রভুর শরণ নাও। কেননা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সকলেই তাঁর নিকট সম্মান পাওয়ার অধিকারী। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্ট জীবকে ভালবেসে যখন তখন কাছে টেনে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে স্থান, কাল, পাত্রের কোন বাধাধরা নিয়ম নেই। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

"প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুলাদি না মানে॥"[১১]
চৈ. চ.- মধ্য

সংস্কারের মাধ্যমে শূদ্র ও চণ্ডালকেও বেদশাস্ত্র পাঠের অধিকার প্রদানে চৈতন্যদেব:

তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত এবং সন্ন্যাসী ছাড়া কেউ ধর্ম গুরু, দীক্ষা গুরু বা শাস্ত্র আলোচনা করতে পারত না। কিন্তু চৈতন্যদেব এই প্রথা অস্বীকার করে সমাজে শাস্ত্রীয় সংস্কারের মাধ্যমে প্রচার করেন যে, শূদ্র ও চণ্ডালও যদি সংস্কারের দ্বারা যোগ্য হয়, তবে সেই ব্যক্তি গুরু হতে পারে এবং ধর্ম আলোচনাও করতে পারে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, বর্ণে শূদ্র এবং আশ্রমে গৃহস্থ রামানন্দ রায়কে বক্তা করে চৈতন্যদেব শাস্ত্র আলোচনা করিয়েছিলেন। যবনকুলে জন্ম হরিদাসকে 'নামাচার্য' উপাধি দিয়ে হরিনামের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়েছিলেন। রূপ-সনাতন যবন সংস্পর্শে জীবন-যাপন করায় ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁদের পরিত্যাগ করেছিল। কিন্তু চৈতন্যদেব সেই সনাতনকে দিয়ে বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিসিদ্ধান্ত শাস্ত্র রচনা করিয়েছিলেন এবং রূপকে দিয়ে রাধাকৃষ্ণ লীলারসাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন– কি ব্রাহ্মণ , কি সন্ন্যাসী, কি শূদ্র তাতে কিছু যায় আসে না। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু হতে পারেন এবং এই শিক্ষা অর্জন করে আমার আজ্ঞায় সর্বত্র তিনি গুরু হয়ে শিক্ষাদান করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

"সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করেন ধর্মের প্রকাশ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায় করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥
হরিদাস দ্বারা নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ।

সনাতন দ্বারা ব্রজের ভক্তিসিদ্ধান্ত বিলাস ॥

শ্রীরূপের দ্বারা ব্রজের রস প্রেমলীলা।[১২]

চৈ. চ. অন্ত্য/৫

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥

চৈ. চ. মধ্য/৮/১২৭

যারে দেখ, তারে কহ, 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।

আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার' দেশ ॥[১৩]

চৈ. চ. মধ্য/৭/১২৮

'আচার', 'প্রচার'–নামের করহ 'দুই' কার্য।

তুমি-সর্ব-গুরু, তুমি জগতের আর্য" ॥[১৪]

চৈ. চ. অন্ত্য/ ৪/১০৩

চৈতন্যভাগবতে পাই –

'চণ্ডাল' 'চণ্ডাল' নহে,–যদি 'কৃষ্ণ' বলে।

'বিপ্র' 'বিপ্র' নহে– যদি অসৎ পথে চলে ॥[১৫]

চৈ. ভা-মধ্য/১/১৯৭

বর্বর ও নিষ্ঠুর জাত-বর্ণ স্পর্শের ভেদাভেদ দূর করার ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের সমাজসংস্কার ও সমাজকল্যাণ:

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাকা সপ্তগ্রামের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বর্ণের পণ্ডিত কালিদাস নিম্ন বর্ণের ঝড়ু ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করার কারণে চৈতন্যদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সনাতন গোস্বামীর সমস্ত দেহে কণ্ডুরসা অর্থাৎ– মারাত্মক চর্ম রোগ হয়েছিল। সনাতন নিজেকে অত্যন্ত নীচ-পতিত ও অস্পৃশ্য মনে করে স্পর্শ ভয়ে সকলের নিকট থেকে দূরে থাকতেন। চৈতন্যদেব ঘৃণা ভয় ত্যাগ করে সনাতনের বার বার নিষেধ সত্ত্বেও তিনি সনাতনকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং এর ফলে চৈতন্যদেবের দেহে সেই গলিত পচা কণ্ডুক্লেদ লেগেছিল। বাস্তবে বীভৎস হলেও চৈতন্যদেব তা অমৃতের ন্যায় মনে করে প্রেম প্রদান করেছিলেন। এই হচ্ছে চৈতন্যদেবের বাস্তবে জাত-বর্ণ স্পর্শের ভেদাভেদ দূর করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

"মোরে না ছুঁইবে প্রভু পড়ো তোমার পায়।

একে নীচজাতি অধম আর কণ্ডুরসা গায় ॥

বালাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।

কণ্ডু-ক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল।

সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে ॥

চৈ. চ. অন্ত্য/৪

তোমার দেহ তুমি কর বীভৎসতা জ্ঞান।
তোমার দেহ আমার লাগে অমৃত সমান ॥

এছাড়াও বাসুদেব নামক এক কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ থেকে পরিত্যক্ত হলে চৈতন্যদেব প্রেমের দ্বারা তাকে আলিঙ্গন করে তাকে কুষ্ঠ ব্যাধি থেকে মুক্ত করে মানব কল্যাণের পরিচয় দিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব মধ্যযুগের এই বর্বর ও নিষ্ঠুর জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রথা ভেঙে দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি সমাজের মানুষকে বেঁচে থাকার সাহস যুগিয়েছিলেন। তিনি সমাজে আর্ত, দীন, দরিদ্র, পতিত, অস্পৃশ্য, অবহেলিত, দুঃখিত, অসহায়, কাঙাল, রোগগ্রস্ত প্রভৃতি সমাজ পরিত্যক্ত জনমানবের প্রভু ছিলেন। অর্থাৎ– মুক্তিদাতা ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর কোন তুলনা হয় না।

চৈতন্যদেব সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডূকতায় ভরা সমাজের প্রতিটি মানুষকে উদারতা-দয়া-করুণার মাধ্যমে সামাজিক মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। যবন হরিদাস, যবন দরজী, পাঠান, অহিন্দু প্রভৃতি শ্রেণি-জাত-বর্ণের মানুষ তাঁর ধর্মে প্রবেশ করেছিল। চৈতন্যদেব শুধুমাত্র যবন হরিদাসের মৃত দেহের সমাধি ও তাঁর উদ্দেশে বৈষ্ণব ভোজনই দেননি, তিনি মহাযোগী হরিদাসের মৃত দেহের পাদোদক পর্যন্ত ভক্তদের পান করিয়েছিলেন। সেসময়ে পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে এইরূপ কাজ করা এত সহজ ছিলনা। এই হচ্ছে চৈতন্যদেবের বর্বর ও নিষ্ঠুর জাত-বর্ণ স্পর্শের ভেদাভেদ দূর করার ক্ষেত্রে সমাজসংস্কার। সমাজে মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই হচ্ছে তাঁর অবদানের ইতিহাস। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল ॥
হরিদাসের পাদোদক নিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন ॥

চৈ. চ. অন্ত্য/১১

জাতিভেদ ও বর্ণ বৈষম্য দূর করার জন্য তিনি সবার সম্মুখে হরিদাসের উচ্চ মহিমার প্রশংসা করতেন। হরিদাসের প্রতি চৈতন্যদেবের উচ্চ ধারণার বর্ণনা পাওয়া যায় *চৈতন্যচরিতামৃতে*–

"প্রভু কহে তোমা স্পর্শী পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥ "

চৈ. চ. মধ্য/১১

চৈতন্যদেব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ছিলেন। মুখে যা বলতেন কাজে সেটি পরিণত করতেন। তাঁর জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে জাত-বর্ণের ভেদাভেদ দূর করার জন্য

সবসময় তিনি আচরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি জাতিনাশ দূর করার জন্য নিত্যানন্দকে দিয়ে পানিহাটিতে বিশাল চিড়া মহোৎসবে পংক্তিভোজন করিয়েছিলেন। ফলে জাতিনাশরূপ পংক্তিভোজন যা দেশীয় পরম্পরায় সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তার মূলে কুঠারাঘাত হেনেছিল। কিন্তু এ সফলতার জন্য কট্টরপন্থী ব্রাহ্মণ্যবাদীরা চৈতন্যদেবের কঠোর সমালোচনা ও বিরোধিতা করলেও তিনি তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি। মূলত জাতিভেদ দূর করে সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে দিয়ে পানিহাটিতে চিড়ামহোৎসব করিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

চাল-কলা-দুগ্ধ-দধি একত্র করিয়া।
জাতি নাশ করি' খায় একত্র হইয়া॥
চৈ. ভা. মধ্য/৮

চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ একত্রিত হয়ে একে অন্যের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করুক ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা আদান-প্রদানের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধিময় জীবন গড়ে উঠুক। আদর্শের ও কর্মের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। সাম্যের মহাসমাবেশের মিলন মেলায় থাকবেনা কোন শ্রেণি বিভেদ, থাকবে শুধু আমরা স্রষ্টার সৃষ্ট মানুষ এই পরিচয়। এভাবে চৈতন্যদেব সমাজ থেকে বর্বর ও নিষ্ঠুর জাত-পাত-বর্ণের ভেদাভেদ দূর করে সমাজ সংস্কার করে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম।[১৬]

বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ:

বাংলার হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণের মানুষ রয়েছে। এই চার বর্ণের মধ্যে আবার অনেক প্রকার ভাগ রয়েছে। সে সময়ে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ছাড়াও বিভিন্ন জাতির লোক সমাজে বসবাস করত এবং বৃত্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করত। যথা–বণিক গোপ, তেলি, কামার, তাম্বুলী, নাপিত, মোদক, কিরাত ও কোল, ছুতার, পাটনী, মারহাটরা প্রভৃতি। এছাড়া সমাজে জীবিকা অর্জনের জন্য বেশ্যাবৃত্তিরও প্রচলন ছিল। কামিলা ও কেয়লা জাতিকে 'জায়াজীব' বলা হয়েছে। এছাড়া ক্ষত্রি, রাজপুত প্রভৃতি ছিল। মধ্যযুগে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী প্রথা সমাজে বিদ্যমান ছিল। মুসলমানরা হিন্দুরাজ্য জয় করে অনেক হিন্দু বন্দিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে ক্রীতদাস হিসেবে ব্যবহার করেছিল। হিন্দুদের মধ্যেও দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। দাস-দাসীরা গৃহকার্যে নিযুক্ত হতো। এছাড়া অনেক নিম্নশ্রেণির পেশাজীবী, যেমন– হাড়ী, ডোম, প্রভৃতি জাতি সমাজে ছিল।

সমাজে তখন বহু নিম্নবর্ণের লোককে জাতিচ্যুত করা হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যবন স্পর্শে হিন্দু জাতিচ্যুত হতো এবং বাধ্য হয়ে তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হতো। এটি ছিল সমাজের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাধি, যার কারণে বহু হিন্দু জাতিচ্যুত হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিল।[১৭] মধ্যযুগে বর্ণ বৈষম্যের কারণে যে বিষবাষ্প সমাজের

সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে তার প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি সমাজসংস্কার ও বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণার্থে কখনও কোন স্থানে কারও নিকট মাথানত করেননি। তিনি সত্যিকারের সমাজসেবক, প্রকৃত পথ প্রদর্শক ছিলেন। বর্ণবৈষম্য দূরীকরণার্থে সংকীর্তন আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। তিনি সমাজ থেকে বর্ণ বৈষম্য দূর করার জন্য দুর্বার আন্দোলন করেছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন। তিনি জাতিচ্যুত সুবুদ্ধি রায়কে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তখনকার ব্রাহ্মণরা দেহ স্পর্শ জনিত কারণে সুবুদ্ধি রায়কে তপ্ত ঘৃত পানে মৃত্যুর বিধান প্রদান করেছিলেন। বর্ণ বৈষম্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদের কষাঘাতে সমাজে যে ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছিল, চৈতন্যদেব তা বহুলাংশে রোধ করতে পেরেছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁর দর্শন, শিক্ষা, আদর্শ ও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের দ্বারা নগর সংকীর্তনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বর্ণবৈষম্যের দ্বারা ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন এবং সমাজের পতিত ব্যক্তিদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৮]

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার আশ্রয় চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মে:

চৈতন্যদেবের মহাভাবযুক্ত অপ্রাকৃত প্রেমোন্মাদনাপূর্ণ ভক্তি ও দিব্য প্রেমের তরঙ্গ সমগ্রদেশের মানবগণের নিকট ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। একদিকে ব্রজের মাধুর্যপূর্ণ রাধা কৃষ্ণলীলা এবং অন্যদিকে হরেকৃষ্ণ নাম সংকীর্তন-এই উভয় বিষয় বাংলার মানুষকে প্রেমভক্তির বন্যায় ভাসিয়ে নিল। চৈতন্যদেবের এই অভিনব অপ্রাকৃত প্রেমে হিন্দুধর্মের স্মৃতির আচার-বিচার লোপ পেল, চণ্ডাল-শূদ্র-স্ত্রীলোক প্রভৃতি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহুমানুষ এই ভক্তি ধর্মের প্রেমে আপ্লুত হয়ে প্রেমধর্ম গ্রহণ করলো। যার ফলশ্রুতিতে বাংলায় জাতিভেদের বৈষম্য দূর হলো। আর এটিই ছিল চৈতন্যদেবের লক্ষ্য ও আদর্শ।

চৈতন্যদেব অবধূত নিত্যান্দকে ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-জ্ঞানী, শুচি-অশুচি সবাইকে অকাতরে প্রেমভক্তি প্রদান করার জন্য পুরী থেকে বাংলায় প্রেরণ করেছিলেন। নিত্যানন্দ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার সকলকে অহৈতুকী করুণা প্রদান করে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে সমাজে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, অবহেলিত ছিল, তাদের আশ্রয় হলো বৈষ্ণব ধর্মে। স্মৃতির কঠোর বিধি বিধানের আবরণ মুক্ত করে শুধু হরি নাম কীর্তনের দ্বারা জীবের মুক্তি লাভ হবে এই নীতি ও মতবাদের কারণে চৈতন্যদেবের আন্দোলন তৎকালীন হিন্দু সমাজে এক নব বিপ্লবের সূচনা করে। জাতিভেদের শৃঙ্খলা থেকে সমাজ মুক্ত হলো। হরিদাস ঠাকুর, কালিদাস প্রভৃতি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বৈষ্ণবরা ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দান শুরু করেছিলেন। সেই সময়ে সমাজের অনেক মহিয়সী নারী বৈষ্ণব ধর্মের গুরুপদে আসীন হয়েছিলেন। যেমন–নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবী, অদ্বৈত পত্নী সীতাদেবী, শ্রীনিবাস আচার্যের

কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী। এঁরা উদার বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১৯]

চৈতন্যদেবের সমাজসংস্কার ও সমাজকল্যাণের কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত:

চৈতন্যদেবের বেদান্ত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ:

বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য তৎকালীন ভারতের বিখ্যাত বৈদান্তিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি উড়িষ্যার রাজার সভাপণ্ডিতও ছিলেন। তাঁর বেদান্ত শিক্ষার টোল উড়িষ্যার পুরীতেই ছিল। তিনি সেই টোলে বহু ছাত্রকে বেদান্ত অধ্যয়ন করাতেন। তিনি শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ ভাষ্যের উপর অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর টোলে ছাত্রদের তিনি বেদান্তের মায়াবাদ ভাষ্য শিক্ষা দান করতেন। তাঁর হৃদয় লৌহপিণ্ডের মতো শক্ত ছিল। তাঁর মধ্যে ভক্তির লেশ তো দূরের কথা তিনি ভক্তিবাদ স্বীকার করতেন না। কিন্তু চৈতন্যদেব যখন বেদান্ত আলোচনাকালে বেদান্ত সূত্রের সবিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করলেন, তখন তিনি তাঁর অকাট্য যুক্তি শ্রবণ করে চৈতন্যদেবের মতকে স্বীকার করেন। চৈতন্যদেব এর পরই ভাগবতের 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' শ্লোকের ১৮ প্রকার ব্যাখ্যা করলে, তিনি তখন শাস্ত্র সিদ্ধান্ত দ্বারা চিন্তা করলেন যে, কোন মানবের পক্ষে ১৮ প্রকার বিচার করা সম্ভব নয়। তাই তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন পণ্ডিত সার্বভৌম চৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করলেন। সার্বভৌমের টোলের বহু ছাত্র ও অনুসারিগণও চৈতন্যদেবের পতাকা তলে এসে মিলিত হলেন। চৈতন্যদেবের মত সার্বভৌমের গ্রহণের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে জগন্নাথ পুরীর বহু মানুষ চৈতন্যদেবের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং মায়াবাদ মত ত্যাগ করে চৈতন্যদেবের আদর্শ গ্রহণ করে। মূলত সার্বভৌমের বৈষ্ণব মত গ্রহণ করার কারণে উড়িষ্যায় চৈতন্যদেবের আদর্শ ও শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। তাই সার্বভৌম চৈতন্যদেবের শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে উড়িষ্যার মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়েছিল। ধর্ম-দর্শনের পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হলো। এইভাবে চৈতন্যদেব পরম করুণা করে বৈদান্তিক সার্বভৌমকে উদ্ধার করার মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে বেদান্ত সমাজের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করলেন।এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* সার্বভৌমের বিনীত স্তুতির বর্ণনা পাই–

আত্মনিন্দা করি' লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন ॥
নিজ-রূপ প্রভু তাঁরে করাইল দর্শন।
চতুর্ভুজ-রূপ প্রভু হইলা তখন॥
দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ-রূপ।
পাছে শ্যাম-বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥
দেখি' সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করি' পড়ি।
পুনঃ উঠি' স্তুতি করে দুই কর যুড়ি' ॥[২০]

চৈ. চ-মধ্য/৬/২০১-২০৪

প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে চৈতন্যদেবের শাস্ত্রশিক্ষা দ্বারা সমাজের কল্যাণ:

চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে গমন ও প্রত্যাগমনের সময় অর্থাৎ দুইবার তিনি কাশীতে অবস্থান করে কাশীবাসীদের মধ্যে ভগবৎ চেতনা জাগ্রত করেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের অনুগামী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের প্রধান পীঠস্থান হচ্ছে বারাণসী। বেদান্ত দর্শনের মহান পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী দশ সহস্রাধিক সন্ন্যাসীদের গুরুদেব ছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্ন্যাসী গুরু প্রকাশানন্দকে মায়াবাদ দর্শনের কবল থেকে মুক্ত করে তাঁর প্রদর্শিত পথে অর্থাৎ অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ দর্শনে নিয়ে আসা। তাই তিনি এই করুণা প্রদর্শনের জন্য দুইবার কাশীতে অবস্থান করে প্রচার করেন। কেননা শ্রীপাদ সরস্বতী যদি তাঁর পথ গ্রহণ করে তবে সবাই তাঁকে অনুসরণ করবে। তাই করুণাবশত তিনি বেদান্ত আলোচনা সভায় শাস্ত্রযুক্তি ও বিচারের দ্বারা প্রকাশানন্দকে পরাজিত করে তাঁর অনুগামীসহ তাঁকে উদ্ধার করেন। ফলে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর দশ সহস্রাধিক অনুগামী চৈতন্যদেবের অনুসারী হয়েছিল। এভাবে তিনি সমাজের কল্যাণ করেছিলেন। *চৈতন্যচরিতামৃতে* প্রকাশানন্দের বিনয় ও ভক্তির প্রকাশ ঘটেছে–

প্রকাশানন্দ কহে,– তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।
তবু যদি কর তাঁর 'দাস'-অভিমান্॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা-হৈতে ।
সর্ব্বনাশ হয় মোর তোমার নিন্দাতে॥
এবে তোমার পাদাব্জে উপজিবে ভক্তি।
তথি লাগি' করি তোমার চরণে প্রণতি ॥[২১]
চৈ.চ-মধ্য/২৫/৭৯-৮০, ৮৪

বিষয় বাসনা ত্যাগ করে কৃষ্ণ বিষয়ক জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ:

চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে সেতুবন্দের নিকটে কূর্মক্ষেত্রে ভগবানের দশাবতারের অন্যতম কূর্মাবতারের বিগ্রহ দর্শন করেন। কূর্ম নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ সেখানের এক গ্রামে বাস করতেন। তিনি চৈতন্যদেবের ভক্তিভাব ও অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ হয়ে অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন এবং তাঁকে সেবা করার জন্য সগৃহে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে নিমন্ত্রণ করলেন। গৃহে আসার পরে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম পূজা করে চরণামৃত সকলে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর প্রসাদান্ন সবাই গ্রহণ করে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করলেন। তাঁর দিব্য সঙ্গ লাভ করে তাঁদের বংশ, জন্ম, কুল সবই সার্থক হয়েছে বলে আনন্দিত হলেন। চৈতন্যদেব তাঁদের বিনম্র ভক্তি শ্রদ্ধায় তাঁদের প্রতি করুণা বিতরণ করলেন এবং আশীর্বাদ প্রদানপূর্বক শিক্ষা প্রদান করলেন। চৈতন্যদেবের স্নেহের আতিসহ্যে তাঁর বিদায় বেলায় বিরহজ্বালা তাঁরা অনুভব করে তাঁর সঙ্গী হওয়ার প্রার্থনা করেন। চৈতন্যদেব সবাইকে বললেন– বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে কৃষ্ণভজন করবে এবং আমার

আদেশে গুরু হয়ে সবাইকে কৃষ্ণ শিক্ষা দান করবে। তিনি এইভাবে সেই গ্রামের সবাইকে কৃষ্ণনাম শিক্ষা দান করেন। এভাবেই চৈতন্যদেব অকাতরে প্রেম বিতরণ করেন। *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাই–

যারে দেখ, তারে কহ, 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥[২২]
চৈ. চ-মধ্য /৭/১২৮-১২৯

আদর্শ গার্হস্থ্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চৈতন্যদেবের সমাজকল্যাণ:

আদর্শ গার্হস্থ্য আশ্রমের মাধ্যমে একজন আদর্শবান পিতা আদর্শবান পুত্র ও কন্যা লাভ করে থাকে। সমাজ ও জাতির যোগ্য নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন একজন সৎ, শিক্ষিত, নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী পুরুষের। তাহলেই সমাজ ও জাতির যথাযথ কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে। চৈতন্যদেব এ বিষয়ে চিন্তা করে তাঁর অগ্রজ অবধূত নিত্যানন্দকে আদেশ করলেন যে, গৌড়ের অধম-পতিত-অস্পৃশ্য-চণ্ডালসহ সকলের মুক্তির জন্য তাঁকে গৌড়ে থেকে প্রচার করতে হবে। সেজন্য তাঁকে স্থায়ীভাবে গৌড়ে বসবাস করতে হবে। যদিও নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁর আত্মস্বরূপ ছিলেন। পরে গৌড়ের অধম পতিতদের কথা চিন্তা করে চৈতন্যদেবের আদেশ শিরোধার্য করে পণ্ডিত সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবী দেবীকে বিবাহ করে আদর্শ গার্হস্থ্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের পরম কল্যাণের জন্য সন্ন্যাসী হয়েও নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের নির্দেশ পালনের জন্য কত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যা অকল্পনীয়। নিত্যানন্দ প্রতি বাড়িতে বাড়িতে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, সর্বত্র চৈতন্যদেবের নির্দেশে তাঁর দল-বল নিয়ে কীর্তন করেন এবং চৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রচার করে সমাজের অধঃপতিতদের উদ্ধার করেন।[২৩] শুধু তাই নয় নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবী দেবী ও পুত্র বীরভদ্র পরবর্তীকালে গার্হস্থ্য আশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং চৈতন্যদেবের শিক্ষা সর্বত্র প্রচার করেছিলেন। এইভাবে চৈতন্যদেব সমাজের প্রকৃত কল্যাণের জন্য নিত্যানন্দের দ্বারা আদর্শ গার্হস্থ্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। যার ফলে নিত্যানন্দ পুত্র ও স্ত্রী পরবর্তীকালে সমাজ ও দেশের নেতৃত্ব প্রদান করতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

চার্তুম্মাস্য-অন্তে পুন নিত্যানন্দ লঞা।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া ॥
নিত্যানন্দ কহে প্রভু– শুনহ শ্রীপাদ!
এই আমি মাগি, তুমি করহ প্রসাদ॥
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা ॥

তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে।

আমার দুষ্কর কর্ম তোমা হৈতে হয়ে ॥[২৪]

চৈ. চ. মধ্য/১৬/৫৮, ৬২-৬৪

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল– যাহ গৌড়দেশে।

অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥[২৫]

চৈ. চ. মধ্য/১৫/৪৩

এছাড়া চৈতন্যদেব গার্হস্থ্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য রঘুনাথ দাসকেও পরামর্শ দিয়েছিলেন। রঘুনাথ দাস জমিদার গোবর্ধন দাসের পুত্র ছিলেন। ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছেন। হৃদয়ে বৈরাগ্যভাব জাগ্রত হলে তিনি চৈতন্যদেবের সঙ্গী হয়ে নীলাচল যাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁকে গৃহ ত্যাগ করতে নিষেধ করেন। কেননা গৃহে বৃদ্ধ পিতা-মাতা-স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, তাঁদের দেখাশুনা করতে বলেছিলেন এবং আরো বলেছিলেন–বানরের মত বৈরাগ্য ভাব অবলম্বন না করে অনাসক্ত হয়ে বিষয়ভোগ করতে। কেননা ঈশ্বরকে একদিনে পাওয়া যায় না। গৃহে থেকে কৃষ্ণ ভজন করা যায়। আদর্শ গৃহস্থ হয়ে পরিবার ও সমাজের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা যায়। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাওয়া যায়–

স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল।

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল ॥

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।

যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া ॥[২৬]

চৈ. চ. মধ্য/১৬/২৩৫-২৩৬

চৈতন্যদেব তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য নিত্যানন্দের প্রতি যে আদেশ করেছিলেন, সে সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর রচিত *চৈতন্যভাগবতে* বর্ণনা করেছেন– চৈতন্যদেব প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি মূর্খ, নীচ, দরিদ্র, পতিতসহ সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে কৃষ্ণপ্রেম দান করে দুঃখের নিবৃত্তি ঘটিয়ে সুখের সন্ধান করে দিবেন। তাই তিনি তাঁর কর্ম নিত্যানন্দকে দিয়ে করানোর জন্য আদেশ করলেন যে, আমি তো নীলাচলে আছি, বিভিন্ন জায়গায় প্রচারের জন্য আমাকে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়। তুমি তো গৌড়ের লোক, তুমি যদি সন্ন্যাসী হয়ে এই নীলাচলে সাধন-ভজনে পড়ে থাক, তাহলে বাংলাতে নীচ, পতিত, চণ্ডাল, অস্পৃশ্যদেরকে আমার প্রেম বিতরণ করে তাদের উদ্ধার করবে কে? আমার বাক্য যদি সত্য হিসাবে গ্রহণ কর, তাহলে তাদের উদ্ধারের নিমিত্তে অতিসত্তর গৌড়ে যাত্রা কর। আমার ভক্তিপ্রেম তুমি বিতরণ করে বাঙলার সমস্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত কর। কেননা আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তাদের নাম প্রেম দিয়ে উদ্ধার করব। এ সত্য পালনার্থে যা কিছু প্রয়োজন তা তুমি অবশ্যই করবে। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যভাগবতে* পাওয়া যায়–

প্রভু বলে, শুন নিত্যানন্দ মহামতি!

সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি ॥

প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে।
'মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম-সুখে' ॥
তুমিও থাকিলে যদি মুনিধর্ম্ম করি'।
আপন-উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি' ॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার ?
ভক্তি-রস-দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে ?
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়-দেশে যাও ॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর' গিয়া সবারে মোচন"॥[২৭]

চৈ. ভা. অন্ত্য/৫/২২৩-২২৯

তাই দেখা যায় যে, চৈতন্যদেবের পার্ষদদের মধ্যে যেমন মহান ও ত্যাগী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের দেখা যায়, তদ্রূপ মহাজ্ঞানী পণ্ডিতদেরও আদর্শ গার্হস্থ্য আশ্রমে দেখা যায়। যেমন–আচার্য অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ঠাকুর, রাজ্যপাল রায় রামানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য, বল্লভ, শ্রীনিবাস আচার্য, শিবানন্দ সেন প্রভৃতি। এ মহান ও আদর্শ গৃহস্থদের উত্তরসূরিরা পরবর্তীকালে সমাজকল্যাণের জন্য চৈতন্যদেবের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যেমন– অদ্বৈত পুত্র অচ্যুতানন্দ, পত্নি সীতা দেবী, শ্রীবাস ঠাকুরের স্ত্রী মালিনী দেবী, বল্লভের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী, নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবী দেবী, পুত্র বীরভদ্র, শিবানন্দের পুত্র পুরীদাস অর্থাৎ কবিকর্ণপূর প্রভৃতি। তাই দেখা যায়, চৈতন্যদেব সমাজ সংস্কার ও কল্যাণের জন্য আদর্শ গার্হস্থ্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর এই গার্হস্থ্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ ও দেশের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হয়েছিল।

জাতিভেদ দূর করার জন্য ইতিহাসের স্মরণীয় মহোৎসবঃ

চৈতন্যদেবের নির্দেশে নিত্যানন্দ বাংলার সর্বত্র হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করে জাতিভেদ দূর করার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। জাতিভেদ দূর করার জন্য পানিহাটিতে বিশাল চিড়া মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। কেননা চৈতন্যদেবের শিক্ষা হচ্ছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একত্রিত করে জাতিভেদের করালগ্রাস থেকে সমাজকে মুক্ত করা। সেই প্রচেষ্টায় মহোৎসব একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য ছিল। এখানে কোন জাত-

পাত-বর্ণের ভেদাভেদ থাকবে না। তাই চৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে নিত্যানন্দ পানিহাটিতে ইতিহাসের স্মরণীয় উৎসব করেছিলেন।

সেই মহোৎসবে অসংখ্য ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক, ধনাঢ্য ব্যক্তি, কবি, সমাজের উঁচু-নিচু মানুষ, শূদ্র, চণ্ডাল, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সকল শ্রেণি-পেশার লোক একত্রিত হয়ে মহোৎসবে অংশগ্রহণ করে ভোজন করেছিল। চৈতন্যদেবের এই জাতিভেদ দূর করার আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করার জন্য পানিহাটির মহোৎসবের মধ্য দিয়ে স্বার্থক হয়েছিল। চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য ছাড়া বিনা প্রয়োজনে এই উৎসব পালন করা হয়নি। পানিহাটির এই মহোৎসব পংক্তিভোজনে সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা ক্রমে ক্রমে দূর হতে লাগল। এই মহোৎসবের কারণে সমাজে এর যথেষ্ট প্রভাব পরেছিল। তাই হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য পানিহাটির চিড়া মহোৎসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা ইতিহাসে স্মরণীয় উৎসব।[২৮] এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব আনি প্রভু আগে চৌদিকে ধরিলা ॥
'মহোৎসব' নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন ॥
চৌতরা উপরে যত প্রভুর নিজগণ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলীবন্ধন ॥
ধনঞ্জয় জগদ্দীশ পরমেশ্বর দাস।
মহেশ গৌরীদাস আর হোড় কৃষ্ণদাস ॥
উদ্ধারণ দত্ত আদি যত নিজগণ।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন?
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সভায় উপরে বসাইলা ॥
তীরে স্থান না পাইয়া আর কতোজন।
জলে নাম্বি করে দধি-চিপিটক ভক্ষণ ॥
কেহো উপরে, কেহো তলে, কেহো গঙ্গাতীরে।
বিশজন তিন ঠাঁই পরিবেশন করে ॥[২৯]

চৈ. চ. অন্ত্য/৬/৫২-৫৩, ৫৯, ৬১-৬৩, ৬৮-৬৯

কায়স্থ রঘুনাথ দাসকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদানের দ্বারা সমাজসংস্কার ও সমাজকল্যাণ:

সনাতন ধর্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণের কথা উল্লেখ রয়েছে। গীতার ব্যাখ্যা অনুসারে কর্ম ও গুণ অনুসারে চার বর্ণের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। তারমধ্যে ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ ছাড়া বৈদিক

যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়া কিছুই হয় না। গুণ ও কর্মের জন্যই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। *মহাভারতের* শান্তি পর্বে ব্রাহ্মণের গুণ ও যোগ্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে–

জাতকর্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্সু কর্মস্ববস্থিতঃ ॥
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥
সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ক্ষমা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥
মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৮৯, ২-৪

অর্থাৎ– যিনি বিধিপূর্বক সংস্কৃত, শুচি, বেদ অধ্যয়নরত ও ষট্কর্মান্বিত আচরণশীল বিঘসাশী, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী ও সত্যপরায়ণ, তিনিই হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। যাঁর মধ্যে সত্য, দান, অদ্রোহ, মৈত্রী, লজ্জা, ক্ষমা ও তপশ্চর্য্যা সর্বদা থাকে, তিনিও ব্রাহ্মণ। তাই মহাভারতে ব্রাহ্মণের গুণ ও কর্মের বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নবর্ণের শূদ্রেরও যদি ব্রাহ্মণের মতো গুণ ও কর্ম থাকে, তাহলে মহাভারতে তাকে ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে *মহাভারতের* অনুশাসন পর্বে বর্ণনা করা হয়েছে–

এভিস্তু কর্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥
মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ১৪৪, ২৬

অর্থাৎ– সদাচার ও কর্মের দ্বারা কোন শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারে, একইভাবে কোন বৈশ্যও ক্ষত্রিয় হতে পারে। তাই *মহাভারতের* বর্ণনা অনুযায়ী যদি ব্রাহ্মণ বর্ণের কোন ব্যক্তির ব্রাহ্মণোচিত গুণ ও কর্ম না থাকে, তাহলে তাকেও শূদ্র বলা হয়েছে।[৩০]

শাস্ত্রানুসারে জাত-বর্ণ জন্মগত নয়। জাত-বর্ণ হচ্ছে গুণ ও কর্মগত। গুণ ও কর্মের দ্বারা যোগ্যতা অর্জন করলে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হতে পারে। তাই শুক্রনীতির বর্ণনানুযায়ী জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা ম্লেচ্ছ নির্ধারিত হয় না বরং গুণ ও কর্মের দ্বারা পার্থক্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। যথা–

ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব বা।
ন শূদ্রেন চৈব ম্লেচ্ছোভাদতা গুণকর্মাভঃ ॥

ব্রাহ্মণের যোগ্যতা সম্পর্কে *মহাভারতে* স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে–

ন কুলেন ন জাত্যা বা দ্বাভ্যাং বা ব্রাহ্মণো ন হি।
চণ্ডালোঽপি ব্রতস্থশ্চেৎ ব্রাহ্মণঃ স যুধিষ্ঠির ॥
শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নো গুণবান ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোঽপি ক্রিয়াহীনঃ প্রত্যন্তরং ভবেৎ ॥

অর্থাৎ– বংশ বা জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, যদি চণ্ডালও যথাযথভাবে ব্রত পালন করে, তাহলে সেও ব্রাহ্মণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকবে। শূদ্রও যদি চরিত্রবান ও গুণবান হয়ে থাকে, তাহলে সেও ব্রাহ্মণ হতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি ক্রীয়াহীন হন, তাহলে তিনি শূদ্রের থেকেও অধম বলে বিবেচিত হবেন।[৩১] মৃত্যুঞ্জয়াচার্য গৌতম স্মৃতি থেকে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করেছেন যে–

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারদুচ্যতে দ্বিজঃ।
বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥

অর্থাৎ– জন্ম মাত্রেই যে কোনো মানুষ শূদ্র হয়ে থাকে। উপনয়নাদি সংস্কারের মাধ্যমে দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে। নিয়মিত বেদ পাঠের অভ্যাসের দ্বারাও ব্রাহ্মণ হতে পারে। আর ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনিই হচ্ছেন ব্রাহ্মণ।[৩২]

উল্লিখিত শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করেই চৈতন্যদেব সমাজ সংস্কার করেছিলেন। তিনি সংস্কার দ্বারা রঘুনাথ দাসকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করে ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকর্ম করার অনুমোদন দিয়েছিলেন। কেননা– রঘুনাথ দাস সপ্তগ্রামের জমিদার গোবর্ধন দাসের পুত্র ছিলেন। বাৎসরিক ২০ লক্ষ মুদ্রার রাজস্ব আদায়ের চুক্তিতে রাজাকে ১২ লক্ষ মুদ্রা পরিশোধ করতে হতো। বাকি ৮ লক্ষ মুদ্রা জমিদার নিজেরাই পেতেন। রঘুনাথ দাস এই জমিদার বংশের একমাত্র পুত্র। কিন্তু চৈতন্যদেবের আদর্শে তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব হয়ে মহান গুণের ও ত্যাগের অধিকারী হয়েছিলেন। আচার ও সংস্কার দ্বারা রঘুনাথ দাস উচ্চ পর্যায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। সে কারণে চৈতন্যদেব গোবর্ধন শিলা পূজা ও অর্চনের জন্য তাঁকে অর্পণ করেছিলেন। কেননা এই শালগ্রাম শিলা বা গোবর্ধন শিলা পূজা তো দূরের কথা ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। তাই সমাজের নানা শ্রেণি মতের কঠোর সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠে চৈতন্যদেব দৃঢ়তার সঙ্গে কায়স্থ রঘুনাথ দাসকে ব্রাহ্মণের যোগ্য হিসেবে গোবর্ধন শিলা পূজা-অর্চনের জন্য অর্পণ করেছিলেন। চৈতন্যদেব এভাবে প্রচলিত বংশানুক্রমিক ধারায় যোগ্যতাহীন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অস্বীকার করে গুণ ও কর্মের দ্বারা সংস্কারের মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করে রঘুনাথ দাসকে দিয়ে সমাজ সংস্কারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সমাজের সকলকে শিক্ষাদান করেছেন।

চৈতন্যদেব এই শিলাকে কৃষ্ণের অভিন্ন কলেবর বা বিগ্রহ মনে করে হৃদয়ে ধারণ করে তিন বছর ভক্তিভরে সেবা করেছেন। তিনি রঘুনাথ দাসকে এই শিলা প্রদান করেছেন, কারণ রঘুনাথ দাসের ভক্তিনিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর কারণে। কেননা বৈষ্ণব হচেছ ব্রাহ্মণের থেকেও শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবের কোন জাতিবুদ্ধি নেই। আবার অর্চা বিগ্রহও বিষ্ণু থেকে অভিন্ন। এ প্রসঙ্গে *পদ্মপুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে– 'অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ গুরুষু নরমতিঃ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ...যস্য বা নারকী সঃ'। অর্থাৎ– যে ব্যক্তি বিষ্ণুর অর্চা মূর্তিকে শিলা বুদ্ধি করে, গুরুদেবকে সাধারণ মানুষ ভাবে ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করে, সে ব্যক্তি নারকী। তাই দেখা যায় যে, রঘুনাথ দাস একদিকে পরম বৈষ্ণব এবং অন্যদিকে গুণ ও কর্মের কারণে সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করায় চৈতন্যদেব

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে শালগ্রাম শিলা অর্চনের ধর্মীয় অধিকার প্রদান করে ব্রাহ্মণত্বের সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন। চৈতন্যদেব এইভাবে একজনকে দিয়ে সমাজের সবাইকে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাওয়া যায়–

এত বলি' তাঁর পুনঃ প্রসাদ করিলা।
'গোবর্ধনের শিলা; 'গুঞ্জা-মালা' তাঁরে দিলা ॥
গোবর্ধন-শিলা প্রভু হৃদয়ে-নেত্রে ধরে।
কভু নামায় ঘ্রাণ লয়, কভু শিরে করে ॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলারে কহেন প্রভু–'কৃষ্ণ কলেবর' ॥
এইমত তিন বৎসর শিলা-মালা ধরিলা।
তুষ্ট হঞা শিলা-মালা রঘুনাথে দিলা ॥
প্রভু কহে–"এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥[৩৩]
চৈ. চ. অন্ত্য/৬/২৮৭, ২৯১-২৯৫

চৈতন্যদেবের নির্দেশনায় রচিত স্মৃতি গ্রন্থ যা সমাজ সংস্কারের জন্য অনন্য হিসেবে বিদিতঃ

চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি ধর্মে হাজার হাজার নর-নারী তাঁর অনুসারী হয়েছিল। অনুসারী ভক্তরা নতুন পথে এসে মুক্তির বাসনা অন্তরে ধারণ করে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল। কিন্তু নব্য প্রেমধর্মে তাদেরকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে হলে একটি বিধিবদ্ধ নীতিমালা থাকতে হবে। কারণ ভক্তিধর্মে যারা এসেছে তাদেরকে সাধারণত বৈষ্ণব বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। চৈতন্যদেব তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সমাজ সংস্কারকে স্থায়ীভাবে রূপদান করার জন্য স্মৃতিগ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত নিয়ে সনাতন গোস্বামীকে সে বিষয়ে সূত্র নির্ণয়ের শিক্ষা দান করেছিলেন।

বৈষ্ণব ধর্মে বৈষ্ণব আচার থাকতে হবে। যথা– বৈষ্ণবদের নিত্যকৃত্য, বিভিন্ন ব্রতাদি পালন, বৈষ্ণব বিবাহ, বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ, পুরশ্চরণবিধি, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, অর্চন, দীক্ষাবিধি, সদাচার, গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, শৌচবিধি, কামগায়ত্রী, তিলকবিধি, গৃহ প্রবেশ, শালগ্রাম শিলা পূজা, যজ্ঞোপবীত ধারণ, চাতুর্মাস্য ব্রত, নৈবেদ্য, জপবিধি, পূজার্চনবিধি, একাদশী ব্রত, বিভিন্ন উপবাস বিধি, হবিষ্যান্ন, শিবরাত্রি ব্রত, নৃসিংহ চতুর্দশী, রাম

নবমী, জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, গোবর্ধন পূজা, তর্পণ, মন্দির প্রতিষ্ঠা, বিষ্ণু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, বাস্তু পূজা প্রভৃতি বিষয়ে বিধিবদ্ধ নিয়ম থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ– চৈতন্যদেবের অনুসারীদের একটি শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রাখার জন্য স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল, সেটির নাম হচ্ছে *হরিভক্তিবিলাস*। যদি এই স্মৃতিগ্রন্থ রচনা না করা হতো, তাহলে চৈতন্যদেবের আন্দোলনের ফসল অল্প দিনের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে যেত। চৈতন্যদেব তাঁর ধর্ম-দর্শন ও আদর্শকে একটি শাস্ত্রীয় মানদণ্ডের মধ্যে রাখার জন্য স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের অনুসারীদের এই প্রাত্যহিক বিধি নিয়ম এবং বিভিন্ন ব্রত ও সদাচার পালন করতে হয়। একজন বৈষ্ণবকে পঞ্চরাত্রিক দীক্ষা অর্থাৎ– গায়ত্রী দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। সে জন্য তাঁর যোগ্যতার প্রয়োজন হয়ে থাকে। কেননা আচার ও সংস্কার না থাকলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। দীক্ষার মাধ্যমে সে পবিত্র হয় এবং দ্বিজত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে থাকে। দীক্ষা সম্বন্ধে *ভক্তি-সন্দর্ভে* বর্ণনা করা হয়েছে–

দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব- কোবিদৈঃ ॥

অর্থাৎ– যা থেকে দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় এবং পাপের পরিপূর্ণভাবে ক্ষয় হয়, তত্ত্বশাস্ত্রবিদগণ্ তাকে 'দীক্ষা' বলে নির্ণয় করেছেন। দীক্ষা এমনই একটি দিব্য ব্যাপার যা মন্ত্রের গুণে শিষ্যের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত করে। যেমন– পরশমণির স্পর্শে লোহা স্বর্ণে পরিণত হয়, তেমনি একজন ভক্ত দীক্ষা গ্রহণের পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে দিব্য গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হন। এ প্রসঙ্গে *ভক্তি-সন্দর্ভে* বর্ণনা করা হয়েছে–

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা–বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

অর্থাৎ– পারদের সংস্পর্শে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কাঁসা যেমন স্বর্ণে পরিণত হয়ে থাকে, তেমনি দীক্ষা লাভের ফলে ঐব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করে থাকে।[৩৪]

চৈতন্যদেবের ভক্তি পথে সমাজের যেকোনো স্তরের ব্যক্তি আসতে পারত। সবার জন্য দ্বার উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁর নাম প্রেমধর্মের অনুসারীদের অবশ্যই চৈতন্যদেবের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করতে হয়েছিল। আর সেটির জন্য ব্যবহারিকভাবে যে শাস্ত্রের প্রয়োজন ছিল, সেটি হচ্ছে স্মৃতিশাস্ত্র। এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে স্মৃতিগ্রন্থ হিসেবে হরিভক্তিবিলাসের উদ্ভব হয়েছিল।

সমাজের শুধু উঁচু স্তরের নয়, নিম্ন স্তরের মানুষও অর্থাৎ– স্ত্রী, শূদ্র, চণ্ডালও চৈতন্যদেবের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে পঞ্চরাত্রিক দীক্ষা লাভ করে কৃষ্ণের প্রিয় হতে পারে। এখানে কোন জাত-বর্ণের ভেদাভেদ নেই। শুধু প্রয়োজন শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করার। এ প্রসঙ্গে *হরিভক্তিবিলাসে* বর্ণনা করা হয়েছে–

তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি।
সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াম্ ॥
হরিভক্তিবিলাস ১/৯৪

অর্থাৎ– ঈশ্বর সম্বন্ধে নিষ্ঠাপরায়ণ সাধ্বী স্ত্রী ও সত্যবাদী শূদ্রেরও পঞ্চরাত্রিক গায়ত্রী দীক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

তাই দেখা যায় যে, চৈতন্যদেব তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম-সম্প্রদায়কে রক্ষার করার জন্য প্রামাণিক শাস্ত্রীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অর্থাৎ– গীতা, মহাভারত, পুরাণ-উপপুরাণ, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে বিষ্ণু মাহাত্ম্যের সারগর্ভতত্ত্ব নিয়ে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল। যার ফলে একদিকে যেমন বৈষ্ণব সমাজ একটি আদর্শ বিধিবদ্ধ নিয়মের মধ্যে শৃঙ্খলায়িত হলো, তেমনি অন্যদিকে এই সম্প্রদায়ের আদর্শগত মান-মর্যাদা দর্শনে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হলো। কারণ প্রতিটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের একটি আদর্শ ভিত্তিক সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় বিধি বিধান থেকে থাকে, তা না হলে সেই ধর্ম কাচের পাত্রের মতো ভঙ্গুর হয়ে যায়। তাই সমাজ সংস্কারের অনন্য অবদান হিসেবে এই স্মৃতিগ্রন্থ *হরিভক্তিবিলাসের* ভূমিকা সমাজ জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।[৩৫]

শ্রীরূপ-সনাতনকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ:

গৌড়রাজ নবাব হোসেন শাহের রূপ-সনাতন নামে দুইজন মন্ত্রী ছিলেন। এই দুই ভ্রাতা রাজকার্যের বিচক্ষণতায় ও নীতিআদর্শে নবাবের অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। দুই ভ্রাতা রাজমন্ত্রী হলেও তাঁরা বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশজাত ছিলেন। সনাতন গোস্বামী তাঁর রচিত *বৃহৎভাগবতামৃতের* তৃতীয় শ্লোকের নিজকৃত টীকায় বর্ণনা করেছেন যে– তাঁরা কর্ণাট দেশের বিখ্যাত ব্রাহ্মণকুলাচার্য জগৎগুরু বংশজাত কুমারদেবের সন্তান ছিলেন।[৩৬] তাঁরা ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত হয়েও নবাব হোসেন শাহের সংস্পর্শে এসে তাঁদের নানা প্রকার স্বধর্ম বিরুদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়েছিল। নবাব হোসেন শাহ তাঁর শাসনামলে হিন্দুদের বহু মন্দির ধ্বংস করেন এবং অনেক লোক ধর্মান্তরিত হয়ে জাতিচ্যুত হয়েছিল। এই সকল কারণে দুই ভাই নিজেদেরকে অত্যন্ত নীচ, হীন, অধম ও পতিত বলে মনে করে উদ্ধারের নিমিত্তে চৈতন্যদেবকে পত্র প্রেরণ করেন। চৈতন্যদেব তাঁদের উদ্ধারের জন্য গৌড়ের রামকেলিতে আগমন করলে রূপ ও সনাতন তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করে বিনীত প্রার্থনা করেন। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাওয়া যায়–

নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥[৩৭]
চৈ. চ-মধ্য /১/১৮৯
ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী-সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥
মোর কর্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া।
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।

পতিতপাবন তুমি–সবে তোমা-বিনে ॥[৩৮]

চৈ.চ-মধ্য/১/১৮৬-১৮৮

নবাব হোসেন শাহ প্রদত্ত নাম ছিল 'সাকর মল্লিক' ও 'দবির খাস'। চৈতন্যদেব করুণা প্রদর্শন করে তাঁদের উদ্ধার করে নাম দিলেন রূপ-সনাতন। তিনি এই রূপকে প্রয়াগে রসতত্ত্ব শিক্ষা দেন এবং সনাতনকে কাশীতে বসে কৃষ্ণতত্ত্ব শিক্ষা দান করে বৃন্দাবনে গিয়ে শাস্ত্র রচনার নির্দেশ দান করেন। পরবর্তীতে এই দুই বৈষ্ণব গোস্বামী শিরোমণি ভক্তিবিনয়বশত নিজেদেরকে নীচ ও হীন জ্ঞানে পুরীতে যবন হরিদাস ঠাকুরের কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁরা ম্লেচ্ছদের সংস্পর্শে থাকায় জগন্নাথদেবের সেবকদের মর্যাদা রক্ষার্থে তাঁরা পতিতজ্ঞানে হরিদাসের কুটিরে অবস্থান করেন। কিন্তু চৈতন্যদেব সব বিষয়ে অবগত ছিলেন। তিনি রূপ-সনাতনের ভক্তির মর্যাদার স্তর অনুধাবন করে হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করতেন। সেই কারণে চৈতন্যদেবের উদ্যোগে ও পরিচালনায় পুরীর শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে রূপের *বিদগ্ধমাধব* ও *ললিতমাধব* নাটক রচনার জন্য রামানন্দ রায় রূপের প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাওয়া যায়–

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি' সহস্র-বদনে ॥
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥[৩৯]

চৈ. চ-অন্ত্য/১/১৯২-১৯৩

বিদ্বান সমাজ রূপের প্রশংসায় মুগ্ধ হয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং চৈতন্যদেব বললেন–

ব্রজে যাই' রসশাস্ত্র করিহ নিরূপণ।
লুপ্ত-তীর্থ সব তাঁহা করিহ প্রচারণ ॥
কৃষ্ণ সেবা, রসভক্তি করিহ প্রচার।
আমিহ দেখিতে তাঁহা যাইমু একবার ॥[৪০]

চৈ. চ-অন্ত্য/১/২১৮-২১৯

সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবন থেকে পুরীতে এলে চৈতন্যদেব সনাতনকে বললেন–তোমাকে দিয়ে আমি কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব প্রকাশ করব এবং লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও তার প্রকাশ করব। এই বিষয়ে *চৈতন্যরচিতামৃতে* পাই–

ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য, আর বৈষ্ণব-আচার ॥
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণেপ্রেমসেবা-প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ ॥[৪১]

চৈ. চ-অন্ত্য/৪/৭৯-৮০

সনাতন গোস্বামী কণ্ডুরসার কারণে জগন্নাথদেবের সেবকদের স্পর্শ ভয়ে অপরাধ জ্ঞানে নিজেকে পতিত মনে করে গ্রীষ্মের মধ্যে তপ্ত বালুকাময় সমুদ্রের পথ দিয়ে যাতায়াত করতেন। কিন্তু জগন্নাথ মন্দিরের নিকট থেকে যাতায়াত করতেন না। এমনকি রূপ-সনাতন নিজেদেরকে পতিত মনে করে কোন দিনই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেননি। এই মর্যাদা দর্শনে চৈতন্যদেব বললেন–

তথাপি ভক্ত-স্বভাব–মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক,– দুই হয় নাশ ॥
চৈ. চ- অন্ত্য/৪/১৩০-১৩১

এইভাবে চৈতন্যদেব তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পার্ষদ ও ভক্তপ্রবর শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কুলতিলক এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশজাত রূপ-সনাতনকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। কেননা যবন সংস্পর্শে থাকতে অনেকে তাঁদের নিয়ে উপহাস করেছেন যে, তাঁরা জাতিচ্যুত বা পতিত হয়েছেন। কিন্তু চৈতন্যদেব ভক্তিবলে শাস্ত্র অনুশীলন ও সংস্কারের দ্বারা রূপ-সনাতনকে দিয়ে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। মহান মহান শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত থাকতেও চৈতন্যদেব রূপ-সনাতনকে দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, রস শাস্ত্র প্রণয়ন, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, মন্দির নির্মাণ, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, ব্রজলীলারস প্রকাশ ও তাঁর প্রচার করিয়ে বিশ্ববৈষ্ণব সমাজে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই ভাবে চৈতন্যদেব সংস্কারের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করে সমাজের কল্যাণ করেছেন, যা ভারতীয় বৈষ্ণব ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত।[৪২]

আচার ও যোগ্যতার মাধ্যমে সম্মানী ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হিসেবে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ:
শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও কৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। বেনাপোলে হরিদাস ঠাকুর বসবাস করতেন এবং প্রতিদিন তিন লক্ষ বার নাম জপ করতেন। রামচন্দ্র খাঁন সেখানের শাসনকর্তা ছিলেন । তিনি তাঁকে ধর্মপথ থেকে চ্যুত করার জন্য লক্ষহীরা নামে এক অপূর্ব সুন্দরী বেশ্যাকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনরাত পরে হরিদাস ঠাকুরের আশীর্বাদে বরং সেই বেশ্যা নিজেই হরিদাসের শিষ্যত্ব বরণ করে পরম বৈষ্ণবী হন। যথা–

কীর্তন করিতে তবে রাত্রিশেষ হৈল।
ঠাকুরের সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরি গেল ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুরের চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে ॥[৪৩]
চৈ.চ-অন্ত্য/৩/১২১-১২২

মুসলমান হয়েও হরিনাম কীর্তনের জন্য ফুলিয়ার কাজী মুলুকের অধিপতির নিকট বিচার দাবী করলে, মুলুকের অধিপতি তাঁকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু তাতে হরিদাসের মৃত্যু হয়নি।

কাজী বলে, 'বাইশ বাজারে বেড়ি' মারি'।
প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি' ॥[৪৪]
চৈ. ভা. আদি/১৬/৯৬

চৈতন্যদেবের সময় ব্রাহ্মণ সমাজব্যবস্থা এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল যে, ব্রাহ্মণগণ সমাজের জন্য যে বিধান দিবেন সেটিই সঠিক হবে, শাস্ত্রের ধার তাঁরা ধারতেন না। চৈতন্যদেব সমাজের প্রতি ব্রাহ্মণদের দ্বারা এমন অশাস্ত্রীয় সমাজ ব্যবস্থার কঠোর বিরোধী ছিলেন। *গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে–

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
গীতা/৯/৩২

অর্থাৎ– হে পার্থ, নীচ কুলে জন্ম স্ত্রী, বৈশ্য বা শূদ্রও যদি আমার শরণ নেয়, তাহলে তারাও আমার চিন্ময় ধাম লাভ করতে পারে। *গরুড় পুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে–

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্ত-পারগঃ॥
সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥

অর্থাৎ– যজ্ঞ অনুষ্ঠানের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্রাহ্মণ একজন সাধারণ ব্রাহ্মণ থেকে শ্রেষ্ঠ, আবার এই প্রকার যজ্ঞের পৌরোহিত্যকারী ব্রাহ্মণদের থেকে সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, আবার এরূপ সর্ববেদান্তবিদ থেকে একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, আবার এরূপ বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ বৈষ্ণব থেকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত নির্মৎসর ভক্ত অর্থাৎ– মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ। *ভক্তিসন্দর্ভে*-১৭৭নং শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে–

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥

অর্থাৎ-চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও যদি আমার ভক্ত না হয়, তবে সে আমার প্রিয় নয়। আবার চণ্ডালও যদি আমার ভক্ত হয়, তাহলে সেই আমার অত্যন্ত প্রিয়। এইরূপ শুদ্ধ ভক্তকে দান করা উচিত, কেননা সে আমার মত পূজ্য।

এদিকে হরিদাস যবনকুলের হলেও তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ বার কৃষ্ণনাম জপ করেন এবং শাস্ত্রীয় অন্যান্য বিধি গভীর নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে পালন করেন। তিনি শ্রীহরির পরম ভক্ত। এইরূপ সংস্কারের কারণে চৈতন্যদেব

হরিদাসকে পরম আদর করে বুকে টেনে নিতেন এবং সমাজের সবার সম্মুখে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে উচ্চ প্রশংসা করতেন। তিনি নদীয়ার নগরে-গ্রামে হরিনাম প্রচারের জন্য নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন। এইরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি হরিদাসকে কোনক্রমেই ব্রাহ্মণ সমাজ মেনে নেননি। সমাজকে শিক্ষা প্রদানের জন্য চৈতন্যদেব অত্যন্ত কঠোরভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে, হরিদাস ব্রাহ্মণ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। সেই শিক্ষার আলোকে ও সিদ্ধান্তে অদ্বৈত আচার্য যিনি মহান বৈদান্তিক ও কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের আচার্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পিতৃ শ্রাদ্ধের সময়ে হরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হিসেবে গণ্য করে তাঁকে শ্রাদ্ধীয় পাত্রান্ন ভোজন করানো হয়েছিল। এইভাবে চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণদের গোড়ামি ও কুসংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত করে মানবকল্যাণ করেছিলেন।[৪৫]

নিম্নজাতের সনোরিয়া ব্রাহ্মণকে সমাজে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে চৈতন্যদেবের সমাজকল্যাণ:

চতুরাশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস আশ্রম শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর পদমর্যাদা বৃন্দাবন ধামে সর্বোচ্চ শিখরে। আর চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে তাঁর সম্মান ও মহিমা যেমন সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল, তেমনি তাঁর মর্যাদা সবার শীর্ষে। সেই হিসেবে চৈতন্যদেব যত্রতত্র বাস বা সেবা গ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু তিনি শাস্ত্রীয় শুদ্ধাচারে বিশ্বাসী ছিলেন। মথুরাতে সনোরিয়া ব্রাহ্মণ কুলের এক ব্যক্তি কৃষ্ণ ভজন করতেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ হলেও সেই সমাজে মর্যাদা পেতেন না। সেই কারণে তৎকালীন কোন সন্ন্যাসী তাঁর গৃহে অতিথি হতেন না। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁর বৈষ্ণব শুদ্ধাচার দর্শন করে তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁকে নিয়ে বৃন্দাবনের বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করেন। যদিও সনোরিয়া ব্রাহ্মণ বলেছিলেন যে– আমার গৃহে আপনার প্রবেশ হলে লোকেরা আপনার নিন্দা করবে। কিন্তু চৈতন্যদেব লোকনিন্দার চিন্তা না করে সত্যিকারের বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণ পদমর্যাদা দিয়ে সমাজ সংস্কারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কেননা শাস্ত্রানুসারে মানুষ আচার ও শিক্ষা সংস্কার দ্বারা পবিত্র হতে পারে। সমাজে প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। চৈতন্যদেব সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা প্রদান করে সমাজের কল্যাণ করেছেন।তাই *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাই–

যদ্যপি 'সনোড়িয়া' হয় সেই ত' ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন ॥
'মূর্খ'-লোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পরিমু সেই 'দুষ্টে'র বচন ॥
প্রভু-কহে,– শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ।
সবে 'এক'- মত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ॥[৪৬]
চৈ. চ-মধ্য/১৭/১৭৯, ১৮৩-১৮৪

শিক্ষা ও সংস্কারের মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করে চৈতন্যদেবের সমাজকল্যাণ:

জগাই-মাধাই নামে দুই ভাই ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তারা নিষিদ্ধ সর্বপ্রকার পাপ কর্ম করেছিল। তারা মাতোয়াল ও মহাদস্যু ছিল। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও তারা সর্বদা মদ্যপান করে গোমাংস ভক্ষণ করত। চুরি,

ডাকাতি, পরস্ত্রী গমনসহ নিষিদ্ধ পাপ কর্মে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তাদের পিতৃ-মাতৃকুল উচ্চ ব্রাহ্মণবংশের ছিল। তাদের বংশে তিল পরিমাণ দোষ ছিলনা। তাদের জঘন্য পাপকার্যের কারণে তাদের বংশ ও আত্মীয়রা পরিপূর্ণভাবে জগাই-মাধাইকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু চৈতন্যদেব করুণার সাগর। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হচ্ছে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণি। চৈতন্যদেব অধঃপতিত এই ব্রাহ্মণদ্বয়কে সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপনের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ সমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে তাদের উদ্ধার করেন। চৈতন্যদেব জগাই ও মাধাইকে করুণা ও শিক্ষারূপ সংস্কার দ্বারা এতটাই পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন যে, তারা সমাজে মহান তপস্বী হিসেব পরিচিতি লাভ করেছিল। তারা দুই ভাই ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গাজলে স্নান করে প্রতিদিন দুই লক্ষ বার কৃষ্ণনাম জপ করত। চৈতন্যদেবের আদেশ ও নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে মহান ভক্তে পরিণত হয়েছিল। এমনকি তারা নদীয়ার গঙ্গা ঘাটে মার্জনী নিয়ে প্রতিদিন গঙ্গাঘাট পরিষ্কার করত। গঙ্গাঘাটে স্নান-পূজার জন্য যে সকল ব্যক্তি যেতেন তাদের নিকট দুই ভাই অনুতপ্ত হয়ে করুণ সুরে পূর্বের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত।

এইভাবে চৈতন্যদেবের আদর্শ শিক্ষা ও সংস্কারের মাধ্যমে তারা আদর্শ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করেছিল। পরবর্তী সময়ে তাদের আচার, ব্যবহার, ত্যাগ, সেবানিষ্ঠা ও সাধনার কঠোরতার কারণে সমাজে তারা তপস্বী ও সন্ন্যাসীর মর্যাদা লাভ করেছিল। এদের এরূপ পরিবর্তনে তৎকালীন নদীয়ার সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। সমাজের বহু মানুষের চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটেছিল। সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে চৈতন্যদেব সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করেছিলেন। পরে চৈতন্যদেবের শিক্ষায় এই দুই ভাই সবরকম পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল চরিত্রের অধিকারী হয়ে যোগ্য ব্রাহ্মণ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। চৈতন্যদেবের জগাই-মাধাইকে সংস্কারের মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করা মহান কার্য ছিল। *চৈতন্যভাগবতে* পাই–

ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ।
ডাকা-চুরি, পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ ॥
লোমহর্ষ, মহা-অশ্রু, কম্পসর্ব্ব-গায়।
জগাই-মাধাই দোঁহে গড়াগড়ি যায় ॥
কার শক্তি বুঝিতে চৈতন্য অভিমত।
দুই দস্যু করে দুই মহাভাগবত ॥
তপস্বী সন্ন্যাসী করে পরম পাষণ্ড।
এই মত লীলা তান অমৃতের খণ্ড ॥[৪৭]

চৈ. ভা-মধ্য/১৩/৩৩, ২৪২-২৪৪

জগাই-মাধাই দুই চৈতন্য-কৃপায়।
পরম ধার্ম্মিকরূপে বসে নদীয়ায় ॥
ঊষঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।

দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে ॥
আপনারে ধিক্কায় করায় অণুক্ষণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' বলি' করায় ক্রন্দন ॥
পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
'ব্রহ্মচারী' হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥
নিরবধি গঙ্গা দেখি' থাকে গঙ্গাঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লঞা আপনেই ঘাটে ॥
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায়।
'মাধাইর ঘাট' বলি' সর্বলোকে গায় ॥[৪৮]
চৈ. ভা-মধ্য/১৫/৪-৬, ৯২-৯৪

মন্দির নির্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা:

চৈতন্যদেবের নির্দেশে সনাতন গোস্বামী উত্তর ভারতের বৃন্দাবনে এসে একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরটি বৃন্দাবনের দ্বাদশ আদিত্য টিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেটির নাম হচ্ছে মদনমোহন মন্দির।[৪৯] শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও বৃন্দাবনে এসে বৃন্দাবনে বিখ্যাত গোবিন্দদেব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে তিনি গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে অভিষেক করিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য গোস্বামীরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার করেছিলেন।[৫০]

লুপ্ততীর্থ উদ্ধার:

চৈতন্যদেবের নির্দেশে সনাতন গোস্বামী মথুরা গিয়ে মথুরা মাহাত্ম্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তিনি গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তথ্য সংগ্রহ করে বৃন্দাবনের বিভিন্ন বনে ভ্রমণ করেন এবং বৃক্ষের নিচে রাতযাপন করতেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থগুলো উদ্ধার করেন।[৫১]

মানবকল্যাণে চৈতন্যদেবের অবদান সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি:

১। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বলেছেন– বর্তমান ভারতের কল্যাণ-রাষ্ট্র গঠনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান গ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে।

২। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বলেছেন– শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনাদর্শ ও শিক্ষা আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছে।

৩। জি. ভি রাজামন্নার বলেছেন– বিশ্বের বর্তমান ভীষণ দুরবস্থার দিনে মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেমভক্তি বিশ্বের সর্বত্র বিপুলভাবে প্রচারের আবশ্যকতা আছে।

৪। সাবেক মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেছেন– পাঁচশত বৎসর পূর্বে বাংলার মাটিতে প্রেমভক্তি বিলাবার জন্য ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব।

৫। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় বলেছেন– মানুষের মৌলিক সত্তা প্রেমের ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত। এই সত্য শ্রীগৌরাঙ্গ দেব শিক্ষা দিয়েছেন। বিশ্ব ধর্ম জগতে বাংলার এই নীতি অনুসৃত হলে মানব ধর্মের উৎকর্ষ হবে।

৬। আচার্য ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী বলেছেন– বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। বিষয়-বিচার-বিকৃত মানুষের চৈতন্য সম্পাদনে, বিষণ্ন জীবকে প্রসন্ন করায় তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা চিরস্মরণীয়।

৭। ওয়ালটার-ই-হারগর্ডেন বলেছেন– এই প্রদেশে রাজপ্রাসাদ হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রটি পর্যন্ত সকলেরই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সম্বন্ধে আশ্চর্য অনুরাগ।

৮। অধ্যাপক টুসি বলেছেন– শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহিমা জ্ঞান ও প্রশংসার বৃত্তি দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর প্রেমের বার্তা সমগ্র মানব জাতিকে রক্ষা করতে পারে।

৯। উপাচার্য ড. শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেছেন– মনুষ্য জাতির বর্তমান সামাজিক ও মনস্তাত্বিক সমস্যার দিনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী বর্তমান জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

১০। ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন– শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমের পথই প্রকৃত পথ। যুগ-যুগান্তরের প্রাচীন সামাজিক মূল্য ও ভগবৎ প্রেমের সঙ্গে অভিন্ন যে ভক্তি, তাকে সুদৃঢ় করতে মানুষের উচিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শকে অনুসরণ করা।

১১। সাবেক রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং বলেছেন– আমি খুব জোর দিয়ে বলতে পারি সেই অধঃপতনের সময়ে যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ না করতেন, তাহলে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করা যেত না এবং তাঁর সময়োচিত বাণী ব্যতীত আমাদের দেশের মানুষ চরম অধঃপতনের মধ্যে পতিত হতো। তিনি এসে পতনের মুখ হতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করেছেন। সেই সময়ে মুসলমান আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে। আর হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত ছিল, রাজনৈতিক জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পারমার্থিক শিক্ষা দিয়ে সমাজকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রেমভক্তি বিস্তার করেছিলেন।

১২। ড. কাজিনস বলেছেন– শীঘ্রই এমন দিন আসবে যেদিন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেমধর্ম সমস্ত বিশ্বকে মাতিয়ে তুলবে এবং তাঁর চিন্তা ও ভাবের অপ্রতিহত প্রভাব সমস্ত জগৎকে জাগ্রত করে দিবে।

১৩। টি. স্টিভ বলেছেন– ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেমধর্মের তুল্য উদার ও মহান্ ধর্ম জগতে এপর্যন্ত প্রচারিত হয়নি। আমার ইচ্ছা ইংল্যান্ডের প্রতিটি গীর্জায় শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত পঠিত হোক। তাহলে প্রেমের অপূর্ব রসাস্বাদনে মানব ধন্য হবে।

১৪। ড. হেমেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বলেছেন– শ্রীমহাপ্রভুর জীবনের মতো এত বড় কাব্য ভারতে কখনও রচিত হয়নি। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনে ও নিত্যানন্দ প্রভুর জীবনে যে প্রেমময় রসমূর্তি ফুটে ছিল, নবদ্বীপ তথা সমগ্র বাংলাদেশ সে রূপের তরঙ্গে ভেসে গেল। ঘরে ঘরে সে আদর্শের প্রতিষ্ঠা হলো। প্রতিটি গৃহই গোবিন্দের শ্রীমন্দির হয়ে উঠল।

১৫। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন– শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রভাব ভারতের সর্বত্র। যেখানে ভক্তি সাধনার পরিচয় আছে, সেখানেই তাঁর সমাদর ও অর্চনা।

১৬। সরোজিনী নাইডু বলেছেন– শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত প্রেমধর্মই যুগধর্ম। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শুধু বাঙালির জন্য নন–তিনি সর্ব জগতের জন্য। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম যাজন করুন–সর্ব অনর্থের নাশ হবে।

১৭। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন– শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিখিল প্রেমিকের শ্রেষ্ঠ রাজ কুমার।

১৮। শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস বলেছেন– কাঙ্গালের ঠাকুর প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বর্তমান যুগের প্রথম সন্ধ্যায় জগতে আবির্ভূত হয়ে নিগূঢ় প্রেমসম্পদ পাত্রাপাত্র নির্বিশেষে জগদ্বাসীকে দান করেছেন। বর্তমান কালের মানব তাঁরই অনুকম্পার উপর নির্ভর করে সর্বোত্তম প্রেমভক্তি লাভের আশা করছে। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুকম্পা ব্যতীত কালগ্রস্ত মানব অন্য কোন উপায়ে পরম প্রেমের অধিকারী হতে পারবে না।

১৯। ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন– পৃথিবীতে প্রেম একবার মাত্রই রূপ পরিগ্রহ করেছিল–তা বঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে।

২০। শ্রীহরিদাস গোস্বামী বলেছেন– শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব-অবতারের সার। জীবের প্রতি তাঁর এত দয়া, এত করুণা, এত কৃপা শ্রীভগবান কোন অবতারেই প্রকাশ করেননি। আর এমন মধুর সর্ব-চিত্তাকর্ষী লীলাও অন্য কোন অবতারে প্রকট করেননি। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলির প্রচ্ছন্ন অবতার। তাঁর লীলারস সমুদ্র বহুমূল্য লীলারত্নে পরিপূর্ণ।

২১। শ্রীকেদারনাথ দত্ত (ভক্তিবিনোদ ঠাকুর) বলেছেন– শচীনন্দন শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে অবতীর্ণ হয়ে স্বীয় পবিত্র চরিত্র ও মধুর উপদেশাবলী প্রদান পূর্বক জগৎ জীবকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষামৃতই নিখিল জীবের পরামৃত ধন, সর্ব শাস্ত্রের সার। তিনি প্রেমধর্মের নিত্যতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ দ্বারা সম্বন্ধ জ্ঞানে সম্পূর্ণ শুদ্ধতা শিক্ষা দিয়ে জগৎকে বিতর্করূপ অন্ধকার হতে উদ্ধার করেছেন।

২২। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী (গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা) বলেছেন – শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপকার সকল দেশে, সকল পাত্রে, সকল কালের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার। এ উপকার সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপকার।[৫২]

তথ্যনির্দেশ :

১. ড. রমেশচন্দ্র মজুদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, প্রকাশক শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, ৫ম সংস্করণ, মার্চ, ১৯৯৮, পৃ. ৩৩২

২. ঐ, পৃ. ২৬৫-২৬৮

৩. ড. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ্ , কলকাতা, ২য় মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৯১, পৃ. ৩০৯-৩১০

৪. ড. রমেশচন্দ্র মজুদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৮-২৫৯

৫. রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি, কলকাতা,সপ্তম মুদ্রণ,আগস্ট ২০১৭, পৃ. ২৩-২৭

৬. ঐ. পৃ. ৩২-৩৪

৭. ঐ. পৃ. ৩৫-৩৮

৮. সত্যজিৎ বিশ্বাস, 'শ্রীচৈতন্য জীবনের দুই রূপকার এবং কুলিয়াপাটে গোপাল উদ্ধার' *শ্রীচৈতন্য : একালের ভাবনা*, ড. তাপস বসু সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৩২৬-৩২৭

৯. ইমানুল হক, 'বাংলার প্রথম গণ-আন্দোলক', *শ্রীচৈতন্য : একালের ভাবনা*, ঐ, পৃ. ৪৮৯-৪৯২

১০. মধুমিত্র, 'মধ্যযুগীয় সামাজিক বিন্যাসের প্রতিস্পর্ধী অপর ভুবনঃ চৈতন্যদেবের ভাবনা ও কর্মতৎপরতা'। *শ্রীচৈতন্য : একালের ভাবনা*, ঐ, পৃ. ১৬৪-১৬৬

১১. ঐ, পৃ. ১৬৬-১৬৮

১২. ঐ, পৃ. ১৬৮

১৩. শ্রীমৎ ভক্তিসুন্দর গোবিন্দদেব গোস্বামী, *চৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, মায়াপুর, নদীয়া, ১ম সংস্করণ, ৮ মার্চ, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৩-১৩৯

১৪. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্য ১ম খণ্ড, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর নদীয়া, দ্বাদশ সংস্করণ, ২০১৬, অন্ত্যখণ্ড, পৃ. ২২২

১৫. শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী, *চৈতন্যভাগবত*, সংকীর্তন বিভাগ, ইসকন, মায়াপুর, নদীয়া, রথযাত্রা ২০০৭, পৃ. ১৭২

১৬. মধুমিত্র, 'মধ্যযুগীয় সামাজিক বিন্যাসের প্রতিস্পর্ধী অপর ভুবনঃ চৈতন্যদেবের ভাবনা ও কর্মতৎপরতা' *শ্রীচৈতন্য : একালের ভাবনা*, পৃ. ১৬৯-১৭১

১৭. ড. রমেশচন্দ্র মজুদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮১-২৯১

১৮. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*, ভক্তিবেদান্ত বুকট্রাস্ট, মায়াপুর নদীয়া, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ২৩২-২৩৩

১৯. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৮-২৬৪

২০. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ১২৬

২১. ঐ, পৃ. ২৯৯

২২. ঐ, পৃ. ১৩৩

২৩. স্বামী সারদেশানন্দ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩তম পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৬, পৃ. ৩০৪-৩০৫

২৪. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্য ১ম খণ্ড, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪২২, পৃ. ৬৫১-৬৫২

২৫. ঐ পৃ. ৬১২

২৬. ঐ, মধ্য ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭২-৬৭৩

২৭. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব মহারাজ, *চৈতন্যভাগবত*, শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, মায়াপুর, নদীয়া, ২য় সংস্করণ, ২৩ মার্চ, ২০১৬, পৃ. ৩৭৪

২৮. গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, *বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য*, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা, অরুণা প্রকাশন সংস্করণ, রথযাত্রা, ১৮ জুলাই, ২০১৫ পৃ. ২৬২-২৬৫

২৯. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্য, পৃ. ২৭৪-২৭৬

৩০. ক্ষিতিমোহন সেন, *জাতিভেদ*, প্রকাশক অপর্ণা বসাক, তথাগত, কলকাতা, তথাগত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২১, পৃ.১৩-১৫

৩১. দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার, *বাঙালি হিন্দুর জাত-জগৎ*, একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৬১

৩২. ঐ. পৃ. ৩৯৫

৩৩. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্য, পৃ. ৩৬৮-৩৭০

৩৪. ঐ, মধ্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮-২৯

৩৫. ঐ, মধ্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১৬-৮১৭

৩৬. ড. নরেশচন্দ্র জানা, *বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৪১-৪২

৩৭. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্য ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০

৩৮. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্য ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬

৩৯. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ৩২১

৪০. ঐ, পৃ. ৩২২

৪১. ঐ, পৃ. ৩৩৯

৪২. ঐ, পৃ. ৩৪০

৪৩. ড. বিধানচন্দ্র বিশ্বাস, *চৈতন্যচরিতামৃত*, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ভারত, ১৩তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৯ পৃ. ৫২৯

৪৪. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ, *চৈতন্যভাগবত*, পৃ. ১১১

৪৫. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্য, পৃ. ১৮০-১৮৩

৪৬. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ২১৯

৪৭. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ, *চৈতন্যভাগবত*, পৃ. ২১১-২১৭

৪৮. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ২২৫-২২৮

৪৯. শ্রীনরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর, *শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর*, শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী সম্পাদিত, গৌড়ীয় মিশন, কলকাতা, ৫ম সংস্করণ, ১২ নভেম্বর, ২০১৫, পৃ. ১০২-১০৩

৫০. ঐ, পৃ. ৯৯-১০১

৫১. ড. সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়, *চৈতন্যচরিতামৃত*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি. কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৩৭০

৫২. শ্রীতারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী, *মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব* (নীলাচল লীলা), শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির, নদীয়া, ১ম প্রকাশ, জন্মাষ্টমী ২০১২, পৃ. ১৫১৩-১৫১৫

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যদেবের মানবতাবাদ

বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির মুক্তির জন্য চৈতন্যদেব তাঁর দর্শন, শিক্ষা ও প্রেমভক্তি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রচার করেছেন। মানুষের মুক্তির জন্য তাঁর হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি সমগ্র জীবন মানব মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই বিশ্বজনীন চেতনা ও মুক্তির বাণী প্রচার হচ্ছে চৈতন্যদেবের মানবতাবাদ।

সর্বজীবে সাম্য দর্শন :

সবসময়ই সমাজে বিত্তবানদের ক্ষমতা ছিল এবং তাঁরা সমাজের শ্রেষ্ঠ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য প্রভাব বিস্তার করতেন। অন্যদিকে দরিদ্র, পতিত ও অস্পৃশ্যরা নানা কারণে সমাজে নগণ্য অসহায় ছিল। সমাজে এই দুই শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব, ব্যবধান সর্বদাই ছিল। চৈতন্যদেবের সময় স্মৃতি শাস্ত্রের ও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে বাঙালি জাতি দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল। ঐশ্বর্যবান বা বিত্তবানদের নিকট চৈতন্যদেবের সমাদর থাকলেও তাঁর হৃদয়ের টান ছিল অসহায় পতিতদের দিকে। যেমন তিনি অদ্বৈতাচার্যের গৃহে বহু ব্যঞ্জনে প্রস্তুত খাবার গ্রহণ করতেন, তেমনি আবার নিতান্ত দরিদ্র শ্রীধরের গৃহে ছিদ্রযুক্ত লোহার পাত্রে জলপান করতেন। তাঁর ভাবনা ছিল সবার হৃদয়ে সেই পরম পুরুষ রয়েছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমান। ধনী ব্যক্তিরা পতিত অসহায়দেরকে নীচ ও নগণ্যভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো, তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে দুঃখী নামে এক চাকরানি কাজ করতো। কিন্তু চৈতন্যদেব তার নাম শ্রবণ করে ভাবলেন– সে তো মানুষ, ঈশ্বর তার মধ্যেও বিরাজমান। তার নাম দুঃখী হবে কেন? তাই তিনি তার নাম সুখী রেখেছিলেন। এই হচ্ছে চৈতন্যদেবের সর্বজীবে সাম্যদর্শন। সমাজে বাহ্যিক বন্ধনের দ্বারা কারো হৃদয়ে ঈশ্বরের সত্তাকে আটকানো যায় না। আচার-বিচারের ভেদনীতি ও পরমতের প্রতি যে অসহিষ্ণুতা তা মানুষের মধ্যে ভেদের সৃষ্টি করে, সমাজকে ধ্বংস করে এবং জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। চৈতন্যদেব সকলকে একই পতাকাতলে আসার আহ্বান করেছিলেন। তাঁর উদাত্ত আহ্বানে জাত-পাতের বিচার ভুলে প্রেমের টানে ধনী-দরিদ্র, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেই একত্রিত হয়েছিল। মানবধর্ম ও সাম্যনীতির দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল। সত্যিকারার্থে এটি চৈতন্যদেবের সকল জীবের প্রতি সাম্যদর্শন।[১]

সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে চৈতন্যদেব :

বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষ সমাজে বসবাস করলেও তাদের মধ্যে সমতা ছিল না। বিভিন্ন জাতি ও বর্ণগত কুলাচার, লোকাচার, দেশাচার প্রভৃতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রের কঠোর বেড়াজালের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্যের কারণে সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে। এই সময়ে নিম্নবর্ণের ও শ্রেণির লোক ধর্মান্তরিত হতে শুরু

করে। সমাজে যখন এইরূপ ভয়াবহ অবস্থা তখন চৈতন্যদেব নিজে ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান ও পণ্ডিত হয়েও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে কাছে টেনে নিয়ে আপন করে নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে সামাজিক কুসংস্কার ও বিভেদ দূর করার জন্য সামাজিক আন্দোলন করেছিলেন। তৎকালীন নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান জগাই ও মাধাই এর মত অনেক পাষণ্ড ব্রাহ্মণ ছিল। এছাড়া জাত-পাতের কঠোর সমর্থক ব্রাহ্মণ শ্রেণি, স্মার্ত পণ্ডিত, ব্যাকরণবিদ, নব্যনৈয়ায়িক প্রভৃতিরা সপ্তগ্রামে, শান্তিপুরে, ফুলিয়ায় ও নবদ্বীপের সর্বত্র ছিল। তারা জড়বাদ, ভোগবাদ, জাত-পাতের সমর্থক ও ভৈরবীচক্রের অনুসারী ছিল। চৈতন্যদেব এই অপধর্ম বা সমাজ ধ্বংসকারী অনাচার ও অধর্মের বিরুদ্ধে সমাজ পরিবর্তনের জন্য তাঁর অনুসারীদের নিয়ে কঠোর আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর মানবধর্ম প্রচারের জন্য ৪৯০ জন পরিকরের মধ্যে ২৩৯ জন্য ব্রাহ্মণ বংশের ছিলেন। তাঁর আন্দোলনের হাতিয়ার ছিল নাম সংকীর্তন সহকারে শোভাযাত্রা। চৈতন্যদেবের এইরূপ সংকীর্তন ও গণ-আন্দোলনে সর্ব শ্রেণিপেশার মানুষ একত্রিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের বন্যায় সমগ্র নদীয়ার মানুষ মিলেমিশে একাকার হয়েছিল। চৈতন্যদেবের প্রেমবন্যার সংবাদ প্রবাদ বাক্যের মত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, যথা–'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়'।[২]

সমাজবিপ্লব ও গণ-আন্দোলনে চৈতন্যদেব :

চৈতন্যদেব বহু শতাব্দী ধরে নির্মিত জাতি ভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে সমাজে প্রেম, সাম্য ও মৈত্রের বাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রের কোন কঠোর বিধি নিষেধ বা মন্ত্র দিয়ে পরিবর্তন করেননি। কেবল নাম কীর্তনের মাধ্যমে ঐক্যের ও শান্তির সূত্র স্থাপন করেছিলেন। সমাজ বিপ্লবে ও মানবতার ক্ষেত্রে তাঁর বাণী ছিল 'জীবে দয়া নামে রুচি'। সবার মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে প্রতিটি জীবকে দয়া করা বা সেবা করা, সেটিই মানবধর্ম। চৈতন্যদেবের অসাধারণ ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিল । সংগীতে সুমধুর সুর তাঁর কণ্ঠে অনুরণিত বা ধ্বনিত হত। যে সমাজ কঠোর ব্রাহ্মণ্যবাদের শিকলে বেষ্টিত ছিল, সেই সমাজে মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়া হরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে অলঙ্কৃত করা এতো সহজ ছিল না। চৈতন্যদেব তাঁর প্রেমধর্ম ও মানবধর্ম দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও লৌকিক আচার দিয়ে মানবধর্ম বা ঈশ্বর অন্বেষণ হয় না। সবাইকে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। শুদ্ধাচার ও হৃদয়ের পবিত্রতার মাধ্যমে পরম সত্তাকে লাভ করা যায়। এটি ছিল চৈতন্যদেবের মানবধর্ম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমাজ বিপ্লবের অনন্য দৃষ্টান্ত।

চৈতন্যদেবের এ গণ-আন্দোলনের প্লাবনে বিদ্বান, পণ্ডিত, ধনী, দরিদ্র, বণিক, ব্রাহ্মণ, কুলীন, রাজ কর্মচারী, তাঁতি, জেলে, মালাকর, শঙ্খবণিক, শূদ্র, চণ্ডাল, থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাত-বর্ণ-শ্রেণি পেশার মানুষ একত্রে রাস্তায় নেমে নগর সংকীর্তন শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে এবং চৈতন্যদেবের গণ-আন্দোলনকে সমর্থন করে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। চৈতন্যদেবের এই গণ-আন্দোলন ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির সমাজ গ্রহণ না করে তারা কাজীর নিকট নালিশ করেছিল। শাসক শ্রেণি চৈতন্যদেবের আন্দোলনে বাধা দিয়েছিল। এই

শাসকদের দম্ভ ও আস্ফালনের বিরুদ্ধে চৈতন্যদেব তাঁর পরিকর পর্ষদসহ নবদ্বীপে ইতিহাসখ্যাত মশাল মিছিলের জন্য গণ-আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের নিরস্ত্র সম্প্রদায়ের পক্ষে কাজীর আদেশের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের জন্য নবদ্বীপ সেই রাত্রে জন-সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। কাজী আতঙ্কিত ও ভীত হয়ে সংকীর্তন আন্দোলনে বাধা প্রদানের আদেশ প্রত্যাহার করেছিলেন।

চৈতন্যদেবের এই গণ-আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ বায়ুপ্রবাহের মত তীব্র গতিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। চৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাস জীবনে নবাব হোসেন শাহের দরবারের নিকটে গঙ্গার ধারে রামকেলি গ্রামে লক্ষ লক্ষ ভক্ত অনুগামীসহ উপস্থিত হন, তখন নবাব হোসেন শাহ সেই দৃশ্য দর্শন করে ভীত ও সন্দিগ্ধ হয়ে সেনাপতিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কে এই ব্যক্তি? এত লোক তাঁর পেছনে ছুটছে কেন? তাঁর উদ্দেশ্য কি? সেনাপতি সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের পরিচয় জ্ঞাপন করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ ভক্ত, অনুগামী তাঁকে দর্শন করার জন্য সমবেত হয়েছে। তখন নবাব হোসেন শাহ তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও মানবতা এবং পরিচয় পেয়ে সেনাপতিকে আদেশ করেছিলেন– এই সন্ন্যাসী যেখানে খুশি সেখানে যাবে, কেউ যেন তাঁকে বাধা প্রদান না করে, বাধা দিলে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে। এই হচ্ছে চৈতন্যদেবের মানবতার মহিমা। তিনি একদিকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী অন্যদিকে ভিখারি। জাগতিক দিকে থেকে তাঁর চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই, তবুও তাঁকে শুধু দর্শন করার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক পিছনে ছুটেছিল। তাই দেখা যায় গৌড়রাজ থেকে শুরু করে রাজার কর্মচারিগণ চৈতন্যদেবকে সর্বদা সম্মান প্রদর্শন করেছেন, এর মূল কারণ ছিল চৈতন্যদেবের মানবধর্ম ও উদারতা।[৩]

চৈতন্যদেব আবির্ভূত না হলে হিন্দু ধর্মের কঠোর স্মৃতি শাস্ত্রের বিধি-বিধান, জাতিভেদের নিষ্ঠুর অত্যাচার প্রভৃতির কারণে সমাজ, জাতি, দেশ ধ্বংস হয়ে যেত। ব্রাহ্মণ্যবাদের মতে শূদ্র ও নারীর ধর্মশাস্ত্রে কোন অধিকার ছিল না। সেক্ষেত্রে গুণ অপেক্ষা জন্মগত অধিকার প্রাধান্য পেয়েছিল। অপরদিকে ধর্মের নামে তন্ত্রবাদীরা ভৈরবীচক্রের আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে অবাধে ব্যভিচারের পথ সুগম করে দিয়েছিল। শুধুমাত্র চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে এইসব অনৈতিক, অবৈধ, অমানবিক ধর্মশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন বলে দেশ, জাতি ও ধর্ম রক্ষা পেয়েছিল। একদিকে চৈতন্যদেবের সরল জীবন দর্শন, উদার ব্যবহার, মহৎ চরিত্র, আচণ্ডাল-শূদ্রে সমান প্রীতি এমনকি মুসলিমদের প্রতিও সমাদর সমাজে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। চৈতন্যদেবের সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর আদর্শ যা– 'কীর্তনীয় সদাহরিঃ'। এই কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তনই একমাত্র মুক্তির পথ। তাঁর এই সরল ও বিনয়পূর্ণ উপদেশ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে শিরোধার্য করে নিয়েছিল। শুরু হল প্রতিদ্বারে চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত হরিনাম কীর্তন। আনন্দ ও প্রীতিভরে জাত-পাত বিচার না করে ব্রাহ্মণ আলিঙ্গন করল যবনকে, ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলে চৈতন্যদেবের প্রেমে আত্মহারা হয়ে তাঁর মানবতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। তাঁর প্রেমধর্মের শীতল সমীরণে সবাই স্নিগ্ধ হল এবং বাংলা থেকে অনাচার অধর্ম লোপ পেয়েছিল।[৪]

চৈতন্যদেব এমন একজন মানবতাবাদী দার্শনিক ও প্রেমিক ছিলেন যে, যবনরাও তাঁর সংস্পর্শে এসে শ্রেষ্ঠ প্রেমীভক্তে রূপান্তরিত হয়ে সমাজে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের এই প্রেমধর্মরূপ মানবতাবাদ সকল ধর্ম ও মতবাদের ঊর্ধ্বে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজকে সকলের মিলনভূমিতে পরিণত করেছিল। চৈতন্যদেবের জাত-পাতহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রসঙ্গে জনাব এনামুল হক বলেছেন– "চৈতন্যদেব জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার নানা বর্ণভুক্ত ভক্তদের হৃদয়ে এমন সাম্য ও মৈত্রীর ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিলেন যে, আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ সকলেই "দাস" আখ্যা ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন"।[৫]

বৈষ্ণব আন্দোলনের মাধ্যমে মানবপ্রেমের প্রকাশ:

মধ্যযুগে বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল । চৈতন্যদেব বৈদিক শাস্ত্রের কঠোর অনুশাসনের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে ভক্তি আশ্রিত উপাসনার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সে ভক্তিই বৈষ্ণববাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নবধর্মের প্রবর্তন হল বা নতুন মাত্রা পেল। ভক্তিবাদের দ্বারা চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের আন্দোলন বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম এবং উত্তর ভারতের বৃন্দাবন, মথুরাসহ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। চৈতন্যদেবের শিষ্য গোস্বামিগণ এবং তাঁর পার্ষদ ও অনুসারী ভক্তরা বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব ও চৈতন্যদেবের জীবনচরিত রচনার কারণে এক বিশাল সাহিত্য সম্ভারের সৃষ্টি হয়েছিল। চৈতন্যদেবের জীবন, দর্শন, শিক্ষা ও আদর্শকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য জগৎ গড়ে উঠেছিল, তা মধ্যযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। স্মৃতিশাস্ত্রের কঠোর বিধি-বিধানের উপর যে ব্রাহ্মণ্যবাদের সামাজিক আচার পদ্ধতি, বিশেষ করে জাতি-বর্ণ প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল, চৈতন্যদেব সেই প্রথার প্রাচীর ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। সে কারণে চৈতন্যদেবের এ বৈষ্ণব আন্দোলন তৎকালীন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদের মানবতাহীন সংস্কৃতির বিপরীতে ছিল। এটি সত্যিকারার্থে উদার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনযাত্রার মিলনমেলা ছিল। সামাজিক অধিকার ও ধর্মীয় উদারতার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব ছিল। তাই এই প্রেমভক্তিরূপ বৈষ্ণব আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের অধিকার সৃষ্টি হয়েছিল। সকল মানুষের উদার ও ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে চৈতন্যদেব যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, সেখানে নতুন করে মানবপ্রেম প্রকাশ পেয়েছিল।[৬]

তৎকালীন সময়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কর্তাব্যক্তিরা সকল প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় সম্মান ও মর্যাদা এবং সুবিধা লাভ করছিল। তাদের নিয়ন্ত্রণে সবকিছু ছিল। সে সময়ে চণ্ডাল, ডোম, হাড়িসহ বিভিন্ন নিম্ন বর্ণের ও শ্রেণিপেশার লোক ছিল একেবারে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য। অস্পৃশ্য ও কৌম সম্প্রদায় সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল। সবচেয়ে জঘন্য ঘটনা ছিল যে, প্রতিটি পেশা বা কর্ম ছিল জাতিভিত্তিক। এর ফলে কোন ক্রমে পেশা পরিবর্তন করা যেত না। এইরূপ অমানবিক অবস্থাকে স্থায়ী করার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল

স্মৃতি শাস্ত্রের ধারক ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোর শৃঙ্খলের কারণে সমাজের নিম্ন বর্ণের ও জাতের হিন্দু সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নিম্ন জাতি-বর্ণের উপর আচার-সংস্কার, রীতি-নীতি অলঙ্ঘনীয় বলে চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁর সহজ ও সরল ভক্তিধর্ম এবং নগর সংকীর্তনের মাধ্যমে আপামর জনসাধারণকে একটি বৃত্তের মধ্যে আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ভক্তিধর্ম দ্বারা নব্য নৈয়ায়িকদের নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক কসরতের বেড়াজাল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তাই দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষের কর্মে, চিন্তায়, ধর্মীয় স্বাধীনতায়, জীবিকা অর্জনে, সাংস্কৃতিক অধিকারে, অধ্যাত্ম চেতনায় উন্নীত করার জন্য চৈতন্যদেব যে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন, সেখানেই চৈতন্যদেবের মানবপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। আর এ কারণে, তিনি সবাইকে একটি নিশানার মধ্যে একত্রিত করতে পেরেছিলেন। এজন্যই চৈতন্যদেবের জীবনচরিত রচয়িতাগণ বলেছেন যে, প্রেমধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়েছিল।[৭]

চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন হচ্ছে বাংলার রেনেসাঁস:

চৈতন্যদেবের এই ভক্তি আন্দোলনের তাৎপর্য সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদের যাতাকলে পিষ্ট, বঞ্চিত নিম্ন জাতবর্ণের হিন্দু সমাজের লোকজনের সম্মুখে দুটি পথ খোলা ছিল। একটি হচ্ছে–ধর্মান্তরিত হওয়া, অপরটি হচ্ছে হিন্দু ধর্মের মধ্যে উদার মনোভাব কেন্দ্রিক কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ঘটলে সেখানে অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তাই দেখা যায় যে, তখন সমাজব্যবস্থা ছিল ব্রাহ্মণ্য পৌরোহিত্য কেন্দ্রিক, নব্যন্যায়ের শুষ্ক পাণ্ডিত্য চর্চা, ধর্মের নামে তান্ত্রিকদের অনাচার, স্মৃতি শাস্ত্রের কঠোর বিধি-বিধানের লৌহ শৃঙ্খল এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রভাবে হিন্দু সমাজ জর্জরিত ছিল। পাশাপাশি লৌকিক দেব-দেবীর আরাধনা ও তুষ্টি উপলক্ষে নানা প্রকার কুসংস্কার ও অনুষ্ঠানের বিবিধ পর্বও ছিল। চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে এই সামাজিক চিত্রকে পরিবর্তন করেছিলেন।

চৈতন্যদেব বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ও বিবিধ নিয়ম-কানুনের সংহিতাকে পাশ কাটিয়ে নবধর্মের পথ প্রবর্তন করেন। সেটিই হচ্ছে ভক্তি, যার কারণে হৃদয় হবে সরল ও বিনয়ে পূর্ণ। সবার মধ্যে পরমসত্তার অস্তিত্ব চিন্তা করে সবাইকে সম্মান করতে হবে, ভালবাসতে হবে। ঘৃণা, হিংসা, অবহেলা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যাবে না, সবাই মানুষ। তাই তিনি বলেছেন, 'এই যুগে ঈশ্বর নামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন'। সেই নাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সবার সমান অধিকার রয়েছে। এইজন্য তিনি জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে নাম সংকীর্তন প্রবর্তন করেছেন। এখানে আড়ম্বরপূর্ণ পূজার উপকরণ, যজ্ঞের বিধি, তপস্যার নির্জনতা, জ্ঞান তত্ত্বের ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজনীয়তা নেই, শুধু ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকলে ও তাঁর নাম কীর্তন করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। সবাই মুক্তি পাওয়ার অধিকারী। তাই নবধর্মের অস্ত্রস্বরূপ নাম সংকীর্তনে জাতি-বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে একত্রিত হয়ে সবাই মহামিলন মেলায় শামিল হল। ঘুচে গেল বৌদ্ধ, তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শাসন, মুক্তি পেল সমাজের অবহেলিত সকল শ্রেণি পেশার মানুষ। চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি আন্দোলনে তারা যুক্ত হয়ে সকল প্রকার অধিকার লাভ করেছিল।

সে কারণে চৈতন্যদেব বলেছেন– 'কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার'। সকলেই নাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারত এবং ভক্তিচর্চার ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার ছিল। এই হচ্ছে চৈতন্যদেবের ভক্তি ও বৈষ্ণব আন্দোলনের ফল। সমাজের সকল শ্রেণির মুক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় চৈতন্যদেবের মানব প্রেমের চিত্র ফুটে উঠেছে। আর এইজন্য মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের এ ভক্তি ও মুক্তির আন্দোলনকে রেনেসাঁস অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে।[৮]

নিপীড়িত, শোষিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, দলিত, অসহায় সমাজ-জাতি পরিত্যক্ত মানুষ শত প্রতিকূলতার মধ্যে চৈতন্যদেবের এই ভাব-বিপ্লবের আন্দোলনের মাধ্যমে তারা সত্তা ও শক্তি ফিরে পেল। সেই সঙ্গে হিন্দুর সমাজ, শাস্ত্র, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ঐতিহ্য ও জাতি রক্ষা পেল। এই রেনেসাঁস একমাত্র চৈতন্যদেবের ভাব-বিপ্লব আন্দোলনের ফসল। এ প্রাণ-প্রাচুর্য দান শুধুমাত্র চৈতন্যদেবের। তাই চৈতন্যদেবের এই আন্দোলনের স্রোতধারায় চৈতন্য বিরোধীরা নীরব ও নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৯]

চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের যে সরল ও উদারনীতি, বিনয়ধর্মীভাব, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-সংস্কৃতি, নিষ্ঠা, মর্যাদাবোধ প্রভৃতি বাঙলায় হিন্দু-মুসলিম সমাজে এর প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়েছিল। হিন্দু-মুসলিম সমাজের মানুষের চিত্তে অবচেতন মনে সঞ্চারিত হয়েছিল বৈষ্ণব ধর্মের প্রীতিকামিতা, সহিষ্ণুতা, সংবেদনশীলতা, ব্যক্তি মানুষের মর্যাদা, অভিন্নতাবোধ প্রভৃতি। তাই চৈতন্যদেব প্রভাবিত ষোড়শ শতককে বাংলার ভাব-বিপ্লব বা রেনেসাঁর যুগ বলা হয়ে থাকে।[১০]

চৈতন্যদেবের প্রীতিধর্মে বাঙালির মানবতাবোধ:

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব মধ্যযুগের সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা চৈতন্যদেবের আদর্শ ও শিক্ষা প্রচারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে মধ্যযুগের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, ভাষা ও সংস্কৃতি অঙ্গনে। বাঙালি সমাজ চৈতন্যদেবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি আন্দোলনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ছিল বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথার লোপ, শাস্ত্র ও সমাজের সংস্কার এবং নিম্ন বর্ণের মানুষের নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, সেই সঙ্গে তাদের মনুষ্যত্বের মর্যাদা প্রদান করা। পাশাপাশি শাসক-শাসিতের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক, যার মাধ্যমে সমাজে প্রকৃত শান্তি গড়ে ওঠে। সে কারণে সমাজে তিনি ঐক্যের বাণী প্রচার করেন। চৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক ভক্তি সর্বস্তরের মানুষের প্রতি প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। মহান মানবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মহিমাই সাধারণের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। চৈতন্যদেব তরুণ বয়সেই তাঁর ব্যক্তিত্বে, পাণ্ডিত্যে, তর্কপটুতায়, চরিত্র মাধুর্যে নবদ্বীপের জ্ঞানী-গুণী সর্বশ্রেণির মানুষের স্নেহ ও শ্রদ্ধার প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। যখন তিনি নাম সংকীর্তনের দ্বারা সমগ্র নদীয়ায় প্রেমের বন্যা সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স বিশ-বাইশের মত। এর মধ্যেই তাঁর সেই ব্যক্তিত্ব ও অসামান্য প্রতিভা প্রকাশ পায়। তৎকালীন সময়ের বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রেণির মধ্যে অন্যতম অদ্বৈতাচার্য, রামানন্দ রায়, বাংলার নবাব হোসেন শাহের পদস্থ রাজ কর্মচারী রূপ-

সনাতন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ জ্ঞানী-গুণী তাঁর প্রচারিত নবপ্রেমধর্ম গ্রহণ করে তা প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের অনুগামীদের রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাবে মধ্যযুগের ভাষা ও সাহিত্যে, সমাজ ও সংস্কৃতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ভাষা ও সাহিত্য পুষ্টি লাভ করেছিল, এক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের দান অপরিমেয়। চৈতন্যদেবের এই প্রেমধর্মের কারণে স্রষ্টা ও জীবের মধ্যে অভেদ সম্পর্কের দর্শনে বাঙালিরা দীক্ষা গ্রহণ করেছিল। তাই চৈতন্যদেবের এই ভক্তিধর্মের মাধ্যমে বাঙালির মানবতাবোধ গভীর হল এবং তারা জাগ্রত হল। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফ *সাহিত্যতত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্যে* বলেছেন–"বৈষ্ণবের প্রেমবাদের মাধ্যমে নরে নারায়ণ ও জীবে ব্রহ্ম দর্শনের দীক্ষা পেল বাঙালী। এই প্রীতিধর্মের প্রভাবে বাঙালীর মানবতাবোধ হল তীব্র, তীক্ষ্ম ও উদ্দীপ্ত। ষোলশতক তাই বাঙালীর ও বাঙলা সাহিত্যের রেনেসাঁসের যুগ। বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ফলে এদেশে হিন্দু-মুসলমান বৈষ্ণব মতবাদ গ্রহণ করে।"

চৈতন্যদেবের কারণে বাংলায় গীতি কবিতা রচনা, অলঙ্কার ও দর্শনতত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। চৈতন্যদেবের আদর্শের যে বৈষ্ণবীয় বিনয়, ভক্তির মহিমা, উদার মানবিকতা, নির্মল প্রীতি, ভ্রাতৃভাব, অহিংসা তা সমাজের উপর যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব ফেলেছিল। চৈতন্যদেব জয়দেব, বড়ুচণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ চর্চা করে গভীর আনন্দ লাভ করতেন। চৈতন্যদেবের এই পদ চর্চার কারণে মিথিলার কবি বিদ্যাপতির পদ বাঙালির মুখে মুখে উচ্চারিত হয়েছে। চৈতন্যদেবের এই অনুকরণে পদাবলী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের আদর্শ অনুসরণ করে গোবিন্দদাস, বলরামদাস, জ্ঞানদাস, বংশীবদন, বৃন্দাবন দাস, বাসুদেব ঘোষ, লোচন দাস, নরহরি দাস, মুরারি গুপ্ত, নরোত্তম দাস প্রভৃতি এবং মুসলিমদের মধ্যে আলাউল, ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ মর্তুজা উল্লেখযোগ্য পদকার। সূক্ষ্ম প্রেমানুভূতির ও বিচিত্রভাবের অভিব্যক্তির আধার হিসাবে পদাবলী সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে নন্দিত। তাই দেখা যায়, চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম বাঙালির মানবতাবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[১১]

হিন্দু সমাজের ত্রাণকর্তা হিসাবে চৈতন্যদেবের ভূমিকা:

চৈতন্যদেব হিন্দু সমাজ রক্ষার জন্য এবং ইসলাম ধর্মের হাত থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার জন্য ভক্তিবাদকে গ্রহণ করে বাঙলার জাতীয় ক্রান্তিলগ্নে ত্রাণকর্তারূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি হিন্দু জাতিকে রক্ষা করেছিলেন। চৈতন্যদেবের এ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্বন্ধে ড. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বলেছেন–"চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব আন্দোলন যে হিন্দুর সমাজ সংরক্ষণেরই ইসলাম প্রতিরোধক পরোক্ষ আন্দোলন, এ সিদ্ধান্ত নিয়ে আজ আর তর্ক নেই। কেবল বৌদ্ধ ও অনুরূপ শ্রেণিকেই নয়, ধর্মান্তরিত হিন্দুকেও সমাজে পুনর্গ্রহণের সার্থক উপায় হিসেবেই যে প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল, তার যে প্রত্যাশিত ফলও পাওয়া গিয়েছিল, তার প্রমাণের অভাব নাই। ষোল শতক থেকেই বাঙলায় ইসলামের অব্যাহত প্রসার রুদ্ধ হয়ে গেছে, এ কথা হয়তো তাই বলা যায়।" সত্যিকারার্থে চৈতন্যদেবের সবচেয়ে বড় অবদান হল ভক্তিকে প্রেমে উত্তরণ দান।[১২]

চৈতন্যদেবের মানবতাবাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

চাপাল-গোপালের প্রতি মানবতা:

চাপাল-গোপাল নামে নবদ্বীপে একজন ব্রাহ্মণ ও শাক্ত উপাসক ছিল। সে কটুভাষী, বাচাল ও পাষণ্ড ছিল। সে মদ্য ও মাংসে গভীরভাবে আসক্ত ছিল। শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে একদিন রাত্রে কীর্তন হয়েছিল, তখন চাপাল-গোপাল শ্রীবাসের গৃহে মদ্য পাত্রে ভবানীপূজার জবা ফুল, কলা,রক্ত চন্দন প্রভৃতি উপকরণ শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহের দরজার সামনে রেখে আসে। শ্রীবাস ঠাকুরকে সবাই যাতে উপহাস করে যে, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন আর রাতে ভবানীদেবীর পূজা করেন। কিন্তু নবদ্বীপ শহরে শ্রীবাস ঠাকুর একজন বৈষ্ণব হিসেবে সবার কাছে সম্মানিত ছিলেন। পরের দিন সকালে শ্রীবাস ঠাকুর স্থানীয় সভ্য সমাজকে এই দৃশ্য দেখালে, পাত্র রেখে যাওয়া ব্যক্তির প্রতি সবাই চরম ঘৃণা প্রকাশ করেন। ঠিক এর তিনদিন পরে চাপাল-গোপালের সমস্ত শরীরে কুষ্ঠ রোগ হয়। ফলে সে সমাজ থেকে পরিত্যক্ত হয়ে গঙ্গা ঘাটে বৃক্ষের নীচে বসে ক্রন্দন করতো। এইভাবে সে একদিন চৈতন্যদেবকে দেখতে পেয়ে রোগের বিষময় জ্বালা থেকে মুক্তির জন্য সকরুণ কণ্ঠে তাঁর নিকট উদ্ধারের আর্তি জানায়। যথা–

লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥
চৈ. চ-আদি /১৭/৪৯

পরে চৈতন্যদেব তাকে উদ্ধারের পথ দেখিয়ে বললেন– তুমি ভবিষ্যতে এই ধরনের অপরাধ করবে না। তুমি মহা অপরাধ করেছো। শ্রীবাস ঠাকুরের নিকটে বৈষ্ণব অপরাধ হচ্ছে মহাপরাধ। তুমি শ্রীবাস ঠাকুরের চরণে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তাঁর আশীর্বাদে তুমি মুক্ত হবে। এইভাবে চৈতন্যদেব চাপাল-গোপালকে মহাব্যাধি কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত করে মানবতার পরিচয় দিয়েছেন।[১৩]

জগাই-মাধাইর প্রতি মানবতা:

তৎকালীন নবদ্বীপে জগাই-মাধাই সবচাইতে বেশি অধঃপতিত ছিল। তারা জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও সবচেয়ে নৃশংস ও ঘৃণ্যতম অপরাধ করত। তারা দু'জনে নগরের কোতোয়াল ছিল। করুণার সাগর চৈতন্যদেব সমাজের এই দুই মহাপাপীকে করুণা বর্ষণ করে উদ্ধার করেন। কেননা পাপ কাজের দ্বারা পাপের বৃদ্ধি ঘটে। এই দুজনকে নদীয়াবাসী ভয় করতো, তাদের পাপকাজের দ্বারা সমাজের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। তাই চৈতন্যদেব বড় কৃপা করে তাদের পাপ পঙ্কিল জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে নবজীবন দান করে সমাজে মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। মানবতাবাদী চৈতন্যদেবের করুণা যথা–

প্রভু বলে, "তোরা আর না করিস্ পাপ"।
জগাই-মাধাই বলে, "আর নারে বাপ" ॥
প্রভু বলে, "শুন শুন তোরা দুই জন।

সত্য সত্য আমি তোরে করিলাঙ মোচন ॥[১৪]

চৈ. ভা.-মধ্য/১৩/২২৫-২২৬

চাঁদ কাজীর প্রতি মানবতা:

নবদ্বীপ তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষের ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শন চর্চার মুখ্য মহাপীঠ ছিল। মৌলানা সিরাজ উদ্দীন সেসময়ে নবদ্বীপের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি চাঁদ কাজী নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। সে সময়ে কিছু গোড়া ধর্মীয় উগ্রবাদীরা চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধর্ম আন্দোলনের বিরুদ্ধে কাজীকে উসকানী দিয়েছিল। তাদের কুপরামর্শে ধর্মান্ধ হয়ে তিনি নিজে শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে মৃদঙ্গ ভেঙ্গেছিলেন এবং ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে বললেন– এর পরে যদি হরিনাম করিস, তাহলে তোদের জাতিচ্যুত অর্থাৎ ধর্মান্তরিত করবো। তোদের সম্পদ লুণ্ঠন করব। এই ঘটনায় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সমগ্র নদীয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো। নবদ্বীপে অশান্তির অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলো। কিন্তু চৈতন্যদেবের শক্তির রহস্য সবাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। তাঁর আহ্বানে হাজার হাজার নদীয়াবাসী এসে মিছিল সহকারে চাঁদ কাজীর বাড়ি ঘেরাও করে। কাজী সাহেব ভয়ে থরকম্প। কিন্তু চৈতন্যদেব অতীব শান্ত হয়ে বিনয়ের মাধ্যমে চাঁদ কাজীকে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান করলে, তিনি অভয় পেয়ে ডাকে সাড়া দিলেন।

কিন্তু অন্তরে তিনি চৈতন্য শক্তির প্রভাবে ভীত হয়ে অপরাধী হিসেবে অনুশোচনায় দগ্ধীভূত হলেন। তিনি চৈতন্যদেবের চরণে আত্মসমর্পণ করলে বিনয় ও করুণার মূর্ত প্রকাশ চৈতন্যদেব তাঁকে সমাজের এই মহাভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করেন। কেননা তিনি সঠিক পদক্ষেপ না নিলে চাঁদ কাজীর তখন কোন অস্তিত্বই থাকতো না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে সমাজকে রক্ষা করেন। তাই চৈতন্যদেব চাঁদকাজীকে মুক্ত করে সমাজে শান্তি স্থাপন করে মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। যথা–

এত শুনি' কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি।
প্রভুর চরণ ছুঁই' বলে প্রিয়বাণী ॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর,– যেন তোমারে রহু ভক্তি ॥[১৫]

চৈ. চ-আদি/১৭/২১৯-২২০

বাসুদেব ব্রাহ্মণের প্রতি মানবতা:

বাসুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ সেতুবন্ধে কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে বাস করতেন। তাঁর সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠরোগ হয়েছিল। এই রোগটি সংক্রামক। তাই তিনি পরিবার ও সমাজ পরিত্যক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেবের শুভাগমন বার্তা শ্রবণ করে শত দুঃখের মধ্যে আনন্দিত হন এবং চিন্তা করেন কলিতে জীবের একমাত্র উদ্ধারকর্তা চৈতন্যদেবই আমাকে এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করবেন। কিন্তু তার কুষ্ঠ রোগের কারণে দেহের সর্বত্র বড় বড় কীটগুলো

সমস্ত শরীরে বিচরণ করার ফলে সবাই তাকে দেখে অনেক দূর থেকে চলে যেতো। করুণার মূর্ত বিগ্রহ চৈতন্যদেব তাঁকে দেখামাত্র বুকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর স্পর্শে তৎক্ষণাৎ বাসুদেবের এই কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হল। এই অপূর্ব মহানুভবতার কারণে চৈতন্যদেবের নাম হয় 'বাসুদেবামৃতপ্রদ'। এইভাবে চৈতন্যদেব করুণা করে কুষ্ঠরোগীকে হৃদয়ে ধারণ করে শরীর স্পর্শ করে রোগ থেকে মুক্ত করে মানবকল্যাণ সাধন করে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাই। যথা–

প্রভু-স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥
প্রভুর কৃপা দেখি' তাঁর বিস্ময় হৈল মন।
শ্লোক পড়ি' পায়ে ধরি' করেন স্তবন ॥
বহু স্তুতি করি' কহে,– শুন, দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতে এই হয় ॥
মোরে দেখি' মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন-মোরে স্পর্শ' তুমি,- স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
চৈ.চ-মধ্য/৭/১৪১-১৪৫,
বাসুদেবোদ্ধার এই কহিল আখ্যান।
'বাসুদেবামৃতপ্রদ' হৈল প্রভুর নাম ॥[১৬]
চ. চৈ-মধ্য/৭/১৫০

গোপীনাথ পট্টনায়কের প্রতি মানবতা:

গোপীনাথ পট্টনায়ক উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের রাজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন। রাজকর পরিশোধ করতে দুই লক্ষ টাকার মত তাঁর বাকি ছিল। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুষোত্তম বকেয়া দুই লক্ষ টাকা পরিশোধের জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। আজই কর পরিশোধ করতে হবে, তা না হলে চাঙ্গে চরিয়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে। তাঁর ভৃত্য চৈতন্যদেবের নিকট এই বার্তা দিয়ে প্রাণ রক্ষা করার জন্য শরণাগত হন। চৈতন্যদেবের হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হয়। তিনি উপস্থিত থাকতে তাঁর পরম ভক্ত রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা গোপীনাথের আজ প্রাণদণ্ড হবে। চৈতন্যদেব তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্য রাজপুরোহিত কাশীমিশ্রকে এই দণ্ডের কথা বললেন। তিনি কৌশলে কাশী মিশ্রের মাধ্যমে তাঁর প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্য রাজাকে জানালেন। রাজা চৈতন্যগত প্রাণ। চৈতন্যদেবের সন্তুষ্টির জন্য তিনি সবকিছুই ত্যাগ করতে পারেন। চৈতন্যদেবের ইচ্ছা অনুযায়ী রাজা গোপীনাথের জীবন রক্ষা করলেন অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহার করলেন। চৈতন্যদেব এইভাবে গোপীনাথের জীবন রক্ষা করলেন। এই প্রসঙ্গে বর্ণনা পাই–

তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কুল।
এ বিপদে রাখি 'প্রভু, পুনঃ নিলা মূল ॥

ভক্তবাৎসল্য এবে প্রকট করিলা।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চপাণ্ডবে বিপদে তারিলা ॥
'নেতধটী'-মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার কৃপা-বৃত্তান্ত সকল কহিলা ॥
কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ-প্রমাদ!
কাঁহা 'নেতধটী' পুনঃ,– কাঁহা এ সব প্রসাদ ॥[১৭]
চৈ.চ-অন্ত্য /৯/ ১৩০-১৩২, ১৩৪,

সনাতন গোস্বামীর প্রতি মানবতা:

সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবন থেকে পুরীতে এলে তাঁর শরীরে কণ্ডুরসা হয়। তিনি চৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্তদের স্পর্শভয়ে অপরাধ হবে এই জ্ঞানে এবং নিজেকে পাপী মনে করে রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে দেহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলে চৈতন্যদেব বললেন– তোমার দেহ আমার অনেক কাজে ব্যবহার হবে। তোমাকে দিয়ে আমি কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব প্রকাশ করব এবং বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশ করব, আর তুমি কিনা দেহ-ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছো? চৈতন্যদেব সনাতনের অঙ্গ প্রেমভরে বার বার আলিঙ্গন করেন। তাঁর স্পর্শে তিনি কণ্ডুরসা থেকে মুক্ত হলেন। এই হচ্ছে চৈতন্যদেবের মানবতার উজ্জ্বলতম মহিমা। এ বিষয়ে *চৈতন্যচরিতামৃতে* পাই–

এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
তাঁর কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥
বার বার নিষেধেন, তবু করেন আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন ॥[১৮]
চৈ. চ-অন্ত্য/৪/১৩৩-১৩৪

সত্যবাই-লক্ষ্মীবাইর প্রতি মানবতা :

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পরে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের ৭ই বৈশাখ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শুরু করেন। পরে তিনি গোদাবরী থেকে ত্রিমন্দনগরে আগমন করেন। সেখান থেকে তিনি সিদ্ধবটেশ্বরে ৭দিন থাকেন। এখানে তীর্থরাম নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। কিন্তু সে মনে মনে অভিসন্ধি করে যে, চৈতন্যদেবের ধর্ম নষ্ট করবে। এই অভিপ্রায়ে সে অপরূপ সুন্দরী সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নামক দুই বেশ্যাকে চৈতন্যদেবকে প্রলুব্ধ করার জন্য নিযুক্ত করে। চৈতন্যদেবের চরিত্র হনন করার জন্য দুই বেশ্যা যত প্রকার ছলা-কলা আছে সবই প্রয়োগ করে। কিন্তু চৈতন্যদেবের মাতৃজ্ঞান ও ঐশ্বরিক শক্তি দর্শন করে বেশ্যাদ্বয় তাঁর চরণপদ্মে পতিত হয়ে অপরাধ মার্জনা করে মুক্তির জন্য আকুল প্রার্থনা করে। পাষণ্ড তীর্থরাম এই দৃশ্য দর্শন করে নিজেকে মহাপরাধী মনে করে তাঁর চরণে

নিজেকে সমর্পণ করে সেই মুহূর্তে সর্বস্ব ত্যাগ করে নিজেই সন্ন্যাসী হয়েছিল। এইভাবে চৈতন্যদেব ভ্রমণকালে অনেক পাষণ্ডকে করুণা ও প্রেম প্রদর্শন করে পতিত অবস্থা থেকে মুক্ত করে আলোর জগতে নিয়ে আসেন।[১৯]

পাঠান বৈষ্ণবের প্রতি মানবতা:

চৈতন্যদেব বৃন্দাবন ভ্রমণ শেষে গঙ্গাপথে প্রয়াগের উদ্দেশে যাত্রার পথে পাঠান সৈন্যদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। পাঠান সৈন্যরা মুসলিম ছিল। তাদের মধ্যে একজন কাল বস্ত্রধারী পরম গম্ভীর স্বভাবের পীর ছিলেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞানী ছিলেন। চৈতন্যদেব শাস্ত্রালোচনার মাধ্যমে তর্কে তাকে পরাজিত করলে তিনিসহ সবাই তাঁর মত গ্রহণ করে পরম বৈষ্ণব হয়েছিলেন। তারা পাঠান বৈষ্ণব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রের মাধ্যমে তাদেরকে সংস্কার সাধন করে মর্যাদা সম্পন্ন বৈষ্ণবে পরিণত করেছিলেন। তিনি জাত বিচার না করে মানবিকতা দেখিয়েছেন। *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

তোমা দেখি' জিহ্বা মোর বলে 'কৃষ্ণনাম'।
আমি–বড় জ্ঞানী, এই গেল অভিমান ॥
কৃপা করি' বল মোরে 'সাধ্য-সাধনে'।
এত বলি' পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥
তাঁ-সবারে কৃপা করি' প্রভু ত 'চলিলা।
সেই ত' পাঠান সব 'বৈরাগী' হইলা ॥
'পাঠান-বৈষ্ণব' বলি' হৈল তাঁর খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥[২০]
চৈ. চ-মধ্য/১৮/২০৩-২০৪, ২১০-২১১

অমোঘের প্রতি মানবতা:

অমোঘ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জামাতা ছিল। সে কুলীন ব্রাহ্মণ এবং নিন্দুক স্বভাবের ছিল। সার্বভৌম ভট্টাচার্য চৈতন্যদেবকে গৃহে একদিন নিমন্ত্রণ করে প্রসাদ সেবন করিয়েছিলেন। অমোঘ বিভিন্ন ব্যঞ্জনের প্রসাদ দর্শন করে চৈতন্যদেবের নিন্দা করেছিল। এই কারণে সার্বভৌম ও তাঁর স্ত্রী গভীর বেদনা পেয়ে জামাতাকে এহেন গর্হিত অপরাধের কারণে পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু সেই রাত্রে অমোঘ পালিয়ে থাকে এবং পরের দিন সকালে তার বিসূচিকা ব্যাধি হয়েছিল।

চৈতন্যদেব অমোঘের মৃত্যু অবধারিত জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ অমোঘের বুকে হস্ত স্পর্শকরে আশীর্বাদ করায় অমোঘ নব জীবন লাভ করে এবং পূর্বের নিন্দা অপরাধের জন্য নিজে নিজের গালে চাপর মেরে অনুশোচনা প্রকাশ করে। চৈতন্যদেবের চরণে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এইভাবে চৈতন্যদেব লোকনিন্দা উপেক্ষা করে

অমোঘকে প্রকৃত প্রেম প্রদান করে অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মানবধর্মের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পালাঞা রহিল।
প্রাতঃকালে তার বিসূচিকা ব্যাধি হৈল ॥
আচার্য্য কহে,–উপবাস কৈল দুইজন।
বিসূচিকা ব্যাধিতে অমোঘ ছড়িছে জীবন ॥
শুনি' কৃপাময় প্রভু আইল ধাঞা।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া ॥
উঠহ, অমোঘ, তুমি লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্ ॥[২১]
চৈ. চ-মধ্য /১৫/২৬৬, ২৭২-২৭৩,২৭৭

কৃষ্ণদাস বিপ্রের প্রতি মানবতা:

চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণ ভারতের মল্লার দেশে ভ্রমণ করছিলেন তখন তাঁর কৃষ্ণদাস নামে একজন সঙ্গী ছিল। মল্লার দেশে ভট্টমারী অর্থাৎ বামাচারী সন্ন্যাসীরা বসবাস করতো। সেই ভট্টমারীরা কৃষ্ণদাস বিপ্রকে কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভন দেখিয়ে তার বুদ্ধি নাশ করে তাকে তাদের ঘরে নিয়ে যায়। চৈতন্যদেব তাকে উদ্ধার করতে গেলে তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির কাছে ভট্টমারীদের অস্ত্র খণ্ডখণ্ড হয়ে যায়। তখন চৈতন্যদেব কৃষ্ণদাস বিপ্রের কেশ ধরে টেনে সেখান থেকে নিয়ে আসেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণদাস কামিনী-কাঞ্চনের বশে বশীভূত হয়েছিল। কিন্তু সাধকের পক্ষে কামিনী-কাঞ্চনের সংশ্রব বিধেয় নয়। চৈতন্যদেব তাকে উদ্ধার না করলে সেখান থেকে মুক্ত হওয়া কৃষ্ণদাসের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। যেহেতু কৃষ্ণদাস তাঁর সেবকসঙ্গী ছিল, সেকারণে এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করা উচিত। চৈতন্যদেব কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করার জন্য ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন। তাকে মুক্ত না করলে তার উদ্ধারের কোনো পথ ছিল না। চৈতন্যদেব করুণা করে কৃষ্ণদাসকে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করে পুরীতে নিয়ে আসেন। এভাবেই চৈতন্যদেব সর্বত্র মানবতা প্রকাশ করেছেন।[২২]

বৌদ্ধাচার্যদের প্রতি মানবতা:

চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে তাঁর দার্শনিক জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বৌদ্ধপণ্ডিতরা তাঁর মহিমা প্রকাশে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে পরাস্ত করার জন্য নবপ্রস্তাব দ্বারা শাস্ত্র বিচার শুরু করলে চৈতন্যদেব তাঁদের পরাস্ত করেন। ফলে পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে চৈতন্যদেবকে জব্দ করার জন্য তারা বৌদ্ধাচার্যকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে।

যেহেতু চৈতন্যদেব বৈষ্ণব, তাই তিনি ভক্তিসহকারে বিষ্ণু প্রসাদ গ্রহণ করবেন এই বিশ্বাসে বৌদ্ধরা বৌদ্ধাচার্যকে দিয়ে অমেধ্য অন্ন একটি পাত্রে করে চৈতন্যদেবকে প্রদান করেন। চৈতন্যদেব বিষ্ণু প্রসাদ হিসেবে পাত্র হাতে ধারণ করলে একটি বড় পাখি থালাটি উপরে নিয়ে ফেলে দিলে– অমেধ্য অন্ন বৌদ্ধদের মাথায় এবং থালাটি বৌদ্ধাচার্যের মাথায় উপর পড়লে বৌদ্ধাচার্য অচেতন হয়ে যান।

সর্বজ্ঞ চৈতন্যদেব সবই অবগত ছিলেন। শুধু শিক্ষা প্রদানের জন্য এরূপ বিনয়। তৎক্ষণাৎ সকল বৌদ্ধরা তাদের গুরুদেবের প্রাণ লাভের জন্য চৈতন্যদেবের নিকট প্রার্থনা করলে তিনি কৃষ্ণ নাম কীর্তনের উপদেশ প্রদান করেন। ফলে তাঁদের গুরু নব জীবন ফিরে পায়। চৈতন্যদেব বৌদ্ধাচার্যের এরূপ বৈরিতাপূর্ণ আচরণ ক্ষমা করে মানবতার পরিচয় দিয়েছেন। একজন আচার্যের এরকম গর্হিত অপরাধ ক্ষমা করে তিনি তাদেরকে প্রেম প্রদান করেছেন।[২৩]

দরিদ্র শ্রীধরকে প্রেমদানের ক্ষেত্রে মানবতা:

দরিদ্র শ্রীধর নবদ্বীপের বামন পুকুরের নিকটে বসবাস করতেন। তিনি কলার থোড়, কলা, মোচা, মূল, খোলা প্রভৃতি বিক্রি করে দিনাতিপাত করতেন। এ কারণে তিনি খোলাবেচা শ্রীধর নামেই পরিচিত ছিলেন। দারিদ্র্যের কষাঘাতে তিনি অন্ন না খেয়ে রাত্রে উপবাসী থাকতেন। ক্ষুধার জ্বালায় রাত্রে নিদ্রা যেতে পারতেন না। তবুও তিনি কারো নিকটে ভিক্ষা করতেন না। কিন্তু সর্বজ্ঞ চৈতন্যদেব সর্বদা শ্রীধরের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করতেন। তাঁর নিকট থেকে কলা, থোর, মূল প্রভৃতি ক্রয় করার ফলে চৈতন্যদেব বিভিন্ন রঙ্গ করতেন। চৈতন্যদেব তাঁকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন।

কাজী দলনের পরে তিনি শ্রীধরের গৃহে গিয়ে ছিদ্র লোহার পাত্রে জল গ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্যদেব যেদিন শ্রীবাসের গৃহে সাতপ্রহরিয়া ভাব প্রদর্শন করেছিলেন, সেদিন শ্রীধরকে কৃপা করার জন্য স্বেচ্ছায় শ্রীধরের নাম ধরে ডাকাডাকি করেন। নদীয়ায় তখন কত ধনাঢ্য, বিদ্বান, পণ্ডিত ও ভক্ত থাকতেও তিনি শুধু শ্রীধরের নাম ধরে চিৎকার করেন তাঁকে প্রেমদান করার জন্য। চৈতন্যদেবের এই দিব্য প্রেম লাভ করা শ্রীধরের ক্ষেত্রে মহাভাগ্যের ব্যাপার। কেননা শ্রীধর দীন, দরিদ্র হলেও তিনি সত্যবাদী নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। তাই চৈতন্যদেবের অন্তরাত্মা শ্রীধরের প্রেমে ব্যাকুল হয়েছিল। এভাবেই চৈতন্যদেব মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তিনি সবাইকে প্রেম দিয়ে মানবতার শিক্ষা প্রদর্শন করেছেন। *চৈতন্যভাগবতে* পাই–

প্রভু বলে, "শ্রীধর, দেখহ রূপ মোর।
অষ্টসিদ্ধি-দান আজি করি 'দেঙ তোর ॥"
'মাগ মাগ' পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর বলয়ে, "প্রভু, দেহ' এই বর॥
যে ব্রাহ্মণ কাড়ি' নিল মোর খোলা-পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ ॥[২৪]

চৈ. ভা-মধ্য/৯/১৮৯, ২২৩-২২৪

হরিদাস ঠাকুরের প্রতি মানবতা প্রদর্শন:

হরিদাস ঠাকুর জন্মগত কারণে মুসলিম হলেও চৈতন্যদেব জাত বিচার না করে তাঁকে 'নামাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী ও বিদগ্ধ পণ্ডিত হয়েও মানবতা ও মহানুভবতার চরম পরিচয় দিয়েছেন হরিদাসের মহাপ্রয়াণের ক্ষেত্রে। তিনি হরিদাসের অন্তিম অভিলাষ পূরণ করেছিলেন। দেহত্যাগের পরে নিজ হাতে সমাধিস্ত করেছেন। তিনি আঁচল পেতে জীবনে কোন দিনও ভিক্ষা করেননি। হরিদাসের শ্রাদ্ধের জন্য পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আনন্দ বাজারে ভিক্ষা করে সকলকে নিজ হাতে ভোজন করিয়েছিলেন। এমন বিরল মানবতা অন্যত্র দেখা যায় না।[২৫]

রামানন্দের প্রতি মানবতা:

গোদাবরীতে রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যপাল রামানন্দ রায় শূদ্র বর্ণের ছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ ও তরুণ সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত রূপে ও গুণে এবং উপদেশে সকল মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেত। চৈতন্যদেব রামানন্দকে পেয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তখন রামানন্দ রায় বললেন– তুমি ঈশ্বরের অবতার আর আমি কোথায় শূদ্রাধম, বেদধর্ম মতে আমি তোমার স্পর্শযোগ্য নই। আমাকে স্পর্শে তোমার ঘৃণা ভয় হয় না? এই দৃশ্য হাজার হাজার ব্রাহ্মণ দর্শন করে তাদের মন দ্রবীভূত হয়েছিল, পুলকিত মনে চৈতন্যদেবের উপদেশে কৃষ্ণনাম করেছিল। এই হচ্ছে চৈতন্যদেবের মানবপ্রেম।[২৬]

জগতের মঙ্গল ও জীবোদ্ধারের জন্য চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস:

চৈতন্যদেব মহান পণ্ডিত ছিলেন। সংসার জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি জগৎকল্যাণের জন্য এবং জীবোদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি বলেছেন– সংসার সুখ পরিত্যাগ করে জগৎকল্যাণে প্রতিটি মানুষের দ্বারে ভিক্ষা করে তাঁদেরকে ধর্মপথে নিয়ে আসার জন্য আর্তি জানাবো। মানব মুক্তির জন্য তাঁর এরূপ আত্মত্যাগ ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। মানবতার আদর্শে তিনি জীবন্ত উদাহরণ।[২৭] জগৎকল্যাণের জন্য গৃহে ষোড়শী যুবতী স্ত্রী ত্যাগ করে এবং বৃদ্ধ মাতাকে রেখে তরুণ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণে তাঁর মানবতার মহিমা গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।[২৮]

তথ্যনির্দেশ :

১. ড. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ৫ম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০২০, পৃ. ২৫২-২৫৩

২. সুব্রত রায়, 'চৈতন্য সমকালীন নদীয়ার নগর বিকাশ ও নাগরিক জীবন', *নবজাগরণের প্রথম আলো শ্রীচৈতন্য*, প্রকাশক, কে.মিত্র, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, জুন, ২০১৪, পৃ. ৪৪-৪৮

৩. ঐ, পৃ. ৪৮-৫২

৪. ঐ, পৃ. ৫২-৫৩
৫. ঐ, পৃ. ৫৪-৫৫
৬. মমতাজুর রহমান তরফদার, 'ধর্মীয় জীবন', *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম মুদ্রণ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ১২৭
৭. ঐ, পৃ. ১২৮-১২৯
৮. ঐ, পৃ. ১৪২-১৪৩
৯. ড. আহমদ শরীফ, *সাহিত্যতত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্য*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ৩য় প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ২০১৯, পৃ. ১৭০-১৭১
১০. ঐ, পৃ. ১৯৫
১১. ঐ, পৃ. ৩০-৩৩
১২. ঐ, পৃ. ১৫৫
১৩. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদি খণ্ড, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর নদীয়া, দ্বাদশ সংস্করণ, ২০১৬, পৃ. ৯০৫-৯১৩
১৪. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ, *চৈতন্যভাগবত*, শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, মায়াপুর, নদীয়া, ২য় সংস্করণ, ২৩ মার্চ, ২০১৬, পৃ. ২১৭
১৫. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদি খণ্ড, পৃ. ৯৬৮
১৬. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, মায়াপুর, নদীয়া, ১ম সংস্করণ, ৮ মার্চ, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৩-১৩৪
১৭. ঐ, পৃ. ৩৭১-৩৭২
১৮. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ৩৪০
১৯. ড. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৯১/বি, পৃ. ৩৪৭-৩৫১
২০. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ২২৮
২১. ঐ, পৃ. ২০৪
২২. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্য ১ম খণ্ড, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪২২, পৃ. ৪২৪
২৩. ঐ, পৃ. ৪০৪-৪০৫
২৪. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ, *চৈতন্যভাগবত*, পৃ. ১৯২-১৯৩
২৫. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, *বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য*, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা, অরুণা প্রকাশন সংস্করণ, রথযাত্রা, ১৮ জুলাই, ২০১৫, পৃ. ২৬৬-২৬৭
২৬. ড. অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ৫ম সংস্করণ, নভেম্বর, ২০১৮, পৃ. ১৮৭
২৭. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, *বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য*, পৃ. ১৫৬-১৫৮
২৮. ঐ, পৃ. ১৭৪-১৭৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ প্রচারে ইসকনের ভূমিকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শাশ্বত বাণী যুগ যুগ ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানবের দার্শনিক মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। *গীতার* চতুর্থ অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥

গীতা-৪/১-৩

গীতার এই দিব্যজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে সূর্যদেবকে প্রদান করেছিলেন। সূর্য তা মনুকে এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে প্রদান করেছিলেন। পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিরা এ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হওয়ায় সেই দিব্যজ্ঞান নষ্টপ্রায় হয়েছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে দিব্যজ্ঞান দান সম্বন্ধে বলেছেন যে– সেই সনাতন যোগ অদ্য তোমাকে বললাম। কেননা তুমি আমার প্রিয় ভক্ত ও বন্ধু। তাই তুমিই দর্শনের গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার উত্তম ব্যক্তি।

আমরা দেখি প্রাচীনকালের রাজারা এই দর্শনতত্ত্ব লাভ করে প্রজার কল্যাণের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করতেন। সকল রাষ্ট্রের কর্ণধার ও সমাজের শাসকদের কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমে, সংস্কৃতির মাধ্যমে, ভক্তির মাধ্যমে এই জ্ঞান বিতরণ করা। কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হওয়ার কারণে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্বাপর যুগের শেষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তম ও যোগ্য ব্যক্তি অর্জুনকে এই দিব্য দর্শনতত্ত্ব প্রদান করেন। কেননা পরম্পরা ছাড়া প্রকৃত দর্শনতত্ত্ব লাভ করার বিকল্প কোন পথ নেই। সেই পরম্পরায় জ্ঞান আহরণ করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।[১]

শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত এই দিব্য জ্ঞান পরম্পরাক্রমে চৈতন্যদেব কলিযুগে প্রচার করেন। কলিযুগের মানুষের আয়ু স্বল্প। জরাব্যাধিগ্রস্থ মানুষের স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ। তাই যুগধর্ম অনুসারে কলিযুগে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব অন্ধকারে নিমজ্জিত পতিতদের উদ্ধারের জন্য সংকীর্তন আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন–

পৃথিবী ভিতরে যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম ॥[২]

চৈ. ভা-অন্ত্য/৪

এই বাণীকে স্বার্থকভাবে রূপায়িত করার জন্য চৈতন্যপরবর্তী ধারায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (কেদারনাথ দত্ত) আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে নবদ্বীপের লুপ্ত মায়াপুরকে পুনরায় আবিষ্কার করেন এবং মঠ নির্মাণ করেন। তিনি ঊনবিংশ শতকে বৈষ্ণব দর্শনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ১৮৬৮ সালের মার্চে দিনাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হয়ে সরকারি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রভিন্সিয়াল সিভিল সার্ভিসের এবং রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন।[৩]

তিনি *গোদ্রুম কল্পাটবী সমাচারের* সম্পাদক ছিলেন। তিনি তাতে নিত্যানন্দের নামহট্ট পুনঃপ্রবর্তন করেন।[৪] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর *জৈবধর্ম*, *ব্রহ্মসংহিতা* প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা, সংকলন এবং সম্পাদনা করেছেন।[৪(ক)] তিনি ১৭ বছর *সজ্জনতোষণী* পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেন। এছাড়া তিনি ইংরেজি, সংস্কৃত, ফারসি, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন।[৫]

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিদগ্ধ পণ্ডিতদের নিয়ে বাংলা ১২৯৯ সালের ২রা মাঘ রবিবার কৃষ্ণনগরে এক সভার আয়োজন করেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন সহ বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় তিনি বহু প্রাচীন প্রমাণ ও দলিলপত্র, মানচিত্র প্রভৃতি উপস্থাপন করেন। সকলেই মায়াপুর শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলে স্বীকার করেন এবং নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা গঠন করেন।[৬]

তারই ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর (বিমলা প্রসাদ) বিংশ শতকে গৌড়ীয় দর্শন প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের বহু গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা ও রচনা করেছেন। তিনি *চৈতন্যচরিতামৃত* ও *ভাগবতের* অনুভাষ্য রচনা করেন। বাংলা, হিন্দী, ইংরেজি, উড়িয়া ভাষায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত *হারমোনিষ্ট* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মায়াপুরে চৈতন্যদেবের জন্মস্থানে তিনি চৈতন্য মঠ স্থাপন করে যোগপীঠ নামকরণ করেন। মায়াপুরকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে ৬৪টি গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি চৈতন্যদেব প্রবর্তিত সম্প্রদায়কে ব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে রূপান্তর করেন। চৈতন্য মঠ হচ্ছে গৌড়ীয় মঠের শাখা। তিনি দক্ষিণ ভারত, উত্তর ভারত সর্বত্র চৈতন্য দর্শন প্রচার করে বৈষ্ণব সমাজে সর্বজন শ্রদ্ধেয় হিসেবে পূজিত হন। তিনি বিশ্ব বৈষ্ণব সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ দ্বারা সমাজ সংস্কার করে ব্রাহ্মণ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে সমাজকে রক্ষা করেন। তিনি প্রচার করেন জন্মসূত্রেই কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। সাধন, ভজন ও সংস্কারের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। তাই যজ্ঞোপবীত শুধু জন্মসূত্রে প্রাপ্য নয়, সংস্কার সূত্রে বৈষ্ণবরা লাভ করতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর দীক্ষিত নাম হয় শ্রীবার্ষভানবীদয়িত দাস। তিনি গণিত, জ্যোতিষ ও দর্শনশাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন, যার কারণে বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজ তাঁকে 'সিদ্ধান্ত সরস্বতী' উপাধি প্রদান করে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে মার্চ গৌরপূর্ণিমায় মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। তখন থেকে তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে পরিচিতি লাভ করেন এবং ঐদিনই তিনি চৈতন্য মঠে শ্রীচৈতন্যদেবের বিগ্রহ স্থাপন করে চৈতন্য মঠকে গৌড়ীয় মঠের প্রধান কেন্দ্ররূপে ঘোষণা করেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়সহ সকল মানুষের মধ্যে চৈতন্যদর্শন প্রচার করেন।

তিনি গৌড়ীয় দর্শন প্রচার কালে যে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করেছেন, তা হলো– ব্রহ্মসূত্রের উপর *মধ্বটীকা*, *পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্য*, *মধ্ববিজয়*, *গীতাভাষ্য*, *তত্ত্ববিবেক*, *মায়াবাদ-খণ্ডন*, জয়তীর্থের *'ন্যায়সুধা'*, ব্যাসতীর্থের *ন্যায়ামৃত*, বেদান্তের *শ্রীভাষ্য*, রামানুজের জীবনী *'প্রপন্নামৃত'* প্রভৃতি। তিনি সর্ব ভারতে গৌড়ীয় ও চৈতন্য মঠ স্থাপন করেন। তিনি মায়াপুর, কৃষ্ণনগর, কলকাতা ও কটকে ছাপাখানা স্থাপন করে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক মোট ৭টি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি পরাবিদ্যা পীঠ স্থাপন করে দক্ষিণ ভারত থেকে পণ্ডিত এনে দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

তিনি মায়াপুরে ইংরেজি শিক্ষার জন্য 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনস্টিটিউট' স্থাপিত করেন। তিনি শ্রীরূপ-সনাতন প্রবর্তিত বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা পুনরুজ্জীবিত করেন। বিংশ শতকে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে তাঁর ভূমিকা চিরস্মরণীয়। একারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে এক মহান সাধু বলে সম্মানিত করেন। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ও সুভাষ চন্দ্র বসু তাঁর নিকট ভগবৎ দর্শন শ্রবণ করেন।

তাঁর প্রসঙ্গে পণ্ডিত মদনমোহন বলেন–'সরস্বতী ঠাকুরের মত এক মহানপুরুষের দর্শন লাভ করিয়া সত্যিই আমি ধন্য, আমার বিশ্বাস তিনি একাই সারা পৃথিবীতে ভক্তিধর্ম প্রচার করবেন।'[৭] শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী সর্বত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যোগ্য উত্তরসূরি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বিভিন্ন ভাষায় ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে পত্রিকা প্রকাশ করে প্রচার করতেন।[৭(ক)]

গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য: গৌড়ীয় মঠ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য মঠের প্রধান শাখা। গৌড়ীয় মঠের আদর্শ শিক্ষানীতি গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। জড় জগতের মোহিনী মায়ার বশবর্তী হয়ে যে সকল মানব স্বীয় আবাস বিস্মৃত হয়ে মিথ্যা মরীচিকায় ধাবমান, তাদেরকে নিত্য আবাসস্থলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংবাদ পরিবেশনই হচ্ছে গৌড়ীয় মঠের প্রধান কাজ। যথা–

"কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল এই মাত্র ভিক্ষা চাই।"

যে ধর্ম ভগবৎ প্রণীত, কিন্তু অতীব গূঢ়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেই যে ধর্মের উত্তরাধিকারী হতে পারবে অর্থাৎ যা সর্বজনীন, সেই ধর্মের প্রচারই গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য। গৌড়ীয় মঠের কার্যক্রমের মধ্যমণি হচ্ছেন

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ। জীব শুদ্ধ চিত্তে চিন্ময় জ্ঞানের দ্বারা গোবিন্দের অর্চনা করে। সেটিই হচ্ছে সর্বোচ্চ পারমার্থিক সেবা।[৮]

শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী: ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গৌড় মোহন দে এবং মাতার নাম রজনী দেবী। তাঁর বাল্যকালে নাম ছিল অভয় চরণ দে। কোলকাতার ১৫১ নং হ্যারিসন রোডে তাঁর বাড়িটি ছিল। পিতৃদেব ছিলেন সুবর্ণ বণিক সমাজের বস্ত্রব্যবসায়ী। তাঁর মাতার ইচ্ছা তিনি বড় হয়ে ব্যারিস্টার হবেন। কিন্তু পিতৃদেবের ইচ্ছা তিনি জগতের প্রচারক হবেন। কোলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ১৯২০ সালে চতুর্থ বর্ষের পাঠ শেষ করে পরীক্ষায় উত্তীন হন। কিন্তু গান্ধীজীর রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থনে তিনি তাঁর ডিগ্রি প্রত্যাখ্যান করেন ।

তিনি ১৯২২ সালে কোলকাতায় প্রথম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। প্রথম দর্শনে সরস্বতী ঠাকুর বলেন– 'তোমরা শিক্ষিত যুবক, শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী সারাবিশ্বে প্রচার করছো না কেন?' তখন অভয় চরণ দে তাঁর কথায় বিস্মিত হন এবং তাঁর যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক আলোচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি তাঁকে অন্তঃকরণে গুরুদেব রূপে গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ১৯৩২ সালে এলাহাবাদে তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নিকট থেকে দীক্ষা লাভ করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে রাধাকুণ্ডের তীরে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে বলেন– 'অর্থ পেলে গ্রন্থ প্রকাশ করিও।' ১৯৩৬ সালে তিনি পত্রের মাধ্যমে গুরুদেবের চূড়ান্ত আদেশ পান যে, 'ইংরেজি ভাষায় তুমি আমাদের দর্শন প্রচার কর।' তিনি গুরুদেবের এই চূড়ান্ত নির্দেশকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে প্রচার কার্যে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন।[৯]

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ নামে সমধিক পরিচিত। তিনি গুরুদেবের নির্দেশ পেয়ে গীতার ভাষ্য রচনা করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি *'Back to Godhead'* নামক একটি ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পত্রিকার সম্পাদনাসহ প্রচার কাজ তিনি একাই করেন।[১০] গৌড়ীর মঠের পত্রিকা *দ্য হারমোনিস্ট*-এ তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। লেখনী ও বক্তৃতার দ্বারা গৌড়ীয় সমাজে তিনি পণ্ডিতরূপে সমাদৃত হন।[১১]

তাঁর দার্শনিক জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কারণে গৌড়ীয় সমাজ ১৯৪৭ সালে তাঁকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৫০ সালে তিনি গার্হস্থ্য আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং পারমার্থিক শাস্ত্রাধ্যয়নের নিমিত্তে ১৯৫৪ সালে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন। তিনি বৃন্দাবনের বিখ্যাত রাধাদামোদর মন্দিরে গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন।[১২] ১৯৫৯ সালে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ গুরু ভ্রাতা শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট থেকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। সন্ন্যাস আশ্রমে তাঁর নাম হয় শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী।[১৩] তিনি

বৃন্দাবনের মন্দিরে বসে শ্রীমদ্ভাগবতের ইংরেজি অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা আরম্ভ করেন। তখন তিনি *Every Journey to the other planets* নামক বইটি রচনা করেন। তিনি রাধাদামোদর মন্দিরে থাকা অবস্থায় ভাগবতের তিনটি খণ্ড প্রকাশ করেন।[১৪]

এরপর তিনি তাঁর পরমারাধ্য গুরুমহারাজ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের স্বপ্ন ও চূড়ান্ত নির্দেশ পালনের জন্য ১৯৬৫ সালের ১৩ আগস্ট জলদূত জাহাজে করে আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করেন। তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন একটি সুটকেস, একটি ছাতা ও কিছু শুকনো খাদ্য। তাঁর মূল বস্তু ছিল বাক্সভর্তি গ্রন্থ। সেটিই তাঁকে বেশি শক্তি জুগিয়েছিল। এছাড়া তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের ৮টি শ্লোক সমন্বিত ৫০০ প্রচারপত্র এবং ভাগবতের একটি মুদ্রিত বিজ্ঞাপন সঙ্গে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ভীষণ প্রতিকূলতার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা শুরু করেন। বৃদ্ধ, অসুস্থ ও সহায় সম্বলহীন অবস্থায় ৭০ বছর বয়সে সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির দেশে যাত্রা করা আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একই কথা। তবে গুরুদেবের বাণী সার্থকভাবে রূপায়ণের জন্য তিনি সকল প্রতিকূল অবস্থা উপেক্ষা করে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন।[১৫]

গুরুআজ্ঞা ও চৈতন্যদেবের ভবিষ্যৎ বাণী–

পৃথিবী ভিতরে যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥[১৬]

চৈ. ভা-অন্ত্য/৪

ভারতীয় সন্ন্যাসী হিসেবে আমেরিকাতে যাবার ও থাকার কোন সুব্যবস্থা তাঁর ছিল না। সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী হয়ে আমেরিকাতে গিয়ে দীর্ঘ এক বৎসর আধ্যাত্মিক যুদ্ধ করে তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে ISKCON প্রতিষ্ঠা করেন, অর্থাৎ International Society for Krishna Consciousness। তিনি বার্ধক্যের জরাজীর্ণতা ভুলে তারুণ্যের উদ্যমে ১৯৬৮ সালে মার্কিনের ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়ায় নব বৃন্দাবন গড়ে তোলেন। প্রায় ২০০০ একর জমির উপর এই নববৃন্দাবন সত্যই পাশ্চাত্যবাসীর নিকট পারমার্থিক সৌধকেন্দ্র। তিনি ১৯৭২ সালে ডালাসের টেক্সাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বৈদিক সংস্কৃতির সাথে স্থানীয়দের পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯৭৫ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশ বৃন্দাবনে ভিন্ন মাত্রায় কৃষ্ণ বলরাম মন্দির ও অর্ধশতাধিক অতিথিশালার সূচনা করেন। তিনি মুম্বাইয়ের জুহুতে আধুনিক স্থাপত্য ও শিল্পকলার নিদর্শনস্বরূপ বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করেন, যা পারমার্থিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে অনন্য। তাঁর উচ্চাভিলাষ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুর হবে ইসকনের প্রধান কেন্দ্র। সেটি হবে বৈদিক নগরী। ৫০ হাজার বৈষ্ণব ভক্তের বসবাসকারী নগরী। তাঁর পরিকল্পনা হচ্ছে বিশ্বের সর্বোচ্চ তারামণ্ডল বেষ্টিত মন্দির হবে, যেখানে সর্বশ্রেণির লোকদের আগমন ঘটবে এবং পৃথিবীখ্যাত মন্দির হবে, যা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পারমার্থিক নিদর্শন কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করবে।

গ্রন্থ রচনায় শ্রেষ্ঠ অবদান:

শ্রীল প্রভুপাদ ভারতীয় দর্শন ও পারমার্থিক শাস্ত্রের উপর ৮০টি গ্রন্থ রচনা করেন। মহান পণ্ডিতবর্গ তাঁর গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো ৫০টির বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি ইংরেজিতে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*, *শ্রীমদ্ভাগবত*, *চৈতন্যচরিতামৃত* অনুবাদ ও এর ভাষ্য রচনা করেন। তিনি পারমার্থিক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৫-১৯৭৭ অর্থাৎ ১২ বছরে তিনি ৬টি মহাদেশে ১৪ বার ভ্রমণ করেন। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে ভ্রমণ করলেও তিনি সর্বদা গ্রন্থ রচনার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি চৈতন্যদেবের বাণীর সার্থকতা দেখতে পান, যখন দেখেন যে, তাঁর দার্শনিক বক্তৃতা ও গ্রন্থ প্রচারের ফলে হাজার হাজার পাশ্চাত্যবাসী কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়েছে। চৈতন্যদেবের ভবিষ্যৎ বাণী সার্থক হয়েছে এবং তিনি গুরুদেবের নির্দেশ পালন করতে পেরেছেন। এই মহাত্মা ১৯৭৭ সালের ১৪ নভেম্বর বৃন্দাবনে অপ্রকট হন। তিনি ৪ সহস্রাধিক ভক্তকে দীক্ষা দান করেছেন। তিনি বিশ্বমানবতার মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন। জগৎ কল্যাণে তিনি আত্মোৎসর্গ করে সবার নিকট মহিমান্বিত ও পূজিত হয়েছেন।[১৭]

প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থ:

শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ ও শিক্ষা প্রসারে প্রভুপাদ বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা এবং ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। সেগুলো হলো– *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*, *শ্রীমদ্ভাগবত (১২ খণ্ড)*, *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ*, *শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা*, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, *উপদেশামৃত*, *অনুপম উপহার*, *আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা*, *আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর*, *শ্রীঈশোপনিষদ*, *কুন্তিদেবীর শিক্ষা*, *জীবন আসে জীবন থেকে*, *গীতার রহস্য*, *শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে*, *গীতার গান*, *Back to Godhead*, *বুদ্ধিযোগ*, *জ্ঞান কথা*, *ভক্তি কথা*, *ভক্তি রত্নাবলী*, *ভগবানের কথা*, *অমৃতের সন্ধানে*, *বৈদিক সাম্যবাদ*, *কৃষ্ণভাবনার অমৃত*, *কপিল শিক্ষামৃত*।[১৮]

প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থের প্রশংসা: শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন রচিত গ্রন্থগুলো বিশ্বের মনীষীদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে। এর ফলে মহান পণ্ডিতবর্গ পারমার্থিক আত্মোপলব্ধির জন্য তাঁর গ্রন্থকে অকাতরে গ্রহণ করেন এবং ভূয়সী প্রশংসা করছেন। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেন-"শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এক অমূল্য কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। মানব-সমাজের মুক্তির জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি এক অনবদ্য অবদান।"

বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও সাহিত্যিক জোসেফ জিন লানজো ভেলভাস্টো বলেন- "এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ হচ্ছেন একজন অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু আচার্য এবং এক মহান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।"

বোস্টন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক (ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস) ড. সুদা এল ভাট বলেন– "আজকের দুর্দশাগ্রস্ত জগতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীর এই গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে এক অতুলনীয় অবদান।" এছাড়া আরো বহু মনীষী তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[১৯]

ইসকন প্রতিষ্ঠা:

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্কে ইসকন অর্থাৎ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।[২০] তাঁর ইসকন প্রতিষ্ঠার মূল প্রেরণাদাতা হচ্ছেন তাঁর গুরুদেব সরস্বতী ঠাকুর। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের মানুষ যেন শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ ও শিক্ষা লাভ করে অমৃতময় জীবনের অধিকারী হতে পারে। ইসকন একটি সংগঠন। এই সংঘের মাধ্যমে গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং তা প্রচার করা হয়। সমগ্র বিশ্বে মন্দির নির্মাণ করা, গুরুকুল, বৈদিক স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, মানবের কল্যাণে প্রসাদ বিতরণ, হরেকৃষ্ণ সংগীত প্রচারসহ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।[২১]

হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে স্বীকৃতি:

শ্রীল প্রভুপাদ চৈতন্যদেবের শিক্ষা আন্দোলনকে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়রানির শিকার হন। এমনকি এই আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য নিউইয়র্কের হাইকোর্টে মামলা পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু ইসকন কর্তৃপক্ষের দার্শনিক যুক্তির কারণে নিউইয়র্কে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি এন. জে. লি মামলাটি খারিজ করে বলেছিলেন– 'হরেকৃষ্ণ আন্দোলন একটি বোনাফাইড রিলিজিয়ন, যার ভিত্তি ভারতবর্ষে প্রোথিত এবং এই ধর্মটি হাজার হাজার বছরের প্রাচীন।' এই মামলার রায়ের সংবাদটি প্রকাশ করেছিল– ১৯৭৭ সালের ২৮ মার্চ 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকা। এভাবেই শ্রীল প্রভুপাদ আইনী সংগ্রামের মাধ্যমে বলিষ্ঠভাবে সমগ্র বিশ্বে চৈতন্য শিক্ষা আন্দোলন প্রচার করেছিলেন।[২২]

ইসকনের গঠনপ্রণালী ও নীতিমালা:

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৬৬ সালে ইসকন প্রতিষ্ঠা করার পরে এই সংস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এর কার্যক্রম ও ভক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যার কারণে প্রভুপাদকে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হতো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভক্তরা তাঁর শিষ্য হন। নানা প্রকার আইনি জটিলতা ছিল প্রচার ও সাংগঠনিক বিষয়ে। সবদিক বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক সংঘ পরিচালনা করার জন্য আন্তর্জাতিক মানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ও সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং ভবিষ্যতে আইনি জটিলতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তিনি ইসকনকে আইনি কাঠামোতে গঠন করেন এবং নীতিমালা প্রণয়ন করেন। তিনি আমেরিকার লসএঞ্জেলেসে ১৯৭০ সালের জুলাইয়ে 'গভর্নিং বডি কমিশন' অর্থাৎ (জি.বি.সি) গঠন করেন । তিনি জি.বি.সি গঠন করার জন্য ১২ জন শিষ্যের নাম উল্লেখ করেন। তিনি ঘোষণা করেন–

"এখন থেকে এদের আমার প্রতিনিধিরূপে বিবেচনা করা হবে। যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন এরা আমার আঞ্চলিক সেক্রেটারিরূপে কাজ করবে এবং আমার অন্তর্ধানের পর তারা নির্বাহক বলে পরিচিত হবে।" এর পরে তিনি কয়েকজন শিষ্যকে ভক্তিবেদান্ত ট্রাস্টের ট্রাস্টিরূপে মনোনীত করেন। তিনি নির্দেশনা দেন "ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের টাকা বই ছাপানোর জন্য এবং সারা পৃথিবী জুড়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যয় করা হবে।

বিশেষভাবে তিনটি মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য মায়াপুর, বৃন্দাবন এবং জগন্নাথধাম পুরী।" তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে– জি.বি.সি ইসকনের সমগ্র কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে।[২৩]

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট (B.B.T.) প্রভুপাদের গ্রন্থ প্রকাশ করবে এবং বিতরণ করার জন্য একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হবে। এই ট্রাস্টের দায়িত্ব হচ্ছে ইসকনের সুবিধার্থে গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং গ্রন্থ বিতরণে সার্বিক ব্যবস্থাকরণ। B.B.T.- এর টাকা দুই ফান্ডে জমা হবে– একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং অপরটি ইসকনের জন্য ভূমি ক্রয় করা ও মন্দির নির্মাণ করা।[২৪]

শ্রীল প্রভুপাদ একজন এডভোকেট দিয়ে উইল সম্পাদনা করেন। এই উইল হচ্ছে চূড়ান্ত আদেশ। কিভাবে তাঁর অনুপস্থিতে ইসকনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে তা এতে বলা হয়েছে। এই উইলটিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, সমগ্র বিশ্বে ইসকনের কার্যক্রম পরিচালনায় সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব থাকবে জি.বি.সি- দের। কেননা ইসকন হচ্ছে ক্রমবর্ধমান একটি বিশাল সংগঠন। সারা পৃথিবীতে ইসকনের প্রচুর স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। তার সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ জি.বি.সি- দের খুব সতর্ক থাকতে বলেছেন। ইসকনের সব কিছুর মূলে রয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রচার এবং সবাইকে কৃষ্ণভাবনামৃত দান করা।[২৫]

শ্রীল প্রভুপাদ উইল করেন ১৯৭৭ সালের ৪ঠা জুন, বৃন্দাবনে। সেখানে তিনি ঘোষণা করেন যে–

১. গভর্নিং বডি কমিশন (জি.বি.সি) সম্পূর্ণ ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেসের পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হবে ।

২. প্রতিটি মন্দির ইসকনের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে এবং তিনজন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এগুলির দেখাশোনার দায়িত্বে থাকবেন। পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা এখন যেরকমভাবে চলছে সেরকমভাবে চলবে এবং এর কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

৩. ভারতবর্ষে স্থিত সম্পত্তি দেখাশুনা করবেন নিম্নলিখিত এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টররা:

(ক) মায়াপুর ধাম, পানিহাটি, হরিদাসপুর ও কলকাতার সম্পত্তি : গুরুকৃপা স্বামী, জয়পতাকা স্বামী, ভবানন্দ গোস্বামী, গোপাল কৃষ্ণ দাস অধিকারী।

(খ) বৃন্দাবনের সম্পত্তি : অক্ষয়ানন্দ স্বামী, গুরুকৃপা স্বামী, গোপাল কৃষ্ণ দাস অধিকারী।

(গ) বম্বের সম্পত্তি : তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী, গোপাল কৃষ্ণ দাস অধিকারী, গিরিরাজ দাস ব্রহ্মচারী।

(ঘ) ভুবনেশ্বরের সম্পত্তি : গৌরগোবিন্দ স্বামী, জয়পতাকা স্বামী, ভাগবত দাস ব্রহ্মচারী।

(ঙ) হায়দ্রাবাদের সম্পত্তি : মহংস স্বামী, শ্রীধর স্বামী, গোপাল কৃষ্ণ দাস অধিকারী ও বলীমর্দন দাস অধিকারী।

৪. ভারতের বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সম্পত্তি ও তার পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত জি.বি.সি সদস্যরা হলেন–

(ক) শিকাগো, ডেট্রয়েড ও অ্যান আয়বার এর সম্পত্তি : জয়তীর্থ দাস অধিকারী, হরিকেশ স্বামী, বলবন্ত দাস অধিকারী।

(খ) হাওয়াই, টোকিও, হংকং এর সম্পত্তি: গুরুকৃপা স্বামী, রামেশ্বর স্বামী, তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী।

(গ) মেলবোর্ন, সিডনি ও অস্ট্রেলিয়া ফার্মের সম্পত্তি: গুরুকৃপা স্বামী, হরি সৌরী ও আত্রেয় ঋষি।

(ঘ) ইংল্যান্ড (লন্ডন র‍্যাভলেট), ফ্রান্স, জার্মানী, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, সুইডেনের সম্পত্তি: জয়তীর্থ দাস অধিকারী, ভগবান দাস অধিকারী ও হরিকেশ স্বামী।

(ঙ) কেনিয়া, মরিশাস, সাউথ আফ্রিকার সম্পত্তি: জয়তীর্থ দাস অধিকারী, ব্রহ্মানন্দ স্বামী ও আত্রেয় ঋষি।

(চ) মেক্সিকো, ভেনিজুয়েলা, ব্রাজিল, কোস্টারিকা, পেরু, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, চিলির সম্পত্তি: হৃদয়ানন্দ গোস্বামী, পঞ্চ দ্রাবিড় স্বামী ও ব্রহ্মানন্দ স্বামী।

(ছ) জজটাউন, গায়ানা, সান্তা ডোমিংগো, সেন্ট অগাস্টিনের সম্পত্তি: আদি কেশব স্বামী, হৃদয়ানন্দ গোস্বামী ও পঞ্চ দ্রাবিড় স্বামী।

(জ) ভ্যাঙ্কুভার, সিয়াটেল, বার্কলে ও ডালাসের সম্পত্তি : সৎ স্বরূপ দাস গোস্বামী, জগদীশ দাস অধিকারী ও জয়তীর্থ দাস অধিকারী।

(ঝ) লস এঞ্জেলেস্, ডেনভার, সান দিয়েগো, লাওনা বীচের সম্পত্তি: রামেশ্বর স্বামী, সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী ও আদি কেশব স্বামী ।

(ঞ) নিউ ইয়র্ক, বোস্টন, পুয়ের্টোরিকো, পোর্ট রয়্যাল, সেন্ট লুইস, সেন্ট লুইস ফার্মের সম্পত্তি: তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী, আদি কেশব স্বামী ও রামেশ্বর স্বামী।

(ট) ইরানের সম্পত্তি: আত্রেয় ঋষি, ভগবান দাস অধিকারী ও ব্রহ্মানন্দ স্বামী।

(ঠ) পিটসবার্গ, নিউ বৃন্দাবন, টরেন্টো, ক্লীভল্যান্ড, বাফেলোর সম্পত্তি: কীর্তনানন্দ স্বামী, আত্রেয় ঋষি ও বলবন্ত দাস অধিকারী।

(ড) আটলান্টা, টেনেসি ফার্ম, গেইনসাভিল, মিয়ামি, নিউ অর্লিয়েন্স, মিসিসিপি ফার্ম, হিউস্টনের সম্পত্তি : বলবন্ত দাস অধিকারী, আদি কেশব স্বামী ও রূপানুগ দাস অধিকারী।

(ঢ) ফিজির সম্পত্তি : হরি সৌরী, আত্রেয় ঋষি ও বাসুদেব।

এইভাবে শ্রীল প্রভুপাদ ভবিষ্যতে আইনগত জটিলতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সারা বিশ্বে ইসকন পরিচালকবর্গ যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন, সেজন্য উইলে তাঁর শিষ্যদের দায়িত্বভার অর্পণ করে দিয়েছেন। প্রভুপাদ চিন্তা করেছেন তাঁর অবর্তমানে আইনানুগভাবে তাঁর শিষ্যরা অর্থাৎ জি.বি.সি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ইসকন পরিচালনা করতে পারবে।[২৬] ইসকনের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ সুনির্দিষ্ট বিধিমালা ও শৃঙ্খলা প্রণয়ন করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন এই বিধি-নিয়মগুলোর কোন পরিবর্তন আনা যাবেনা, যথা– জি.বি.সি কর্তৃক ইসকন পরিচালনা, জি.বি.সি কর্তৃক গ্রন্থ প্রকাশ, ষোলমালা কৃষ্ণনাম জপ ও বৈষ্ণবীয় বিধিবদ্ধ নিয়মগুলো যথাযথভাবে পালন করা, প্রত্যুষের অনুষ্ঠানাদি পালন করা এবং তাঁর (শ্রীল প্রভুপাদ) গ্রন্থগুলোকে নীতি-নির্ধারক গ্রন্থ বা ইসকনের আইন রূপে গণ্য করা। ইসকন কর্তৃপক্ষ প্রভুপাদ প্রণীত ও অনুমোদিত বিধিগুলোকে ইসকনের মূলনীতি ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন, যাকে এন, সি, আই, পি বলা হয়ে থাকে।[২৭] ১৯৭৭ সালে বৃন্দাবনের

কৃষ্ণবলরাম মন্দিরে তিনি তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাঁর অবর্তমানে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যোগ্য শিষ্যদের তিনি দীক্ষা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করবেন। তিনি বলেছিলেন "আমি তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে মনোনীত করব।"

পরবর্তীকালে জি.বি.সি- 'র অনুমোদন অনুসারে তাঁর যোগ্য শিষ্যরা গুরুপদে অধিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তদের হরিনাম দীক্ষা ও ব্রাহ্মণ দীক্ষা এবং সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান করে থাকেন। এছাড়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গ্রন্থে ইসকনের বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং নিয়ম-নীতির কথা বলেছেন। প্রভুপাদের এই কঠোর নির্দেশনায় ইসকন সমগ্র বিশ্বে মন্দির নির্মাণ করে শ্রীচৈতন্যদেবের নৈতিক শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করে সাফল্য অর্জন করে। এর ফলে সমগ্র বিশ্বে লক্ষ লক্ষ লোক চৈতন্যদেবের আদর্শের অনুসারী হয়েছে। এটিই ইসকনের শ্রেষ্ঠ অর্জন এবং প্রভুপাদের সমগ্র জীবনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন।[২৮]

মন্দিরসমূহ:

মন্দির হচ্ছে আধ্যাত্মিক চর্চা কেন্দ্র। সমগ্র মানব সমাজকে ভগবৎমুখী করে একই আশ্রয়ে আশ্রিত করে রাখার জন্য গগনচুম্বী মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে প্রযুক্তিমুখী মানবদের মধ্যে আধ্যাত্মিক আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য স্থাপত্য শিল্পকলার নিদর্শনস্বরূপ বিশাল বিশাল মন্দির নির্মাণ করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। প্রভুপাদ চেয়েছেন আধুনিক যুগে শিক্ষিত, ধনাঢ্য, সরকারের উচ্চ শ্রেণিরা এবং সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যাতে মন্দিরে গিয়ে সেখানের পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে হৃদয়ে আকর্ষণ বোধ ও উপলব্ধি করতে পেরে ভগবৎ চেতনা জাগ্রত করতে পারে। মূলত বিশ্বের মানব সমাজের প্রকৃত কল্যাণের জন্য, তাদের পারমার্থিক উন্নতির জন্য এবং চৈতন্যদেবের আদর্শ ও শিক্ষা প্রচারের জন্য উত্তম স্থান হিসেবে বিশাল বিশাল গগনচুম্বী কৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ করাই এর উদ্দেশ্য।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রচারকালীন সময়ে সমগ্র বিশ্বে ১০৮টি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমেরিকার ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় ২০০০ একর জমির উপর নব বৃন্দাবন, ডালাসের এবং নিউইয়র্কের গুরুকুল প্রতিষ্ঠান। তিনি ভারতের বৃন্দাবনে কৃষ্ণবলরাম মন্দির, মুম্বাইয়ের জুহুতে মন্দির, এছাড়া সমগ্র বিশ্বের ইসকনের প্রধান কেন্দ্ররূপে পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানে সুবিশাল চন্দ্রোদয় মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি গুরুকুল স্থাপন করেন। বিশ্বে ১৫টির বেশি গুরুকুল রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ইসকনের ৬৫০টির বেশি মন্দির, আশ্রম ও শাখা-প্রশাখা রয়েছে।[২৯] নিম্নে সেগুলোর সংক্ষেপে বর্ণনা দেওয়া হলো–

ভারত :

(১) আগরতলা, ত্রিপুরা, আসাম-আগরতলা রোড, বনমালীপুর, ৭৯৯০০১।
(২) আমেদাবাদ, গুজরাট-৭, কৌলাস সোসাইটি, আশ্রম রোড, ৩৮০০০৯।
(৩) বামনবোর, গুজরাট–এন. এইচ. ৮-বি, সুরেন্দ্র নগর (সিটি অফিস-৩২ অনন্তনগর, কলাবদ রোড,

রাজকোট)।

(৪) ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক–২১০ বেশারি রোড, সদাশিব নগর, ৫৬০ ০৮০।

(৫) বরোদা, গুজরাট, হরেকৃষ্ণ ল্যান্ড, গোত্রী রোড, ৩৯০ ০১৫/৩২৬ ২৯৯।

(৬) ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা-ন্যাশনাল হাইওয়ে, নং-৫, নয়াপল্লী ৭৫১ ০০১।

(৭) কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৩ সি, এ্যালবার্ট রোড, ৭০০ ০১৭/৪৩৩ ৭৫৭।

(৮) চণ্ডীগড়, পাঞ্জাব–হরেকৃষ্ণ ল্যান্ড, দক্ষিণ মার্গ, সেক্টর ৩৬-বি।

(৯) গুয়াহাটি, আসাম-পোষ্ট ব্যাগ নয়, ১২৭/৭৮১ ০০১।

(১০) হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ-হরেকৃষ্ণ ল্যান্ড, নামপল্লী স্টেশন রোড।

(১১) ইম্ফল, মণিপুর– হরেকৃষ্ণ ল্যান্ড, এয়ারপোর্ট রোড, ৭৯৫ ০০১।

(১২) শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির, মায়াপুর ৭৩১ ৩১৩, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

(১৩) মাদ্রাজ, তামিলনাড়ু-৫৯, বারকিট রোড, টি নগর, ৬০০ ০১৭।

(১৪) মৈরাং মণিপুর–নংবান ইংগখোন, তিদিম রোড।

(১৫) মুম্বাই, মহারাষ্ট্র– শ্রীশ্রী রাধা রাসবিহারী টেম্পল, হরেকৃষ্ণ ল্যান্ড, জুহু, ৪০০ ০৪৯/৬২৬ ৮৬০।

(১৬) নাগপুর, মহারাষ্ট্র-৭০ হিল্ রোড, রামনগর, ৪৪০ ০০০/৩৩ ৫১৩।

(১৭) নিউ দিল্লী -এম ১১৯ গ্রেটার কৈলাস, ১, ১১০ ০৪৮/ ৬৪ ১২০৫৮।

(১৮) পাঁধারপুর, মহারাষ্ট্র–হরেকৃষ্ণ আশ্রম, অ্যাক্রস্ চন্দ্রভাগা রিভার, জেলা- শোলাপুর, ৪১৩ ৩০৪।

(১৯) পাটনা, বিহার–রাজেন্দ্র নগর, রোড নং-১২, ৮০০ ০১৬/৫০ ৭৬৫।

(২০) পুণা, মহারাষ্ট্র-৪ তারাপুর রোড, ক্যাম্র, ৪১১ ০০১/৬০ ১৪।

(২১) শিলচর, আসাম-অম্বিকাপট্টি, শিলচর, ৭৮৮ ০০৪ কাছাড় জেলা।

(২২) শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ– সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি।

(২৩) সুরাট, গুজরাট– রেন্ডার রোড, জাহাঙ্গীরপুর, সুরাট, ৩৯৫ ০০৫।

(২৪) ত্রিবান্দ্রম, কেরালা- টি-সি-২৪/১৪৮৫, ডব্লু-সি-হস্পিটাল রোড।

(২৫) তিরুপতি, অন্ধ্রপ্রদেশ – কে, টি রোড, বিনায়ক নগর, ৫১৭ ৫০১।

(২৬) বৃন্দাবন, কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির, ভক্তিবেদান্ত স্বামী মার্গ, রমণরেতী, বৃন্দাবন, উত্তর প্রদেশ।[৩০]

Ahmedabad, Gujarat - Hare Krishna Land, Sarkhej Gandhinagar Highway, Satellite Road Crossing, 380059. Tel. (079) 26861945, E-mail : ISKCON.Ahmedabad@pamho.net

Sattelite Rd, Gandhinagar Highway Crossing, Ahmedabad 380 054 Tel. (079) 674-9827 or -9945, E-mail: jasomatinandan.acbsp@pamho.net

Allahabad, U.P. - Hare Krishna Dham 161 Kashi Raj Nagar, Baluaghat 211 003 Tel. (0532) 405294

Bangalore, Karnataka - Hare Krishna Hill, 1 OR' Block, Chord Road; Rajaji Nagar 560 010 Tel. (080) 332-1956 Fax: (080) 332-4818, E-mail: annda ithaips@pemi

Belgaum, Karnataka - Shukravar Peth, Tilak Wadi, 590 006

Bharatpur, Rajasthan - c/o Jeevan Nirman Sansthan, 1 Gol Bagh Road, 321 001 Tel. (05644) 22044 Fax: (05644) 25742

Brahmapur, Orissa - Lanjipalli. N.H. 5, Brahmapur, Dist. Ganjam, 760 008 Tel. (0680).2209400

Chennai, Tamil Nadu - Hare Krishna Land (Off East Coast Road), Bhaktivedanta Swami Road,(Near Malgudi), Injambakkam, Chennai - 600017, Tel. 044-24530920/21/22/23, E-mail: iskconchennai@eth.net, www.iskconchennai.com

Coimbatore, Tamil Nadu - Sri Jayannath Mandir, 100 Feet New Scheme Road Hare Krishna Land, Opposite to CIT, Coimbatore, Tamil Nadu - 641014, Tel. (0422) 2626508 E-mail: info@iskcon-coimbatore.org, Web: www.iskcon-coimbatore.org

Dwarka, Gujarat - Bharatiya Bhavan, Devi Bhavan Road, Dwarka 361335 Tel. (02892) 34606 Fax: (02892) 34319

Guntur, A.P. - Opp. Sivalayam, Peda kakani 522 509

Guwahati, Assam - Ulubari Chariali, South Sarania, 781 007, Tel. (0361) 545963 E-mail: guwahati@pamho.net

Hanumkonda, A.P. - Neeladri Rd, Kapuwada, 506 011, Tel. (08712) 77399

Haridwar, U.P. - Prabhupada Ashram; G House, Nai Basti, Bhimgoda. Haridwar 249401, (mail: P.O. Box 4), Tel. (01334) 260818

Indore, M.P. - Sri Sri Radha Krishna Temple, Iskcon, Nipania, Indore, Phone: 9300474043. www.iskconindore.info, E-mail: mahaman,acbsr@namho.net

Jaipur, Rajasthan-AB-95 96 Chanakya Marg, Nirman Nagar, 302019, Tel. (U141) 399650 Fax: (0141) 360273, E-mail: iskcon@jp 1.vsnl.net.in

Katra, Jammu and Kashmir - Srila Prabhupada Ashram, Srila Prabhupada Marg. Kalka Mata Mandir, Katra (Vashnov Mata) 182 101, Tel. (01991) 33047

Kurukshetra, Haryana - 369 Gudri Muhalla, Main Bazaar, 132 118 Tel. (01744) 22806 or 23529

Lucknow, U.P.-1 Ashak Nagar, Guru Govind Singh Marg, 226 018 Tel: (0522)2630003, Email: iskcon.lucknow@pamho.net

Ludhiana, Punjab - Sterling Tower, Vrindavan Rd, Near Kailash Cinema Chowk, Civil Lines, Ludhiana, 14100 1. Tel. (0161) 2770600, E-mail:iskcon.Ludhiana@pamho.net

Madurai, Tamil Nadu - 32 Chellatthamman Koil St. (Near Simmakkal), Madurai 625 001, Tel. (0452) 627565

Mangalore, Karnataka - Sri Jagannath Mandir, Near Hotel Woodlands Bunts Hostel Road Mangalore 575003, Phone-0824-2423326

Mumbai, Maharashtra - Sri Sri Radha Gopinath Mandir, 7 K. M. Munshi Marg, Chowpatty, Mumbai - 400 007, Tel. (022) 23697228 Fax: (022) 23665555, E-mail: info@radhgopinath.com, www.iskconchowpatty.com

Mumbai, Maharashtra - Sri Sri Radhagiridhari Temple, Bhaktivedanta Marg, Shristi-1, Near Bhaktivedanta Hospital, Mira Road, Thane 401107 Tel. 022-22923069, Fax: 022-28457238 E-mail: kaunteyaputrads@yahoo.co.in

Nagpur, Maharashtra- Sri Sri Radha Gopinatha, Bharatwada Road Ramanuja Nagar, Kalamana, Nagpur 8, mail:rasamandala.lok@pamho.net

New Delhi - Sant Nagar Main Road (Garhi), behind Nehru Place Complex (mail: P. O. Box 7061), 110 065 , Tel. 26235133-37

New Delhi - 14 63, Punjabi Bagh, 110 026, Tel. (011) 541-0782

Noida, UP - ISKCON Sri Sri Radha Govinda Mandir and Bhaktivedanta Academy for Spiriiual Sciences (BASS). A-5, Sector-33 In Front of NTPC Office Tel: 0120-2506211, E-mail: vraja.bhakti.vilas.lok@pamho.net

Puri, Orissa - Bhaktivedanta Ashram, Sipasirubuli, Puri, Tel. (06752) 213440

Salem, Tamil Nadu - Hare Krishna Land, Karuppur, Salem - 636 012 Tel. 09442151492, E-mail: iskcon.salem@pamho.net

Secunderabad, A.P. - 27 St. John's Road, 500 026 . Tel. (040) 780-5232 Fax: (040) 781-4021

Siliguri, W. Bengal - Gitaipara, Siliguri 734006, Tel. (0353) 2595046 E-mail: iskcon.siliguri@pamho.net

Sri Rangam, Tamil Nadu - 16A Thiruvadi Street, Trichy, 620 006 Tel. (0431) 433945

Surat, Gujarat - Bhaktivedanta Rajavidyalaya, Krishnalok, Surat-Bardoli Rd. Gangapur, P.O. Gangadhara, Dist. Surat, 394 310, Tel. (0261) 667075

Udhampur, Jammu and Kashmir - Srila Prabhupada Ashram, Prabhupada Marg, Prabhupada Nagar, Udhampur 182 101, Tel. (01992) 70298

Vallabh Vidyanagar, Gujarat - ISKCON Hare Krishna Land, 338 120 Tel. (02692) 30796

Varanasi, U.P. - Annapurna Nagar, Vidyapith Rd, Varanasi 221 001 Tel. (0542) 362617

Vishakapatnam, A. P. -Hare Krishna Land, Sagaranagar, Visakhapatnam 530045, phone no: (0891) 5537625, Email: samba.jps@pamho.net Office: 7-5-108,Pandurangapuram, Visakhapatnam-530003 Phone no: (0891) 2528376

Warangal - Mulugu Road, Aiyappa Pidipally, Warangal 506007 Tel. (08712) 26182

Chamorshi, Maharashtra - 78 Krishnanagar Dham, Dist. Gadhachiroli, 442 603, Tel. (0218) 623473

Hyderabad, A.P. - P. O. Dabilpur Village, Medchal Tq, R.R. Dist, 501 401 Tel. (040) 65520070, E-mail: naimisaranya@pamho.net

Indore, M.P. - (Krishna-Balarama Mandir) Hare Krishna Vihar, Nipania Village Tel. (731) 572794

Karnataka - (Bhaktivedanta Eco-Village) Nagodi P.O, Vollur Valley, Hosanagar Talug, Shivmoga District, 577 425 (mail: Garuda Guha, Kollur, D.K. District, 576 220)

Mayapur, West Bengal - (contact ISKCON Mayapur)

Vrindavana, U.P. - Vrinda Kund, Nandagaon, Dist. Mathura, U.P. E-mail: vrinda@aol.com

OTHER COUNTRIES

Alaminos, Philippines - 3rd/4th Floors, Donato's Trading Building, F. Fule Street, Alaminos, Laguna 4001/ Tel. +63 (049) 5672104 iskcon.philippines@yahoo.com

Cebu, Phillipines - Hare Krishna Paradise, 231 Pagsabungan Road, Basak, Mandaue City, Tel. +63 (032) 345-3590

Chittagong, Bangladesh - Caitanya Cultural Society, Sri Pundarik Dham Mekhala, Hathzari (mail: GPO Box 877). Tel. +88 (031) 225822

Colombo, Sri Lanka - 188 New Chetty St, 13, Tel: +94 11 2433325 Fax: +94 11 2471099, E-mail: iskcon@slt.lk

Dhaka, Bangladesh -5 Chandra Mohon Basak St, Banagram, 1203 Tel. +880 (02)236249, Email: iskcon@iskcon_bangladesh@yahoo.com

Hong Kong - 27 Chatham Road South, 6 F, Tel. +852 (2) 739-6818 Fax: +852 (2) 724-2186, E-mail: iskcon hong kong@pamho.net

Jakarta, Indonesia - P.O. Box 2694, Jakarta Pusat 10001, Tel. +62 (021) 489-9646

Jessore, Bangladesh - Nitai Gaur Mandir, Kathakhali Bazaar, P.O. Panjia Jessore,

Bangladesh- Rupa-Sanatana Smriti Tirtha, Ramsara, P.O. Magura Hat

Kathmandu, Nepal -Hare Krishna Dham, Budhanilkantha (mail: P. O. Box 3520), Tel. +977 (1) 373790, Fax: +977 (1) 372976 (Attn: ISKCON). E-mail: iskcon@wlink.com.np

Kuala Lumpur, Malaysia-Lot 9901, Jalan Awan Jawa, Taman Yarl, Off Old Klang Road, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia, Fax: +03-79879901, E-mail: president@iskconkl.com

Manila, Philippines - 92 Champagnat St, Corner Narra St, Marakina Heights, Marikina City, Tel. and fax: +63 (02) 890 1947, Tel. +63 (02) 8963357 E-mail: irma@skyinet.net

Phnom Penh, Kampuchea - 49ZE Preah Sothearos St, Sankat Tunle Bassac, Khan Chamcar Mon, Fax: +855 (023) 721742

Taipei, Taiwan - (mail: co ISKCON Hong Kong)

Tel Aviv, Israel - 16 King George St. (mail: P. O. Box 48163, 61480) Tel. +972 (03) 528-5475 Fax: +972 (03) 629-9011

Tokyo, Japan - 4-19-6 Kamatikada Nakano, 1F Subarhu Bldg, 164, Tel. +81 (03) 5343-9417 Fax: +81 (03) 5343-3812

Turkey-E-mail:adiradhika@hotmail.com, Discussion group: http:// groups.yahoo.com/group/ bolo_gauranitai/

Yogyakarta, Indonesia - P.O. Box 25, Babarsari YK, DIY

Aarhus, Denmark - Radio Krishna's Bogcafe, Thorvaldsensgade 32, 8000, Aarhus C, Tel. +45 (08) 676-1545

Amsterdam, The Netherlands - Van Hilligaertstraat 17, 1072 JX, Tel. +31 (020) 675-1404 Fax: +31 (020) 675-1405, E-mail: amsterdam@pamho.net

Antwerp, Belgium - Amerikalei 184, 2000, Tel. +32 (03) 237-0037

Bratislava, Slovak Republic - New Ekacakra, Abranovce 60, 08252 Kokosovce Slovak republic, Tel.+421 (51) 7798482, raghunatha.priya.bvs@pamho.net

Copenhagen, Denmark - Hare Krishna Tempel, Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse Denmark, Tel: +45 48 28 64 46, E-Mail: iskcon.denmark@pamho.net www.harekrishna.dk

Helsinki, Finland - Ruoholahdenkatu 24 D (3rd floor) 00180 Helsinki, Tel. +358 (0) 694-9879 Fax: +358 (0) 694-9837, E-mail: harekrishna@harekrishna.fi www.harekrishna.fi

lasi, Romania - Stradela Moara De Vint 72, 6600

Kaunas, Lithuania - 37, Savanoryu pr., Tel. +370 (7) 22-2574 Fax: +370 (7) 70-6642, E-mail: kaunas@pamho.net

Lisbon, Portugal - Rua Dona Estefania, 91 r/c 1000-153, Tel. & fax: +351 213520038, E-mail:info@iskcon-portugal.org, Web: www.iskcon portugal.org

Ljubljana, Slovenia - Zibertova 27, 1000, Tel. +386 (1) 431-2124,

E-mail: iskcon.ljubljana@pamho.net

Oslo, Norway - Jonsrudvej 1G, 0274, Oslo, Tel. +47 22552243 Fax: +47 22558172

Paris, France - 35 Rue Jean Vacquier, 93160 Noisy le Grand, Tel. +33 (01) 4304-3263 Fax: +33 (01) 4305-7864, E-mail: parisisvara@wanadoo.fr

Plovdiv, Bulgaria - ul. Prosveta 56, Kv. Proslav, 4015, Tel. +359 (032) 446962 E-mail: plovdiv@pamho.net

Porto, Portugal - Rua de S. Miguel 19. 4050-560, Tel. +351 (02) 200-5469, E-mail: iskcon.porto@clix.pt.

Prague, Czech Republic - Jilova 290, Praha 5-Zlicin 155 21, Tel. +42 (02) 5795-0391 or -0401 Fax: +42 (02) 302-1628, E-mail:prague@pamho.net

Pula, Croatia - Vinkuran centar 53, 52000 (mail: P.O. Box 16), Tel. & fax: +385 (052)573581

Riga, Latvia - 56, K. Baron st, LV1011, Tel. +371 (02) 27-2490 Fax: +371 (2) 27-4120

E-mail: riga@cis.bbt.se

Rijeka, Croatia - Sv. Jurja 32, 51000 (mail: P.O. Box 61). Tel. +385 (051) 543 055 Fax: +385 (051) 543 056, E-mail: navadvipa.hks@pamho.net

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina - Prozorska 11, 71000, Tel. +387 (033) 644 387

E-mail: templesarajevo@yahoo.com

Septon-Durbuy, Belgium - Chateau de Petite Somme, B-6940, Belgium, Tel +32 (086) 322926, Fax: +32 (086) 322929, E-mail: radhadesh@pamho.net www.radhadesh.com

Skopje, Macedonia - "Havanska 2, 1000 Skopje, tel. +389 (02) 3062087,

Sofia, Bulgaria - mail: Sofia 1220, P.O Box 5, Tel. +359/2/362748. E-mail: iskcon@harekrishnabg.com, www.harekrishnabg.com

Split, Croatia - Cesta Mutogras 26, 21312 Podstrana (mail: P.O. Box 290, 2100) Tel. +385 (021) 651137

Tallinn, Estonia - 11-97 Linnamae Tee st., Tel. +372 (2) 59-7569; (restaurant:) 44-2650, Email: info@harekrishna.ee

Timisoara, Romania - ISKCON, Porumbescu 92, 190, Tel. +40 (961) 54776. E-mail: damodara@online.ee

Vilnius, Lithuania - 23-1, Raugiklos st, 2024, Tel. +370 (2) 23-5218, E-mail: vilnius@pamho.net

Zagreb, Croatia - (mail: P.O. Box 68, 10001 Zagreb), Tel. & fax: +385 (01) 3772-643, http://www.viz.hr/

Ashgabat, Turkmenistan-17-48, Ashtabayeva st, Tel +7 (12) 29-8842, Baku, Azerbaijan, 2, Zardobi per, Uzbekistan st, pos. 8th km. 370060, Tel. +994 (12) 21-2376, E-mail: baku@pamho.net

Bishkek, Kirgizstan-5, Omsky per, 720007, Tel. +7 (3312) 24-2230 E-mail: ildar@nlpub.freenet.bishkek.su

Dushanbe, Tadjikistan - 38, Anzob st, 734001, Tel. +7 (3772) 27-1920 or -3990

Kishinev, Moldova - 13, A. Popovich st, 277022, Tel. +373 (2) 55-8099, E-mail: kishinev@cis.bbt.se

Minsk, Belarus - 11, Pavlova St, 220053 Minsk, Tel. +375 (17) 288-06-29 new.jaipur@ cis.pamho.net

Sukhumi, Georgia - st. Pr-t Mira d 274, Tel. +995 (8122) 2-9954

Tashkent, Uzbekistan - 54, Chervyakova st, 700005, Tel. +7 (3712) 93-0352 E-mail: root@krish.tashkent.su

Tbilisi, Georgia - 16, Kacharava st, Avchalskoye sh, 380053 Tel. +995 (32) 62-3326

Abidjan, Cote D'Ivoire - AICK-CI, 01 B.P. 8366

Gaborone, Botswana - P.O. Box 201003, Tel. +267 307768 Fax: +267 301988

Kampala, Uganda - Bombo Rd, near Makerere University (mail: P.O. Box 1647), Fax: +256 (041) 251145

Kisumu, Kenya - P.O. Box 547, Tel. +254 (035) 42546 Fax: +254 (035) 43294

Lome, Togo - Sis Face Place Bonke, Cote Blue Night, Tokoin Hopital, 01 BP 3105. Lome, Tel. +228 221 74 77, E-mail: Varaha.BTS@pamho.net

Marondera, Zimbabwe - 6 Pine Street (mail: P.O. Box 339) Tel. +263 (028) 887-7801

Mombasa, Kenya - Hare Krishna House, Sauti Ya Kenya and Kisumu Rds. (mail: P.O. Box 82224), Tel. +254 (011) 312248

Nairobi, Kenya - Muhuroni Close, off West Nagara Rd. (mail: P.O.Box 28946), Nairobi, Tel. +254 203744365

Phoenix, Mauritius - Hare Krishna Land, Pont Fer (mail: P. O. Box 108, Quartre Bornes), Tel. +230 696-5804 Fax: +230 686-8576 E-mail: iskcon.hkl@bow.intnet.mu

Rose Hill, Mauritius - 13 Gordon St., Tel. +230 454-5275, E-mail:iskcon.hkl@intnet.mu

NORTH AMERICA

CANADA

Calgary, Alberta - 313 Fourth Street N.E, T2E3S3 Tel. (403) 265-3302 Fax: (403) 547-0795, E-mail: sahadevs@cadvision.com

Edmonton, Alberta -9353 35th Ave NW Click here for more information

Montreal, Quebec - 1626 Pie IX Boulevard, H1V 2C5 Tel. & fax: (514) 521-1301, E-mail: iskconmontreal-sprint.ca

Ottawa, Ontario - 212 Somerset St. E, K1N 6V4, Tel. (613) 565-6544 Fax: (613) 565-2575, E-mail: 102623.2417@compuserve.com

Regina, Saskatchewan - 1279 Retallack St, S4T 2H8, Tel. (306) 525-1640

Toronto, Ontario - 243 Avenue Rd, M5R 2J6, Tel. (416) 922-5415 Fax: (416) 922-1021, E-mail: toronto@pamho.net

Vancouver, B.C.-5462 Marine Dr, Burnaby V5J 3G8 Tel. (604) 433-9728, E-mail:akrura@krishna.com

Winnipeg, Manitoba - 11 Alloway Ave. Winnipeg, Manitoba R3G OZ7

UNITED STATES OF AMERICA

Atlanta, Georgia - 1287 South Ponce de Leon Ave. NE, 30306, Tel. (404) 378 9234 Fax: (404) 373-3381, E-mail: bala108@earthlink.net

Baltimore, Maryland - 200 Bloomsbury Ave, Catonsville, 21228 Tel. (410) 719-1776 Tel. & fax: (410) 799-0642 E-mail: info@baltimorekrishna.com, Web: www.baltimorekrishna.com

Berkeley, California - 2334 Stuart Street, 94705, Tel. (510) 540-9215 E-mail: berkeley@com.org. Web: www.iskconleicester.org/

Boise, Idaho - 1615 Martha St, 83706, Tel. (208) 344-4274 E-mail: arun gupta@hp-boise-om.hp.com

Boston, Massachusetts - 72 Commonwealth Ave. 02116, Tel. (617) 247-8611 Fax: (617) 266-3744. E-mail: pyari@sbcglobal.net

Chicago, Illinois - 1716 W. Lunt Ave, 60626, Tel. (773) 973-0900 Fax: (773) 973 0526, E-mail: information@iskconchicago.com, www. iskconchicago.com

Columbus, Ohio - 379 W. Eighth Ave. 43201, Tel. (614) 421-1661 Fax: (614) 294-0545. E-mail: rmanjari@aol.com

Dallas, Texas - 5430 Gurley Ave, 75223, Tel. (214) 827-6330 Fax: (214) 823 7264, E-mail: info@radhakalachandji.com

Denver, Colorado - 1400 Cherry St, 80220 , Tel. (303) 333-5461 Fax: (303) 321-9052, E-mail: info@krishnadenver.com

Detroit, Michigan - 383 Lenox Ave, 48215, Tel. (313) 824-6000 E-mail:gaurangi 108@hotmail.com, www.detroitiskcon.org

Gainesville, Florida - 214 N.W. 14th St, 32603, Tel. (352) 336-4183 E-mail: Kalakantha.acbsp@pamho.net

Gurabo, Puerto Rico - P.O. Box 1338, 00778, Tel. (787) 737-3917 E-mail: nrshingha@aol.com

Hartford, Connecticut - 1683 Main St, E. Hartford, 06108. Tel. & fax: (860) 289-7252. E-mail: bhaktirasa@poboxes.com, http://www.iskconct.org

Honolulu, Hawaii -51 Coelho Way, 96817, Tel. (808) 595-3947 Fax: (808) 595 3433, E-mail: iskcon@aloha.net

Houston, Texas - 1320 W. 34th St, 77018, Tel. (713) 686-4482 Fax: (713) 686 0669, E-mail: mbalar@hal-pc.org

Laguna Beach California - 285 Legion St. 92651, Tel. (714) 494-7029 Fax: (714) 497-9707, E-mail: info@lagunatemple.com

Los Angeles, California - 3764 Watseka Ave, 90034, Tel. (310) 836-2676 Fax: (310) 839-2715, E-mail: svavasa.acbsp@pamho.net

Miami, Florida - 3220 Virginia St, 33133 (mail: P.O. Box 337, Coconut Grove, FL 33233), Tel. (305) 442-7218 Fax: (305) 444-7145, devotionalservice@iskcon miami.org

New Orleans, Louisiana - 2936 Esplanade Ave, 70119, Tel. (504) 304-0032 (office) or (504) 638-3244 (temple) E-mail: iskcon.new.orleans@pamho.net

New York, New York - 305 Schermerhorn St, Brooklyn, 11217 Tel. (718) 855-6714 Fax: (718) 875-6127, E-mail: ramabhadra@aol.com

New York, New York

26 Second Avenue, 10003 (mail: P. O. Box 2509, New York, NY 10009) Tel. (212) 253-6182, E-mail: krsna.nyc@gmail.com

Philadelphia, Pennsylvania - 41 West Allens Lane, 19119, Tel. (215) 247-4600 Fax: (215) 247-8702, E-mail: vrndavana@netreach.net

Philadelphia, Pennsylvania - 1408 South St, 19148, Tel. (215) 985-9335 E-mail: savecows@aol.com

Phoenix, Arizona - 100 S. Weber Dr, Chandler, 85226, Tel. (480) 705-4900 Fax: (480) 705-4901, E-mail: svgd 108@gmail.com, www.iskconphx.org

Portland, Oregon-2095 NW Alocleck Drive, Suite 1107 & 1109, Hillsboro, OR 97124, Phone:503-439-9117.E-mail:info@iskconportland.comq, www.iskconportland.com/php/

St. Louis, Missouri - 3926 Lindell Blvd, 63108, Tel. (314) 535-8085 Fax: (314) 535-0672, E-mail:rpsdas@gmail.com

San Diego, California - 1030 Grand Ave, Pacific Beach, 92109 Tel. (858) 272-8263, E-mail: krishna.sandiego@gmail.com

San Jose, California - 951 South Bascom Avenue., San Jose, CA 95128 Tel. (408) 293 4959, E-mail: iskconsanjose@yahoo.com www.virtualtemple.org

Seattle, Washington - 1420 228th Ave. S.E, Issaquah, 98027. Tel. (425) 391 3293 Fax: (425) 868-8928, E-mail: info@iskconseattle.com

Spanish Fork, Utah - Krishna Temple Project & KHQN Radio, 8628 S. State Rd, 84660, Tel. (801) 798-3559 Fax: (80d1) 798-9121 E-mail: carudask@burgoyne.com

Tallahassee, Florida - 1323 Nylic St, 32304, Tel. & fax: (850) 2243803 E-mail: darudas@hotmail.com

Towaco, New Jersey - P.O. Box 109, 07082 Tel. & fax: (973) 299-0970 E-mail: samik-rsi.acbsp@pamho.net

Tucson, Arizona - 711 E. Blacklidge Dr, 85719, Tel. (520) 792-0630 Fax: (520) 791-0906, E-mail: 105613.1744@compuserve.com

Washington, D.C. - 10310 Oaklyn Dr, Potomac, Maryland 20854 Tel. (301) 299-2100 Fax: (301) 299-5025. E-mail: potomac@pamho.net

Europe

UNITED KINGDOM AND IRELAND

Belfast, Northern Ireland - Brooklands, 140 Upper Dunmurry Lane, Belfast, BT17 OHE, Tel. +44 (028) 90620530, E-mail: lyall.ward@pamho.net, Web: Radha Madhava's Blog, Website: www.belfast.iskcon.com

Birmingham, England - 84 Stanmore Rd, Edgbaston, B16 9TB, Tel. +44 (0121) 420-4999, http://www.iskcon.org.uk/birmingham

Cardiff, Wales - The Soul Centre, 116 Cowbridge Road East CF 11 9DX, Tel. +44 (02920) 390391, E-mail: the.soul.centre@pamho.net www.iskconwales.org

Coventry, England - Kingfield Rd, Radford, West Midlands (mail: 19 Gloucester St, CV1 3BZ). Tel. +44 (01203) 552822 E-mail: haridas.kds@pamho.net http://www.iskcon.org.uk/coventry

Scotland - Karuna Bhavan, Bankhouse Rd, Lesmahagow, Lanarkshire ML11 OES, Tel. +44 (01555) 894790 Fax: +44 (01555) 894526 E-mail: karunabhavan@aol.com, http://www.iskcon.org.uk/scotland

Leicester, England - 21 Thoresby St, North Evington, LE5 4GU Tel: +44 (0116) 2762587, E-mail: pradyumna.jas@pamho.net Web: www.iskconleicester.org

London, England (city)-910 Soho St, W1V 5DA, Tel. +44 (0171) 437-3662: (residential/pujaris/shop:) Fax: +44 (0171) 439-1127 ISKCON Educational Services (Soho)

Govinda's Restaurant: - Tel. +44 (0171) 437-4928; (office:) 437-5875 E-mail: london@pamho.net

London, England (country) - Bhaktivedanta Manor, Dharam Marg, Hillfield Lane, Watford, Herts, WD2 BEZ. Tel. +44 (01923) 851000 Fax: +44 (01923) 852896. E-mail: bhaktivedanta.manor@pamho.net http://www.krishnatemple.com

London, England (south) - 42 Enmore Road, South Norwood, SE25 Tel. +44 (0181) 656-4296

Manchester, England - 20 Mayfield Rd, Whalley Range, M16 8FT Tel. +44 (0161) 226-4416, Tel. & fax: +44 (0161) 860-6117 http://www.iskcon.org.uk/manchester

Newcastle upon Tyne, England - 304 Westgate Rd, Tyne & Wear, NE4 68R Tel. +44(0191) 222-0150, Email: newcastle @iskcon.org.uk http://www.iskcon.org.uk/newcastle

Oxford, England - Kirtan group, meets monthly kirtans.blogspot.com Tel. +44 (01865) 331716

Romford, England - 3 Rowan Walk, Hornchurch, Essex, RM11 2JA Tel. +44 (01708) 454092

Swansea, Wales - Govinda's Vegetarian Restaurant, 8 Cradock St, SA1 3EN Tel/fax. +44 (01792) 468469, E-mail: iskcon.swansea@pamho.net www.iskconwales.org, www.govindasvegetarianrestaurant.org

RURAL COMMUNITIES

Lisnaskea, Northern Ireland - Govindadvipa Dhama, ISKCON Inis Rath Island, Derrylin, Co. Fermanagh, BT92 9GN, Tel. +44 (028) 6772 1512 E-mail: radhanatha.sdg @pamho.net

GERMANY

Berlin - Kastanienallee 3, 10435 Berlin, Tel.: +49 (030) 44357296
E-mail: vmd64@hotmail.com, www.krsna-is-cool.de

Hamburg - Eiffestrasse 422, 20537 Hamburg, Tel.: +49 (040) 4102848
E-mail: vaidac@aol.com, www.bhaktiyogazentrum.de

Heidelberg - Forum 5 / Wohnung 4, 69126 Heidelberg, Tel.: +49 (06221) 384553,
E-mail: vipula@pamho.net, www.iskcon-heidelberg de

Cologne - Taunusstrasse 40, 51105 Koeln, Tel.: +49 (0221) 8303778
e-mail: keshava@gauradesh.com, www.gauradesh.com

Leipzig - Stoeckelstrasse 60, 04347 Leipzig, Tel.: +49 (0341) 2348055
E-mail: sadbhuja@gmx.net, www.krsna-is-cool.de

Munich - Wachenheimer Strasse 1, 81539 Muenchen, Tel.: +49 (089) 68800288

E-mail: iskcon munich@pamho.net, www.krishnatempel.de

Trier - Boeckingstrasse 4a, 55767 Abentheuer, Tel.: +49 (06782) 2214
E-mail: info@goloka-dhama.de, www.goloka-dhama.de

Wiesbaden - Aarstrasse 8, 65329 Burg Hohenstein, Tel.: +49 (06120) 904 107
E-mail: iskcon.wiesbaden@web.de, www.iskconwiesbaden.de

HUNGARY

Budapest-Lehel u. 15 - 17., 1039, Tel. +36 (01) 391-04-35 Fax: (01) 3975219 E-mail:nai@pamho.net, www.haribol.hu, Bhaktivedanta College Andrássy út 53. I.em. 1., 1062, Tel.: +36 (01) 321-7787, E-mail: bhf.info@externet. Govinda Res. taurant, Vigyázó Ferenc utca 4; 1051, Tel. +36 (01) 269-1625, Fax. +36 (01) 473-1310,e-mail: govinda@invitel.hu

Debrecen-Péterfia u.57, 4026, Tel. +36 (052) 458-092, E-mail: debrecen@parnho.net

Eger - Szechenyi u. 64, 3300, Tel. +36 (036) 313-761, E-mail: eger@pamho.net

Kecskemét - Felsöcsalános 116., 6000, Kecskemét 6001, Pf. 546. Tel. +36 (076) 480-920, E-mail: kecskemet@pamho.net

Pecs - Damjanich u. 22, 7624 , Tel. +36 (072) 515-990, 515-991 Fax. +36 (072) 515-992, www.krisnaudvar.com

ITALY

Asti - Frazione Valle Reale 20, 14018 Roatto (AT), Tel. +39 (0141) 938406

Bergamo - Villaggio Hare Krishna, (da Medolago strada per Terno d'Isola), 24040 Chignolo d'Isola (BG), Tel. +39 (035) 494-0706, Fax: +39 (035) 494-0705 E-mail: villaggio.hare.krsna@pamho.net

Bologna - Via Ramo Barchetta 2, Castagnolo Minore, 40010 Bentivogolio (BO) Tel. +39 (051) 863924

Rome - Govinda Centro Hare Krsna - via di S. Maria del Pianto, 15/17, 00186Roma, tel: +39.06.68891540, E-mail: roma@govinda.it

Vicenza - Prabhupada-desa, Via Roma 9, 36020 Albettone (VI), Tel/Fax +39 (0444) 790573

POLAND

Warsaw - Mysiadlo, k. Warszawy, 05-500 Piaseczno, ul. Zakret 11. (mail: *MTSK, 02-770, Warszawy 130, P.O. Box 257), Tel. +48 (022) 750-7797* or -8248 Fax: +48 (022) 750-8249

Wroclaw -ul. Brodzka 157, 54-067 Wroclaw, Tel/fax. +48-(071) 3543802, Email: kavicandra.kkd@pamho.net

SPAIN

Barcelona - Plaza Reial 12, Entlo 2, 08002, Tel. +34 (93) 302-5194, E-mail: templobcn@hotmail.com

Madrid - Espiritu Santo 19, 28004, Tel. +34 (91) 521-3096

Málaga - Ctra. Alora, 3. Int, 29140 Churriana, Tel. +34 (95) 262-1038

Santa Cruz de Tenerife - Castillo, 44, 4^{o}, Santa Cruz 38003, Tel. +34 (922) 241035 Tenerife, C La Milagrosa, 6, La Cuesta, La Laguna, Tel. +34 (922) 653422

SWEDEN

Göthenburg - Karl Johansgatan 57, 414 55 Göteborg, Tel. +46 (031) 879648 www.harekrishnagoteborg.com

Grödinge - Korsnäs Gård, 14792, Tel. +46 (8530) 29151 Fax: +46 (08530) 25062

E-mail: bmd@pamho.net

Lund - Bredgatan 28 ipg, 222 21, Tel. +46 (046) 399500; Restaurant: +46 (046) 120413 Fax: +46 (046) 188804

Stockholm - Fridhemsgatan 22, 11240, Tel. +46 (08) 654-9002 Fax: +46 (08) 6508813

Uppsala - Nannaskolan sal F 3, Kungsgatan 22 (mail: Box 833, 751 08, Uppsala) Tel. +46 (018) 102924

SWITZERLAND

Basel - Bhakti-Yoga-Zentrum, St. Jakobs-Str. 33, 4132.Muttenz Tel./Fax: +41 (061) 462 06 14, E-mail: kgs@pamho.net

Zürich-Bergstr. 54, 8030 Zurich, Tel. +41 (01) 262 3388, Fax: +41 (0)1 262 3114
E-mail: kgs@pamho.net www.krishna.ch

COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES (CIS)

RUSSIA

Astrahan - 141052, 8-59, Botvina st., Tel. +7 (8510) 28-9431 Chita, 27. Kurnatovskogo st., Tel. +7 (30222) 23-4971 E-mail: kar@rex.chita.ru

Ekaterinburg - 620078, G. Ekaterinburg, per. Otdelniy 5DK VOG Tel. +7 (3432) 74-2200 E-mail: ekaterinburg@cis.bbt.se

Irkutsk - st. Krimskaya 6A , Tel. (3952) 38-71-32 or 3240-62

Kazan - 13, Sortirovochnaya st, pos. Yudino, Tel. +7 (8432) 55-2529

Krasnodar - 418, Stepnaya st, selo Elizavetinskoye, Krsnodarski krai Tel. +7 (8612) 50-1694

Kurjinovo - 8, Shosseinaya st, pos. Ershovo, Urupski region, Karachayevo Cherkessia

Moscow -83, Khoroshevskoye sh. (mail: P.O. Box 69). 125284 Tel. +7 (095) 255-6711 Tel. & fax: +7 (095) 945-3317

Moscow - Nekrasovsky pos, Dmitrovsky reg. 141700 Tel. +7 (095) 577-8543, -8601, Fax: +7 (095) 446-4746

Murmansk -16, Frolova st. (mail: P.O. Box 5823) Tel. +7 (8152) 58-9284 E-mail: upendra@mun.rospac.ru

Nijny Novgorod-14b, Chernigovskaya st., Tel. +7 (8312) 30-5197 E-mail: info@iskcon.nnov.ru

Novorossiysk - 117, Shillerovskaya st., Tel. +7 (86134) 38-926 or 51-415

Novosibirsk - 82 Kholodilynaya st, 630001, Tel. +7 (3832) 46-2655 or -2666

Omsk - 664099, 42 10th Severnaya st. (mail: P.O. Box 8741) Tel. +7 (3812) 24-5310

Perm - 12. Verhnekuryinskaya st, 614065, Tel. +7 (3422) 33-5740

Rostov-Na-Donu - 841, Saryana st, 344025 (mail: P.O. Box 64, 344007) Tel. & fax: +7 (8632) 51-0456

Samara - 122, Aeroportovskoye sh, Zubchininovka, Tel. +7 (8462) 97-0318 or -0323

Simbirsk - 10, Glinki st, 432002, Tel. +7 (8422) 21-4016

Sochi - 81a, Lesnaya st, Bytha, Tel. +7 (8622) 98-5639 Tel. & fax: +7 (8622) 97-2483

Ulan-Ude - 670013, Prirechnaya str. 23, Tel. +7 (3012) 30-795 E-mail: abpchk@burnet.siberia.ru

Vladimir - 60000, Nikolo-Galeyskaya st. 5625, Tel. +7 (0922) 32-6726 E-mail: vladimir@cis.bbt.se

Vladivostok - Fikhtovaya st, 33, Tel. +7 (4232) 353026 or 695049

RESTAURANTS

Ekaterinburg - Sankirtana, 33 Bardina st., Tel. +7 (3432) 41-2737

St. Petersburg - Govinda's, 58, Angliysky pr, 190008, Tel. +7 (812) 113-7896

Vladivostok - Okeansky Prospect, 12. Tel. +7 (4232) 26-8943
E-mail: vrajendra.kumar.pvs@pamho.net

Almaty, Kazakstan - Govinda's, 39 Ablay Khan Avenue, Almaty City 050004 Kazakhstan, tel. +7(727)2710836, fax +7(727)2713235, e-mail: almaty@cis.pamho.net, www.krishna.kz

UKRAINE

Dnepropetrovsk - Kalininskiy spusk 39, Tel. +73 (0562) 42-3631

Donetsk -22, Rubensa st, Makeyevka 339018 , Tel. +380 (0622) 94-9104, E-mail: premada@iskcon donetsk.ua

Kharkov - 43, Verhnegiyevskaya st. Holodnaya Gora, 310015 Tel. +380 (0572) 24-2167, E-mail:kharkov@cis.pamho.net

Kiev - Dmitrievskaya, 21-13, Tel. +380 (044) 219-1041, Tel. & fax: +380 (044) 244-4934, E-mail: kiev@pamho.net

Kiev - 16, Zorany per 254078, Tel. +380 (044) 433-8312, E-mail: kiev@pamho.net

Lvov - 4, Aurora st, Bldg. No. 4, 290032, Tel. +380 (0322) 33-3106

Nikolaev - 5-8, Sudostroitelny per, 327052 , Tel. +380 (0510) 35-1734

E-mail: vandya@iskcon.aip.nikolaev.ua

Vinnica - 5, Chkalov st, 28601, Tel. +380 (0432) 32-3152 E-mail: om@iskcon.vinnica.ua

AUSTRALIA

Adelaide - Sri Sri Radha Syamasundara Mandir, 25 Le Hunte St Kilburn, SA 5084, Tel: +61 (08) 8359-5120, Fax: +61 (08) 8359-5149 Email: iskconsa@tpg.com.au

Brisbane - 95 Bank Rd, Graceville (mail: P.O. Box 83, Indooroopilly), QLD 4068, Tel. +61 (07) 3379-5455 Fax: +61 (07) 3379-5880 E-mail: brisbane@iskcon.org.au

Canberra - 44 Limestone Ave, Ainslie, ACT 2602, Tel. +61 (02) 62626208
E-mail: iskcon@harekrishnacanberra.com

Melbourne - 197 Danks St, Albert Park, (mail: P.O. Box 125). VIC 3206 Tel. +61 (03) 9699-5122, Fax: +61 (03) 9690-4093, Web: www.iskcon.net.au, E-mail: melbourne@pamho.net

Perth - 144 Railway Parade, (mail: P.O. Box 102), Bayswater, WA 6053 Tel. +61 (08) 9370-1552, Fax: +61 (08) 9272-6636, E-mail: perth@pamho.net

Sydney - 180 Falcon St, North Sydney, NSW 2060 (mail: P.O. Box 459, Cammeray, NSW 2062), Tel. +61 (029) 9959-4558 Fax: +61 (029) 9957-1893, E-mail: sraddhavan@hotmail.com

NEW ZEALAND, FIJI, AND PAPUA NEW GUINEA

Christchurch, NZ - 83 Bealey Ave. (mail: P.O. Box 25-190), Tel. +64 (03) 366-5174 Fax: +64 (03) 366-1965, E-mail: iskconchch@clear.net.nz

Labasa, Fiji - Delailabasa (mail: P.O. Box 133). Tel. +679 812912 E-mail: fiji@pamho.net

Lautoka, Fiji - 5 Tavewa Ave. (mail: P.O. Box 125). Tel. +679 666-4112 E-mail: regprakash@axcite.com

Port Moresby, Papua New Guinea - Section 23, Lot 46, Gordonia St, Hohola Mail: P.O. Box 571, POM NCD). Tel. +675 259213

Rakiraki, Fiji - Rewasa (mail: P.O. Box 204), Tel. +679 694243 E-mail: fiji@pamho.net

Suva, Fiji - Joyce Place, Off Pilling Rd, Nasinu 71Z2 miles (mail: P.O. Box 2183, Govt. Bldgs.), Tel. +679 393 599 E-mail: vdas@govnet.gov.fj

Wellington, NZ - 105 Newlands Rd, Newlands (mail: P.O. Box 2753) Tel. +64 (04) 478-1414

RURAL COMMUNITIES

Bambra (New Nandagram) - Oak Hill, Dean's Marsh Rd. VIC 3241 Tel. +61 (052) 887383 Fax: +61 (052) 887309

Millfield, NSW-New Gokula Farm, Lewis Lane (off Mt. View Rd, Millfield, near Cessnock (mail: P.O. Box 399, Cessnock]), NSW 2325 Tel. +61 (049) 981800 Fax: (Sydney temple) Email: iskconfarm@mac.com

Murwillumbah (New Govardhana) - Tyalgum Rd, Eungella, via Murwillurnbah (mail: P.O. Box 687), NSW 2484, Tel. & fax: +61 (02) 6672-6579

Eastern Region - Hare Krishna Farm Community, P.O. Box 15, Old Akrade

NIGERIA

Abeokuta - Ibadan Rd, Obanatoka (mail: P.O. Box 5177)

Benin City - 108 Lagos Rd, Uselu, Tel. +234 (052) 247900

Enugu - 56, Destiny Layout, Old Abakaliki Rd, Near Enugu Airport Emene (by Efemeluna Bus stop)

Ibadan - 700 meters from Iwo Rd, Ibadan-Lagos Express Way (mail: UIPO Box 9996), E-mail: gboyega@ibadan.skannet.com

Jos - Airforce Base, Abattoir Rd, by Nammua, Ginrng Village (mail: P.O.Box 6557)

Kaduna - Federal Housing Estate, Abuja Rd. (mail: P.O. Box 1121). Goningora Village

Lagos - 12, Gani Williams Close, off Osolo Way, Ajaoo Estate 78 Bus stop, International Airport Rd., (mail: P.O. Box 8793, Marina) Tel.+234 01 7744926, E-mail: bddswami@pamho.net

AFRICA GHANA

Accra - Samsam Rd, Off Accra-Nsawam Hwy, Medie, Accra North, (mail: P.O. Box 11686)

Kumasi-Twumduasi, near Boadi-Emina, off Kumasi-Accra Road, 3km from Aninwaa Hospital, Emina, Kumasi, Tel +233208320816/gaurangainkumasi@gmail.com

Nkawkaw - P.O. Box 69

Sunyani - South Ridge Estates, P.O.Box 685

Takoradi - New Amanful, P.O. Box 328

Tarkwa - State Housing Estate, Cyanide

Port Harcourt

Umuebule - 11, 2nd tarred road (mail: P.O. Box 4429). Trans Amadi Warri

Okwodiete Village - Kilo 8, EffurunOrerokpe Rd. (mail: P.O. Box 1922)

SOUTH AFRICA

Cape Town - 17 St. Andrews Rd, Rondebosch 7700, Tel. +27 (021) 689-1529 Fax: +27 (021) 686-8233, E-mail: cape.town@pamho.net

Durban, South Africa - 50 Bhaktivedanta Swami Circle (mail: P.O. Box 56003), Chatsworth, 4030, Tel. +27 (031) 403-3328 Fax: +27 (031) 403-4429, E-mail: iskcon.durban@pamho.net

Johannesburg - 7971 Capricorn Avenue, (entrance on Nirvana Drive East) Ext 9, Lenasia, (mail: P. O. Box 926, Lanasia 1820) Tel. +27 (011) 854-1975, E-mail: iskconjh@iafrica.com, iskconjh@iafrica.com

Port Elizabeth - 15 Whitehall Court, Western Road 6000, Tel. & fax +27 (041) 534330

Pretoria - 1189 Church St, Hatfield 0083 (mail: P.O. Box 14077, Hatfield 0028)

Tel. & fax: +27 (12) 342-6216, E-mail: iskconpt@global.co.za[৩১]

সমগ্র বিশ্বে ইসকনের কার্যক্রমসমূহ: পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে ইসকনের শাখা-প্রশাখা রয়েছে। প্রতিটি দেশের নগর গ্রামে চৈতন্যদেবের আদর্শ প্রচার করার জন্য ইসকনের বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে সময়োপযোগী বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে নগর সংকীর্তন, পদযাত্রা, প্যান্ডেল প্রোগ্রাম, গ্রন্থ প্রচার, পার্কে কীর্তন, রথযাত্রা উৎসব, জন্মাষ্টমী উৎসব, গৌরপূর্ণিমা, গুরুকুল স্থাপন, ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, মন্দির নির্মাণ, গোশালা প্রতিষ্ঠা, গীতা জয়ন্তী পালন, সেমিনারের আয়োজন, Food for life, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা, প্রসাদ বিতরণ, নামহট্ট কার্যক্রম, কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা, অতিথি শালা নির্মাণ, ভাগবত জয়ন্তী পালন, Iskcon Leader Ship তৈরি, Iskcon Youth Forum প্রভৃতি প্রোগ্রাম রয়েছে। প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্ট অন্য ডিপার্টমেন্টের সাথে সমন্বয় করে শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ প্রচারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে আজ সমগ্রবিশ্বে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে চৈতন্যদেবের আদর্শ সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ইসকনের অবদান অসামান্য।

ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউট:

শ্রীল প্রভুপাদ মুম্বাইতে বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষ্ণভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের নিকট ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী বৈদিক শিক্ষা যথাযথভাবে উপস্থাপন

করা। এর মাধ্যমে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠবে। কেননা রাষ্ট্রের মেধাবী, বৈজ্ঞানিক ও উচ্চ শিক্ষিতরা যদি বৈদিক জ্ঞান লাভ করতে পারে, তবে তারা দ্রুত সমাজ ও জাতির প্রকৃত মঙ্গল সাধন করতে পারবে। এই কারণে প্রভুপাদ ইসকন থেকে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউট-এ প্রদান করতে বলেছেন। প্রভুপাদ এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করেন শ্রীমৎ স্বরূপ দামোদর স্বামীকে (PhD) এবং তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য ইতালিয়ান ভক্ত মাধব দাসকে (PhD) নিযুক্ত করেন।[৩২] প্রভুপাদ এই ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউট- এর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষ্ণভাবনা প্রচার করার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে ১০ হাজার US ডলার বরাদ্দ করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট এই অর্থ সরবরাহ করে।[৩৩] শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে ও গভীর উৎসাহে শ্রীমৎ স্বরূপ দামোদর স্বামী ১৯৯৬ সালে কলকাতায় মানব ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলন করেন।[৩৪]

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট:

শ্রীল প্রভুপাদ ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য প্রথম ১৯৭২ সালে ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠান করেন। এই ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট শ্রীমায়াপুর নদীয়াতে আছে। এছাড়া কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং-এ আছে। এই ট্রাস্ট- এর কাজ হচ্ছে প্রভুপাদ রচিত এবং জি.বি.সি অনুমোদিত গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা।[৩৫] এই ট্রাস্ট বাংলা, ইংরেজি, হিন্দী, উড়িয়া, তেলেগু, আরবি, চীনা, ডেনিশ, ডাচ, ফারসি, ফিনিশ, ফরাসি, জার্মান, হিব্রু, হাঙ্গেরীয়ান, বর্মী, ইতালিয়ান, জাপানি, কোরিয়ান, পর্তুগীজ, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, সুইডিশ, থাই, উর্দু, ভিয়েতনামি এবং অন্যান্য ভাষায় গ্রন্থ অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে।[৩৬] ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট থেকে বাংলা ভাষায় যেসকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা হলো–

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ, শ্রীমদ্ভাগবত (১-১২ স্কন্ধ, ১৮ খণ্ড), শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ খণ্ড), গীতার রহস্য, গীতার গান, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান, হরেকৃষ্ণ চ্যালেঞ্জ, উপদেশামৃত, ভালোবাসার শিক্ষা, কুন্তিদেবীর শিক্ষা, দেবহুতি নন্দন কপিলশিক্ষামৃত, শ্রীঈশোপনিষদ, বুদ্ধিযোগ, কৃষ্ণভাবনার অমৃত, আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর, বৈদিক সাম্যবাদ, আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা, অমৃতের সন্ধানে, জীবন আসে জীবন থেকে, কৃষ্ণ বড় দয়াময়, ভগবানের কথা, পরম পিতা, ঈশ্বরের সন্ধানে, শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে, পরলোকে সুগম যাত্রা, কৃষ্ণভক্তি প্রচারই প্রকৃত পরোপকার, পঞ্চরাত্র প্রদীপ, ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন, পুনরাগমন, প্রভুপাদ, জীবন জিজ্ঞাসা, বৈষ্ণব শ্লোকাবলী, যেমন কর্ম তেমন ফল, বৈষ্ণব কে? সদাচার ও সাধনা, শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদের পরম শান্তি, ভক্তিবেদান্ত স্তোত্রাবলী, পরম সুস্বাদু কৃষ্ণ প্রসাদ, পাশ্চাত্য দেশে কৃষ্ণনামের প্রচার, শ্রীমায়াপুর দর্শন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মাহাত্ম্য, যুগধর্ম, গৃহে বসে কৃষ্ণভজন, মায়াপুরে শ্রীশ্রীরাধামাধব, মহাজন উপদেশ, শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব মহিমা, ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব, ধ্রুব চরিত, প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন, দিব্য প্রেমের রহস্য, জগতে আমরা কোথায়? শ্রীজগন্নাথপ্রিয় নাটক, শ্রীল প্রভুপাদ স্মরণামৃত, কীর্তন

করুন এবং সুখী হোন, *নিত্য আনন্দের পথ নির্দেশ*, *অমল পুরাণ*, *পঞ্চতত্ত্বরূপে ভগবান শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু*, *যোগসিদ্ধি*, *শ্রীএকাদশী মাহাত্ম্য*, *ভক্তবৎসল ভগবান*, *শ্রীবৃন্দাবন দর্শন*।[৩৭]

ইসকনের গ্রন্থ প্রচার:

শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন– 'বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা' ।এই আদর্শকে কেন্দ্র করে শ্রীল প্রভুপাদ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবার মাঝে কৃষ্ণ ভাবনা জাগ্রত করার জন্য গ্রন্থ প্রচার করেছেন এবং ইসকন সদস্যদেরকে গ্রন্থ প্রচার করার জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন। কেননা বৈদিক জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমেই পৃথিবীর সকল মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে বলে তিনি মনে করেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ উন্মাদের মত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সর্বদা ব্যস্ত। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়ে অজ্ঞানতাবশত তারা পশুর মত জীবন যাপন করে অন্ধকারে পতিত হয়েছে। এই পাশবিক সভ্যতার কবল থেকে মানবসমাজকে মুক্ত করতে হলে মানবের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হবে। আর এই কর্ম পন্থাটি হচ্ছে ইসকনের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। আর এটি সম্ভব হরিনাম বিতরণ ও গ্রন্থ প্রচারের দ্বারা। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি সকল সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।[৩৮]

শ্রীল প্রভুপাদ চৈতন্যদেবের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। চৈতন্যদেবের দর্শন ও শিক্ষা প্রচারের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি গ্রন্থ প্রচারকে। মন্দির ও গ্রন্থ প্রচারের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন– ভগবানের বাণী প্রচারের জন্য মন্দির তৈরী করা প্রয়োজন। গোস্বামীরা কেবল গ্রন্থ রচনা করেননি, তাঁরা মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেননা ভগবানের প্রচারের জন্য দুই-ই প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন তাঁর সংকীর্তন আন্দোলন যেন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রসারিত হয়। এখন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। তাই এই সংস্থার সদস্যদের কর্তব্য হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে কেবল ভগবানের মন্দির প্রতিষ্ঠাই নয়, ভগবৎ তত্ত্ব সমন্বিত যে সমস্ত গ্রন্থ লেখা হয়েছে সেগুলো বিতরণ করা। গ্রন্থ বিতরণ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা দুটিরই গুরুত্ব রয়েছে এবং এই দুটি যেন সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারে ইসকনের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থ । তাই চৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রচারে ইসকনের ভূমিকা সর্বশ্রেষ্ঠ।[৩৯]

ইসকনের মহাকেন্দ্র:

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসকনের মন্দির, আশ্রম, গুরুকুল, বিদ্যালয়, অতিথিশালা সহ বিভিন্ন কার্যক্রমের শাখা-প্রশাখা রয়েছে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্য জন্মভূমি ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীমায়াপুর ধামেই প্রতিষ্ঠিত হবে ইসকনের প্রধান কেন্দ্র এবং সুবিশাল তারামণ্ডল মন্দির। কেননা

চৈতন্যদেবের লীলাভূমিতে বিশ্বের মানুষেরা এসে তাঁর দর্শন ও শিক্ষা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। সেই স্বপ্ন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ৯ বিঘা জমি শেখ নামক দুজন মুসলমান চাষীর নিকট থেকে কোলকাতার এডভোকেটের দ্বারা মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে ক্রয় করেন। এর পরে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে মায়াপুরে ইসকনের প্রধান মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইসকনের সমগ্র বিশ্বের জি.বি.সি-দের নির্দেশ দিয়েছেন উৎসবে যোগদান করার জন্য।

প্রভুপাদের ঘোষণা অনুযায়ী এখানে গেস্ট হাউজ থাকবে। ভক্তদের থাকার মত একটি আবাসিক ভবন থাকবে। কয়েক হাজার ভক্ত একসাথে মহাপ্রসাদ সেবন করতে পারে এরকম একটি সুবিশাল প্রসাদ কক্ষ, রান্নাঘর এবং গোশালা থাকবে। সেখানে পুষ্পউদ্যান, ফোয়ারা, লতাবিতান সহ আধুনিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পার্ক থাকবে। সেজন্য পার্শ্ববর্তী জমিগুলো ক্রয় করতে হবে। ফলে মন্দির হবে ৩০০ ফুটেরও বেশি উঁচু। এটি নির্মাণে প্রচুর টাকার প্রয়োজন হবে এবং এই মন্দিরের নাম হবে চন্দ্রোদয় মন্দির। মূল মন্দিরের মাঝে গম্বুজ থাকবে। সেখানে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিকৃতি থাকবে। তা হবে বৈদিক বর্ণনা ভিত্তিক এবং তা এই জড় জগৎকেই শুধু দেখাবে না, সেখানে চিৎ জগৎকেও দেখা যাবে।

মূল কক্ষে প্রবেশ করে দর্শনার্থীরা দেখতে থাকবে ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান। প্রথমে থাকবে পাতাললোক, এরপরে পৃথিবী, উচ্চতর গ্রহলোক, ব্রহ্মলোক, শিবধাম, চিদাকাশ বা বৈকুণ্ঠলোক এবং সর্বোপরি কৃষ্ণলোক, যেখানে ভগবান লীলাবিলাস করেন। মন্দিরের প্রাসাদে থাকবে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিগ্রহ। প্রাসাদটি সজ্জিত হবে সোনা, রূপা ও মহামূল্যবান মণিমাণিক্য দিয়ে। এই মন্দির হবে World Headquarter. মায়াপুরে The Temple of Human Understanding প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকলেই প্রকৃত সত্যের সন্ধানে পরিচালিত হবে। তখন এই মন্দিরের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ হয়ে দর্শকরা মনে করবে এটি চিৎ জগৎ। আধ্যাত্মিক চেতনায় সবাই 'হরেকৃষ্ণ' দিব্য নাম কীর্তন করবে, শ্রীচৈন্যদেবের শিক্ষা উপলব্ধি করবে এবং এক অনির্বচনীয় দিব্য আনন্দে অভিভূত হয়ে নৃত্য করবে।[৪০]

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গৌরপূর্ণিমায় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যগণ ও তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের এবং বহু দর্শনার্থীদের সম্মুখে মায়াপুর মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। প্রভুপাদ এই মন্দির নির্মাণের জন্য অনুরোধ করে বলেছেন–

"মায়াপুরে আমরা এক বিরাট পরিকল্পনা নিয়েছি এবং তোমরা যদি মিলিতভাবে সেই পরিকল্পনার রূপদান করতে পার, তাহলে তা হবে বিশ্বের বিস্ময়! এটি হবে পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা দানের সারাবিশ্বের মুখ্য কেন্দ্র। সারা পৃথিবীর শিক্ষার্থীরা এখানে আসবে এবং আমরা মূর্খ দার্শনিকদের নাস্তিক্যবাদ এবং সাম্যবাদ সংশোধনের যথার্থ পরমার্থবাদ প্রতিষ্ঠা করব। এই মহৎ কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। এক

মুহূর্তের জন্যও যেন আমরা ইসকনের চিন্তা সম্বন্ধে বিস্মৃত না হই। এটি হচ্ছে তোমাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ।"[৪১]

শ্রীল প্রভুপাদ এই মন্দির সম্পর্কে বলেছিলেন– এটির সুউচ্চ গুম্বুজ গগন স্পর্শ করবে এবং একে ঘিরে গড়ে উঠবে এক বৈদিক নগরী। এই মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে থাকবে সব চেয়ে বড় প্লানেটোরিয়াম, যাতে বৈদিক বর্ণনা অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করা হবে। তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন এই মায়াপুর ৫০,০০০/- ভক্ত পূর্ণ এক নগরীতে পরিণত হবে এবং তা সারা পৃথিবীর আধ্যাত্মিক রাজধানীতে পরিণত হবে। মন্দিরকে কেন্দ্র করে সর্বশ্রেণির মানুষ বসবাস করবে। এটি হবে সবার আদর্শ। মায়াপুরের উন্নয়নের মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বে কৃষ্ণভাবনা প্রচারের সূচনা হবে। ফলে চৈতন্যদেবের ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হবে।[৪২]

১৯৭৫ সালের ২৩শে মার্চ শ্রীল প্রভুপাদ মায়াপুরে ইসকনের বাৎসরিক জি.বি.সি মিটিং করে বলেছেন– প্রতিবছর গৌরপূর্ণিমায় মায়াপুরে পৃথিবীর সব মন্দিরের ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করবে। সংঘবদ্ধভাবে সকল ভক্তদের মহামিলন কেন্দ্র হবে মায়াপুর। তাঁর নির্দেশ অনুসারে আজও সারাবিশ্বের ভক্তরা গৌরপূর্ণিমায় মায়াপুরের দোল উৎসবে সামিল হয়। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। নবদ্বীপ পরিক্রমা হয়। সমগ্রবিশ্বের লক্ষ লক্ষ ভক্ত মায়াপুরে মিলিত হয়ে ভক্ত সমুদ্রে পরিণত হয়। এইভাবে প্রভুপাদের দূরদর্শীতামূলক সিদ্ধান্তের ফলে চৈতন্যদেবের শিক্ষা আজ সারা পৃথিবীর মানুষ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে প্রভুপাদ ও ইসকনের অবস্থান বর্ণনাতীত।[৪৩]

মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

চন্দ্রোদয় মন্দিরের বিগ্রহ :

শ্রীধাম মায়াপুরের অন্যতম আকর্ষণীয় ও মাধুর্যময় বিষয় হচ্ছে অষ্টসখীসহ রাধামাধবের বিগ্রহ। ভোর ৪:৩০ মিনিটে মঙ্গলারতি হয়। অপূর্ব নান্দনিক ও শিল্পনৈপুণ্যের সমাহার বিগ্রহের অপ্রাকৃতিক সৌন্দর্যে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও ভারতীয় বৈষ্ণবদের সম্মিলনে শ্রুতিনন্দন কীর্তন সবাইকে চিৎ জগতের আনন্দ দান করে। এর পাশেই আছে সুউচ্চ পঞ্চতত্ত্বের বিগ্রহ। মনে হয় চৈতন্যদেব দুই বাহু তুলে কীর্তনে আহ্বান করছেন। এর সাথে রয়েছে বিঘ্নবিনাশকারী ভক্ত রক্ষক শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের বিগ্রহ। মনে হয় সাক্ষাৎ নৃসিংহদেব অভয় দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। এই অনুভূতি বর্ণনার অতীত। মন্দিরের পাশে একটি ছোট অডিটোরিয়াম আছে, যেখানে দর্শকদের জন্য চৈতন্যদেবের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলার উপর প্রদর্শনী করা হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের পুষ্পসমাধি মন্দির:

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মূল্যবান পাথর দিয়ে ১৮০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট সুনিপুণ কারুকার্যে নির্মিত শ্রীল প্রভুপাদের এই মন্দির। এখানে শ্রীল প্রভুপাদের স্বর্ণোজ্জ্বল বিগ্রহ রয়েছে। মন্দিরের ভক্তরা নিয়মিত পূজা অর্চনা করে থাকে। দর্শকদের জন্য মন্দিরের মধ্যে প্রভুপাদের পাশ্চাত্যে হরিনাম প্রচারের উপর বিভিন্ন দৃশ্য প্রদর্শন করা

হয়। মন্দিরের নীচে অডিটোরিয়াম রয়েছে। সেখানে জি.বি.সি- দের মিটিং এবং বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে সেমিনার, নাটক, নৃত্য প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

ভজন কুটির:

এই ভজন কুটিরে প্রভুপাদ বাস করতেন। প্রথমে ২.৫০ কাঠা জায়গা ক্রয় করে প্রভুপাদ কার্যক্রম শুরু করেন। সেখানে ৪০ বছর ধরে অখণ্ড হরিনাম কীর্তন চলছে। খরের ছাউনি ঘরে প্রভুপাদের বিগ্রহ রয়েছে। দর্শনে সত্যিই চৈতন্যযুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রভুপাদ কক্ষ:

লোটাস বিল্ডিং- এর ২য় তলায় শ্রীল প্রভুপাদের বিশ্রামাগার রয়েছে। এখানে তাঁর সেবিত গৌরচন্দ্রের অপূর্ব বিগ্রহ রয়েছে। তাঁর রচিত ও বহু ভাষার অনূদিত গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়া তাঁর জিনিসপত্র রয়েছে।

গুরুকুল:

মায়াপুরে একটি গুরুকুল স্কুল রয়েছে। প্রভুপাদ ১৯৭২ সালে এখানে গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি বৈদিক শিক্ষা, পূজা-অর্চনা, যাগ-যজ্ঞ, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ শিক্ষাসহ রান্না প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া দুটি ইংলিশ ও বাংলা মিডিয়াম স্কুল আছে।

হাতিশালা: মায়াপুরে লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া নামে দুটো হাতি রয়েছে। দর্শনার্থীরা তাদেরকে দর্শন করে প্রভূত আনন্দ লাভ করে। রাসপূর্ণিমা থেকে গৌরপূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতি শনিবার রাজাধিরাজ শ্রীশ্রীরাধামাধবকে এই হাতির পৃষ্ঠে স্থাপন করে মশাল ও প্রদীপ জ্বালিয়ে মহাড়ম্বরে কীর্তন সহযোগে পরিক্রমা করা হয়ে থাকে, যা ঠিক উৎসবের শোভাযাত্রার মতো।

গোশালা:

মায়াপুরে বৃহৎ গোশালা রয়েছে। সেখানে উন্নত জাতের প্রায় ২০০ গাভী রয়েছে। এই গোশালায় গাভীদের কৃষ্ণভক্তরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকে। এই গাভীর দুধ দিয়ে রাধামাধবের ভোগ নিবেদন করা হয়ে থাকে। এখানের গোময় ও গোমূত্র থেকে বহু ধরনের ঔষধ তৈরী করা হয়ে থাকে।[৪৪]

গীতা দান সেবা:

মায়াপুরে গীতাদান সেবা নামে একটি কার্যক্রম আছে। কেউ ভগবানের সন্তুষ্টি ও আশীর্বাদ লাভের জন্য একটি গীতা একজন ছাত্রকে বা দরিদ্র কোন ব্যক্তিকে দান করতে পারবে। এখানে বিভিন্ন ভাষায় *ভগবদ্গীতা* রয়েছে।

নিরাপদ পানীয় পান:

মায়াপুর আর্সেনিকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা। তাই সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি এখানে নিরাপদ পানীয় সরবরাহ করে থাকে। গৌরপূর্ণিমার উৎসবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু ভক্তের সমাগম হয়ে থাকে। তখন পানীয় জলের অভাবে ইসকন নিরাপদ পানীয়ের ব্যবস্থা করে থাকে।

Medical Aid:

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব দিবস গৌরপূর্ণিমাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসে। তাঁদের সুচিকিৎসার জন্য মেডিকেল সেবা দেওয়া হয়ে থাকে। এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঔষধ সরবরাহ করা হয় এবং সার্বক্ষণিক ডাক্তার থাকে। যেকোন অসুস্থতার কারণে Homeopathy ও Alopathy Treatment প্রদান করা হয়ে থাকে।

Food Relief / Food for life:

(ক) অন্নদান সেবা:

মায়াপুরে যেকোন উৎসবে বা যেকোন দিন প্রসাদ বিতরণ হয়ে থাকে। তীর্থ যাত্রীদের জন্য উৎসবের সময় ১০ টাকায় পূর্ণ এক প্লেট প্রসাদ পাওয়া যাবে। উৎসবের সময় ৫০ টাকায় বিশেষ প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

নিয়মিত ২৫ টাকায় বিভিন্ন মেনুতে প্রসাদ পাওয়া যাবে। মায়াপুর কমিউনিটি ভক্তদের জন্য বিভিন্ন দামের Feast Prasadam আছে।

(খ) Daily Free Meals :

তীর্থযাত্রী ও দর্শনার্থী ভক্তদের জন্য প্রতিদিন প্রসাদের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া ২৫ টাকার কুপন নিলে তিনি বিভিন্ন ব্যঞ্জনে তৈরী প্রসাদ পেতে পারবেন।

(গ) **তীর্থযাত্রীদের প্রসাদ সেবা:**

এখানে বৈদিক নিয়মে সকল তীর্থযাত্রীরা একাদশী পালন করে। যারা একাদশী পালন করে তাদের জন্য একাদশীর প্রসাদের ব্যবস্থা আছে। গদাভবনে প্রতিদিন ২০০০০ তীর্থ যাত্রী প্রসাদ সেবা করে থাকে।

(ঘ) **জরুরী বন্যা রিলিফ:**

গঙ্গার পানিতে প্রায় প্রতিবৎসরই এখানে বন্যা হয়ে থাকে। তবে ১৯৭৮ সাল থেকে এপর্যন্ত ৪-৫ বার বড় বন্যা হয়েছে। বন্যার্তদের মানবিক সেবা দেওয়ার জন্য ইসকনের খাদ্য সাহায্য কেন্দ্র পূর্ব থেকেই বিভিন্ন প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। তবে বন্যা হলে বন্যার্তদের মধ্যে খিচুরি ও শুকনা প্রসাদ বিতরণ করা হয়ে থাকে। বস্ত্র প্রদান করা হয়। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। স্বেচ্ছাসেবক ডাক্তার থাকে এবং ঔষধ সরবরাহ করা হয়। বাচ্চাদের খাবার এবং milk powder প্রদান করা হয়। গাভীদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়া বাচ্চাদের নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য পরিবহন ব্যবস্থা থাকে। প্রায় ৩০০ স্বেচ্ছাসেবক ভক্ত সর্বদা প্রস্তুত থাকে বন্যার্তদের সর্বপ্রকার সেবাদানের জন্য। প্রতিদিন তারা সকালে ও রাতে খাবার পরিবেশন করে বন্যাকবলিত গ্রামগুলোতে। প্রতিদিন ৩০০০ প্লেট রান্না করা খাবার এবং ১০,০০০ প্লেট শুকনা খাবার এই সদস্যরা বিতরণ করে থাকে।

After the Flood:

বন্যার্তদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাদের ঘর মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। গ্রামের মহিলা ও শিশুদের প্রয়োজন মত খাদ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া এই ডিপার্টমেন্ট বন্যার্তদের পুনর্বাসনের জন্য সাধ্যমত সাহায্য করে থাকে। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবতার সেবাই ধর্ম এই বিশ্বাসে এই ডিপার্টমেন্ট সেবা করে থাকে, যা চৈতন্যদেবের আদর্শের অনন্য নিদর্শন।

দরিদ্র ধামবাসী এবং বৈষ্ণব ছাত্রদের জন্য সাহায্য:

মায়াপুরে অনেক দরিদ্র ধামবাসীদের এবং অনেক দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিশুরা রয়েছে, যারা অর্থনৈতিক দুর্দশায় কবলিত হওয়ার কারণে তাদের মেধার বিকাশ ঘটাবার সুযোগ পায় না। মায়াপুর ইসকনের এই বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রমে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে তাদের শিক্ষিত এবং আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দর্শনার্থীদের নিকট থেকে ডোনেশন নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

Mayapur Institute (MI):

মায়াপুরে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* উপর শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে, যার নাম হচ্ছে মায়াপুর ইনস্টিটিউট। এখানে প্রভুপাদের মিশনকে আরো গতিশীল করার জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থ থেকে পদ্ধতিগতভাবে শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা এই প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এখানে ভক্তিশাস্ত্রী এবং ভক্তিবৈভব কোর্স সম্পন্ন করার শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। মূলত এখানে বৈদিক দর্শন, সংস্কৃতি ও মর্যাদা বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়ে থাকে। এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পাশাপাশি সন্ন্যাসীরাও পারমার্থিক শিক্ষক হিসেবে শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। কোন প্রকার খরচ ছাড়া বিনামূল্যে এই কোর্স সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এখানে মধ্যাহ্নে প্রসাদের ব্যবস্থা থাকে। এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ইসকন ধনাঢ্যদের নিকট থেকে ডোনেশন গ্রহণ করে থাকে।

Honor memorial Contribution:

মায়াপুরে এই বিভাগে কেউ জন্মদিন, বিবাহ উৎসব, বিশেষ বৈষ্ণব সেবা বা কারো উদ্দেশে কোন অনুষ্ঠান করতে পারবেন। সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিবেশে ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যে এই ধরনের অনুষ্ঠান অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কিছু Donation- এর বিনিময়ে যে কেউ এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

Bhaktivedanta Academy for Culture and Education (BACE):

এখানে যুবকদের কর্মদক্ষতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। কলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, লিডারশীপ প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে গুরু সেবাসহ বহু বিভাগ রয়েছে। এসব বিভাগ মানবকল্যাণে কাজ করে থাকে।[৪৫]

Temple of the Vedic Planetorium:

শ্রীল প্রভুপাদের সংকল্প ও সিদ্ধান্ত অনুসারে ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে বৈদিক তারামণ্ডল মন্দিরের নির্মাণ কাজ চলছে। সমগ্রবিশ্বে ইসকনের সব চেয়ে বড় প্রোজেক্ট এটি। এই বৃহৎ মন্দির নির্মাণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ডোনেশন সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই মন্দিরের Construction এর কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার কারুকার্যের কাজ চলছে।[৪৬] এর মধ্যে মন্দিরের প্রধান গম্বুজের উপরে বিশাল সুদর্শন চক্র ইসকনের গুরুবর্গের অন্যতম আচার্য শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ বৈদিক নিয়মে স্থাপন করেছেন। তিনি এই আধ্যাত্মিক মহাপ্রকল্প নির্মাণের অন্যতম সদস্য। এই মন্দিরের আর্থিক বিভাগ পরিচালনার দায়িত্বে আমেরিকার বংশোদ্ভূত শ্রীপাদ অম্বরীশ দাস এবং এই বিশাল মন্দিরের নকশা তৈরিতে শ্রীপাদ অভিরাম দাস রয়েছেন।[৪৭] পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল মন্দির হবে এটি। এর দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য হৃদয় স্পর্শ করে। বিশ্বের স্থাপত্য শিল্পের অনন্য নিদর্শন হবে এই বৈদিক তারাামণ্ডল মন্দিরটি। মন্দির কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ২০২৪ সালে মন্দিরটির উদ্বোধন হবে। অনেক দূর থেকে মন্দিরের চূড়া দর্শন করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মন্দির নির্মাণে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে। মায়াপুরের এই মন্দির ইসকনের প্রধান কেন্দ্র হওয়ার কারণে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে। শ্রীল প্রভুপাদ এই মন্দির সম্পর্কে বলেছেন- My idea is to attract people of the whole world to Mayapur.[৪৮]

উল্লিখিত বিভাগসমূহ ছাড়া মায়াপুর ইসকনের আরো বহু বিভাগ রয়েছে। যথা–

ভূমি বিভাগ :

মায়াপুর ইসকনের প্রায় ২০০০ একরের বেশি জমি রয়েছে। মন্দিরের পাশাপাশি বিভিন্ন ভবন নির্মাণ ছাড়াও কৃষিশস্য উৎপাদন করার জন্য ভূমির সঠিক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইসকনের এই সম্পত্তি দেখভাল করার জন্য এই বিভাগ গঠন করা হয়েছে । বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ৬০০টির অধিক ইসকনের মন্দিরগুলোতে বৈদিক সংস্কৃতি অনুযায়ী কৃষিকার্য রয়েছে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে।[৪৯]

গঙ্গা ঘাট নির্মাণ ও গঙ্গাপূজা মন্দির:

ইসকন গঙ্গার পবিত্রতা রক্ষার জন্য এবং সকল তীর্থযাত্রীদের গঙ্গা স্নানের জন্য বিশাল গঙ্গাঘাট নির্মাণ করেছে এবং গঙ্গার পবিত্রতা রক্ষার জন্য অনেক বিধি প্রণয়ন করেছে। এছাড়া গঙ্গাদেবীর পূজার জন্য মায়াপুর গঙ্গাঘাটে শ্রীশ্রী গৌর গঙ্গা জগৎপাবনী মন্দির নির্মাণ করেছে।

ভক্তিবেদান্ত আরোগ্য নিকেতন:

ইসকনের এই প্রতিষ্ঠানে তীর্থযাত্রীসহ সকল ভক্তদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। এটি হচ্ছে দাতব্য চিকিৎসালয়। এখানে ইসকন দ্বারা পরিচালিত বৃদ্ধা আশ্রম আছে।[৫০]

ভক্তিবেদান্ত ন্যাশনাল স্কুল:

এই স্কুলটি ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ দান করা হয়ে থাকে। মায়াপুরের স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীরা এই স্কুলে পড়াশুনার সুযোগ গ্রহণ করে ভবিষ্যতে মেধার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে।

গৌরাঙ্গ কুটির এবং নিত্যানন্দ কুটির:

এখানে তীর্থযাত্রীরা সুলভ মূল্যে রাত যাপন করতে পারে।

ব্রহ্মচারী ভবন:

ব্রহ্মচারীদের থাকার জন্য আলাদা ভবন রয়েছে । সিনিয়র ব্রহ্মচারীদের থাকার জন্য পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে।

সন্ন্যাসী ভবন:

সন্ন্যাসীদের থাকার জন্য আলাদা ভবন রয়েছে।

গেস্ট হাউজ:

বিভিন্ন অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে ।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট:

এখান থেকে শ্রীল প্রভুপাদ এবং জি.বি.সি-'র অনুমোদিত গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

ব্রহ্মচারী প্রসাদ হল:

বিভিন্ন ধরনের নিরামিষ রেস্টুরেন্ট রয়েছে। গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। বিশাল প্রসাদ হল রয়েছে। কয়েক হাজার তীর্থযাত্রী একবারে প্রসাদ পেতে পারে। শৌচাগার রয়েছে, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্রাম স্থল রয়েছে, শিশুদের জন্য পার্ক রয়েছে। সুন্দর পুষ্প উদ্যান রয়েছে। বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থ বিক্রির স্টল রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করার জন্য বহুবিধ স্টল রয়েছে। ট্যুর ট্রাভলস রয়েছে- যা ট্রেন, বিমান, বাসে চলার জন্য টিকিট ক্রয়ের সুব্যবস্থা করে। এছাড়া মাইক্রোবাস এর ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যাংক, লন্ড্রি সহ প্রভৃতি সেবা দানের জন্য আরো বহু সেবা বিভাগ রয়েছে। মন্দিরের নিজস্ব বেতনে নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী রয়েছে।

মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব তিথিতে অর্থাৎ গৌরপূর্ণিমার সময় ৯দিন নবদ্বীপ পরিক্রমা উৎসব করা হয়ে থাকে। মায়াপুর মন্দিরের এটি সবচেয়ে বড় উৎসব। কয়েক লক্ষ তীর্থযাত্রী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মায়াপুরে আসে। তাদের থাকার ও প্রসাদের সুব্যবস্থা এবং চিকিৎসার জন্য মেডিকেল টিমসহ স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়ে থাকে।

৯দিনে নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হয়ে থাকে। প্রতিটি দ্বীপের ধাম মাহাত্ম্য সহ হরিনামকীর্তন ও ভাগবত আলোচনার মাধ্যমে তীর্থযাত্রীদের আনন্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। লক্ষ লক্ষ তীর্থ যাত্রীদের এই দোল উৎসব

এর জন্য মায়াপুর ইসকন ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পূর্ণ আয়োজন করে থাকে। এছাড়া বিশ্বের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে এই মন্দিরের ব্যবস্থাপনা কমিটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সারাবছর মন্দির পরিচালনা করে থাকে। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে পারমার্থিক চেতনায় চন্দ্রোদয় মন্দিরের ব্যবস্থাপনা সত্যই প্রশংসনীয়। এখানেই চৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রসারে প্রভুপাদের (ইসকন) অসামান্য সাফল্য।[৫১]

লুপ্ততীর্থ উদ্ধার:

ইসকন- এর কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করে তার সংস্কার করা এবং যুগোপযোগী নবমন্দির নির্মাণ করা, যাতে আধুনিক পরিবেশে শিক্ষিত প্রগতিশীল সমাজ দর্শন ও শিক্ষা উপলব্ধি করতে পারে। ভারতবর্ষ এবং তার বাইরে বিভিন্ন লুপ্ততীর্থস্থান উদ্ধার করে সেখানে মন্দির সংস্কার ও নতুন মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। নবদ্বীপের বেলপুকুর হচ্ছে চৈতন্যদেবের মামা বাড়ি, যা শচীদেবীর পিতৃভিটা। এখানে শচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তীর সেবিত বিগ্রহ মদন গোপাল প্রতিষ্ঠিত। ইসকনের অন্যতম আচার্য শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন এবং তাঁর শিষ্য এই মন্দিরে সেবাইত হিসেবে পূজা করেন।[৫২] মায়াপুর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে জগন্নাথপুর গ্রাম অবস্থিত। ২৫০/৩০০ বৎসর পূর্বে শরডাঙ্গা নামে পরিচিত ছিল। পূর্বে এখানে জগন্নাথদেব প্রকাশিত ছিলেন। কিন্তু এই তীর্থস্থানটি লুপ্ত হলে ১৯৭৯ সালে শ্রীযুক্ত ফটিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংস্কারের জন্য ইসকনকে দান করেন। বামনপুকুর ও সাতপুকুরের মধ্যবর্তী স্থান জগন্নাথ পুরে এই মন্দিরটি ইসকন অত্যাধুনিকভাবে সংস্কার করে নতুনভাবে মন্দির নির্মাণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৫৩]

একচক্রা:

বীরভূম জেলায় অবস্থিত একচক্রা ধাম। এখানে নিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখানে সবচেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী। এখানে ইসকন একটি মন্দির নির্মাণ করেছে এবং এখানে অতিথিশালা রয়েছে। নিত্যানন্দের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এবং তাঁর করুণা প্রচারের জন্য ইসকনের এই মহান উদ্যোগ।[৫৪]

হরিদাসপুর :

হরিদাসপুর হচ্ছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত এবং বনগাঁর নিকটবর্তী। নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাঠ এখানেই ছিল। কালচক্রে এটি জীর্ণ শীর্ণ দশা প্রাপ্ত হয়। ১৯৭৬ সালে ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বিদেশী ভক্তসহ এখানে উপস্থিত হয়ে এই মন্দিরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে এই মন্দিরের কলেবর ও শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতিথিশালা ও নাটমন্দির নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীকালে ২০০২ সালে ইসকনের অন্যতম আচার্য শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ বিভিন্ন বিগ্রহ স্থাপন করে আধুনিকীকরণ করে মন্দিরের সৌন্দর্য বর্ধিত করেন। স্থলপথে যাতায়াতে বাংলাদেশ ও ভারতের তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামস্থল হচ্ছে এই মন্দিরটি।[৫৫]

প্রেমবাগ:

গৌড়রাজ নবাব হুসেন সাহের দুই মন্ত্রী শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর যশোরের বাড়ি ছিল ফতেহাবাদ (প্রেমবাগ)। এই মহাত্মা গোস্বামীদ্বয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে ইসকন এখানে শ্রীরূপ-সনাতন স্মৃতিতীর্থ নামক সুবিশাল

মন্দির নির্মাণ করেন। চৈতন্যদেবের পার্ষদ রূপ-সনাতন চৈতন্যদেবের দর্শন ও শিক্ষা প্রচারের অবদানস্বরূপ ইসকনও সেই ধারাবাহিকতায় প্রচার কার্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।[৫৬]

মেখল:

মেখল হচ্ছে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর নিকটবর্তী গ্রাম। এখানেই মহাপণ্ডিত ও চৈতন্য পার্ষদ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জন্মগ্রহণ করেন। কালের বিবর্তনে এই স্থানের গৌরব হারিয়ে যায়। পরবর্তীকালে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি স্মৃতি সংসদ এই তীর্থের উন্নতি বিধান কল্পে ১৯৮২ সালে ইসকনের আচার্য শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের নিকট হস্তান্তর করেন। ইসকন দায়িত্ব নিয়ে এই মন্দিরের বিভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে অত্যন্ত সুন্দর একটি মন্দির নির্মাণ করেন, যা প্রাচীন কালের সেই তপোভূমির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর এই মন্দিরের সার্বিক পরিবেশটি।[৫৭]

লাউর:

সুনামগঞ্জে এই লাউর গ্রাম অবস্থিত। এটিকে পনাতীর্থ বলা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য এই ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এটি এখন গড়কাঠি নাম ধারণ করেছে। তাঁর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য ইসকন এখানে বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করে অদ্বৈত আচার্যের সেবা প্রচার করছে।[৫৮]

বিভিন্ন বিভাগ:

সমগ্র বিশ্বে ইসকনের ৬৫০টির বেশি ছোট-বড় কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্র ও মন্দিরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। যথা- প্রচার বিভাগ, সংকীর্তন বিভাগ, গ্রন্থ প্রকাশনা বিভাগ, পূজারী বিভাগ, ভূমি বিভাগ, অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, আন্তর্জাতিক ট্যুরিস্ট বিভাগ, ইউথ্ ফোরাম বিভাগ, মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা বিভাগ, গীতা স্টাডি বিভাগ, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ভক্তিবৃক্ষ বিভাগ, আজীবন সদস্য বিভাগ, নিত্যসেবা বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ, খাদ্য বিতরণ বিভাগ, মেডিকেল বিভাগ, রেস্টুরেন্ট বিভাগ, স্টল বিভাগ, প্রসাদ বিতরণ বিভাগ, নামহট্ট প্রচার বিভাগ, সঙ্গীত বিভাগ, কৃষি বিভাগ, গোশালা বিভাগ, গুরুকুল বিভাগ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, নতুন ভক্ত প্রশিক্ষণ বিভাগ, তীর্থ ভ্রমণ বিভাগ ইত্যাদি। ইসকন এগুলোর সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।[৫৯]

মানবতার সেবায় ইসকন:

ইসকনের সদস্যরা শুধু মন্দিরে বসে ভক্তদের নিয়ে কীর্তন করে না। তাঁরা মানবতার সেবার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যেমন– Food for life দরিদ্র, অসহায়, ক্ষুধার্ত, পীড়িত মানুষের জন্য খাবার বিতরণ করে, বন্যার্তদের খাবার, চিকিৎসা, বস্ত্র প্রদান করে। বিনামূল্যে ইসকন দরিদ্রদের জন্য প্রসাদ বিতরণ করে। দরিদ্রদের পড়াশুনার জন্য আর্থিক সাহায্য করে। অসহায় ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের আশ্রয় প্রদান করে।

মানবের কল্যাণমূলক উন্নয়নে ইসকন:

ইসকন মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করে। তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা শ্রবণ করে। শিক্ষার্থীরা পড়াশুনায় ভাল ফলাফল পেলে বৃত্তির ব্যবস্থা করে। তাদের শিক্ষার জন্য বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। বিভিন্ন বিভাগে কর্মসংস্থান করে। বিনামূল্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং প্রসাদের ব্যবস্থা করে থাকে।[৬০]

University:

ইসকনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে University প্রতিষ্ঠার কথা রয়েছে।[৬১]

বাংলাদেশঃ

বাংলাদেশে ইসকনের কার্যক্রম বর্তমানে ব্যাপক। প্রতিটি জেলায় ইসকনের মন্দির বা শাখা রয়েছে। ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ১২০টির মতো মন্দির রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চট্টগ্রামের ইসকন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ মন্দির। এছাড়া যশোরের অভয়নগরে রূপ-সনাতন স্মৃতি তীর্থ, ঢাকার সাভারে, স্বামীবাগে, সিলেটের যুগলটীলা সহ প্রভৃতি স্থানে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করে চৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

আকাশ মার্গে ভাগবত কথাঃ

ইসকনের এটি ব্যয়বহুল প্রচার কার্যক্রম। বিমানে বসে ভাগবত শিক্ষার সেমিনার সত্যই আকর্ষণীয়। ২০১৯ সালের ২৭ শে মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন শ্রীল ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ। যাত্রাপথ হচ্ছে- দ্বারকা, সোমনাথ, বিন্দুসরোবর, আমেদাবাদ পর্যন্ত।

ইসকনের সামগ্রিক প্রচারঃ

বিশ্বের মধ্যে এতবড় ধর্মীয় কোন প্রতিষ্ঠান নেই। আন্তর্জাতিকভাবে ইসকনের অবস্থান অনেক শীর্ষে। কেননা বিশ্বের মহান রাষ্ট্রনেতারা এই সংঘের কার্যক্রম বিষয়ে সম্যক অবগত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটেন, ভারতসহ প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা ইসকনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করে থাকেন। সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল ও আদর্শ ভিত্তিক সংগঠন হওয়ার কারণে ইসকন দিন দিন হিমালয়ের আকার ধারণ করছে। ইসকনের আদর্শ ও নীতি এবং দর্শনই হচ্ছে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা। চৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রচারে ইসকন বদ্ধপরিকর। একারণে শ্রীল প্রভুপাদ ইসকন প্রতিষ্ঠা করে নিজে সমগ্র বিশ্বে চৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করেছেন। তাই পরিশেষে বলতে পারি সমগ্র বিশ্বে চৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রচারে ইসকনের অবদান সর্বশ্রেষ্ঠ। ইতিহাস সাক্ষী হবে। চৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রচারে ইসকনের বিকল্প কিছু নেই।

তথ্য নির্দেশ :

১. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*,ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ২১১-২১৫

২. শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত*, রাজেন্দ্র লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃ. ২৫৭

৩. ডা. শম্ভুনাথ দাসাধিকারী সঙ্কলিত *কতিপয় গৌড়ীয় মহাজনের সংক্ষিপ্ত জীবনী*, মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ, নদীয়া, ২য় সংস্করণ, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১২, পৃ. ১২৬

৪. শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, *শ্রীগোদ্রুম কল্পাটবী*, ভিক্টোরি ফ্লাগ পাবলিকেশনস্, মায়াপুর, ইসকন, নদীয়া, ২য় সংস্করণ, ১৬ই এপ্রিল, ২০১৯, পৃ. ৬

৪ ক) শ্রীমৎ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন সংকলিত *শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর*, মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ, নদীয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৮ মে, ২০১৯, পৃ. ২২-২৩

৫. ডা. শম্ভুনাথ দাসাধিকারী সঙ্কলিত *কতিপয় গৌড়ীয় মহাজনের সংক্ষিপ্ত জীবনী*, পৃ. ১২৮

৬. রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় সঙ্কলিত *চিত্রে নবদ্বীপ*, মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, নদীয়া, ৯ম সংস্করণ, ৪মে, ২০১৫,

পৃ. ২৫-২৬
৭. ডা. শম্ভুনাথ দাসাধিকারী সঙ্কলিত *কতিপয় গৌড়ীয় মহাজনের সংক্ষিপ্ত জীবনী*, পৃ. ১৩৪-১৩৯
৭ ক) ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীভক্তিজীবন হরিজন মহারাজ, *শ্রীশ্রী গৌর-পার্ষদ-চরিতাবলী*, গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ৭৪৯
৮. শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রণীত *শ্রীগৌড়ীয় মঠ*, মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, নদীয়া, ১ম সংস্করণ, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ৭-৮, ২২-২৩, ৪০
৯. শ্রীমৎ সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী মহারাজ, *প্রভুপাদ*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, ৯ম সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ক-ড
১০. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*,ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মুম্বাই, ভারত, ১৫তম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৬, পৃ. ড
১১. শ্রীমৎ সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী মহারাজ, *প্রভুপাদ*, পৃ. ট
১২. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*, পৃ. ড
১৩. শ্রীমৎ সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী মহারাজ, *প্রভুপাদ*, পৃ. ভ
১৪. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*, পৃ. ড-ট
১৫. শ্রীমৎ সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী মহারাজ, *প্রভুপাদ*, পৃ. স-ড়
১৬. শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত*, পৃ. ২৫৭
১৭. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*, পৃ. ঢ-ন
১৮. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*,ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০২, পৃ. প্রকাশনা পাতা
১৯. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*, জুলাই, ২০১৬, পৃ. ৭৫৯-৭৬২
২০. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*, পৃ. ঢ
২১. শ্রীমৎ সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী মহারাজ, *প্রভুপাদ*, পৃ. ৫২-৫৩
২২. শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ, *করুণা-সিন্ধু*, বেদ ফাউণ্ডেশন, প্রভুপাদ মার্গ, উজ্জৈইন, মধ্যপ্রদেশ, ১ম সংস্করণ-২০১৭, পৃ. ১৫৮
২৩. শ্রীমৎ সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী মহারাজ, *প্রভুপাদ*, পৃ. ২০৯-২১০
২৪. ঐ, পৃ. ৩২৮
২৫. ঐ, পৃ. ৩৯৪
২৬. ড. কিম নট, 'দি ফাইনাল অর্ডার'-এর বাংলা সংস্করণ, *চূড়ান্ত নির্দেশ*, রিলিজিয়াস স্টাডিজ, লিটস বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭, পৃ. ৯২-৯৩
২৭. ঐ, পৃ. ১০৬
২৮. শ্রীমৎ সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী মহারাজ, *প্রভুপাদ*, পৃ. ৩৯৪
২৯. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*, ১৫ তম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৬, পৃ. ঢ
৩০. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ৮২২
৩১. CENTERS AROUND THE WORLD, Published by Life Patron Membership Dept., ISKCON, Lotus Building, 2nd Floor, Room No-202, Mayapur, Nadia, India.
৩২. শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ, *করুণা-সিন্ধু* ঐ, পৃ. ১৩৮-১৪২
৩৩. ঐ, পৃ. ১৫৫
৩৪. শ্রী শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী, *আমি কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হলাম*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, ৩য় সংস্করণ, ২০১১, পৃ. ২২
৩৫. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০২, পৃ. প্রকাশনা পাতা
৩৬. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*, জুলাই, ২০১৬, পৃ. প্রকাশনা পাতা
৩৭. শ্রীমৎ সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী মহারাজ, *প্রভুপাদ*, পৃ. প্রকাশনা পাতা
৩৮. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, দ্বাদশ সংস্করণ, ২০১৬, অন্ত্যলীলা, পৃ. ২২০-২২১
৩৯. ঐ, আদিলীলা, পৃ. ৫৩৮
৪০. শ্রীমৎ সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী মহারাজ, *প্রভুপাদ*, পৃ. ২৪০-২৪৩
৪১. ঐ, পৃ. ২৫৪-২৫৫
৪২. ঐ, পৃ. ২৮৫-২৮৬

৪৩. ঐ, পৃ. ৩১০
৪৪. শ্রীগৌর চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, *শ্রীমায়াপুর ও নবদ্বীপমণ্ডল গাইড*, প্রকাশক, নামহট্ট, ইসকন, মায়াপুর, ১ম সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ১-৭
৪৫. *The official Donors' Guidebook* ,মায়াপুর সেবা অফিস, শ্রীল ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ, ইসকন, মায়াপুর, নদীয়া-২০১২
৪৬. ঐ
৪৭. শ্রী সনাতন গোপাল দাস, *শ্রীমায়াপুর দর্শন*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, ইসকন, নদীয়া, ৫ম সংস্করণ-২০১৩, পৃ. ৪৯-৫০
৪৮. *Pillars of Dovotion,* TOVP Seba Office, মায়াপুর, ইসকন, নদীয়া
৪৯. আনন্দবর্ধন দাস, *জীবনের প্রস্তুতি*, (SAFE) ইসকন, স্বামীবাগ, ঢাকা, পুনঃপ্রকাশ। পৃ. ১৩
৫০. শ্রীগৌর চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, *শ্রীমায়াপুর ও নবদ্বীপমণ্ডল গাইড*, পৃ. ২৩
৫১. শ্রী সীতাপতি গোঁসাই দাস সংকলিত *তীর্থ সঙ্গী*, শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী সম্পাদিত, স্বামীবাগ আশ্রম, ইসকন, ঢাকা, পৃ. ২৪-২৫
৫২. শ্রীগৌর চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, *শ্রীমায়াপুর ও নবদ্বীপমণ্ডল গাইড*, পৃ. ২০
৫৩. শ্রীল এ. সি ভক্তিবেদান্ত স্বামীর শিষ্য ও প্রশিষ্য কর্তৃক সংগৃহীত *ভক্তসঙ্গে তীর্থ দর্শন*, প্রকাশক শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, ৩য় সংস্করণ, ২০১৫, পৃ. ১১-১৩
৫৪. ঐ, পৃ. ৩-৫
৫৫. শ্রী সীতাপতি গোঁসাই দাস, *তীর্থ সঙ্গী*, পৃ. ২১-২২
৫৬. শ্রী পতিত উদ্ধারণ গৌর দাস ব্রহ্মচারী সংকলিত ও সম্পাদিত *গৌরমণ্ডল পরিক্রমা*, হরেকৃষ্ণ পাবলিকেশনস্, স্বামীবাগ আশ্রম, ঢাকা, পৃ. ৪০
৫৭. ঐ, পৃ. ৫৯-৬০
৫৮. ঐ, পৃ. ৬৮-৬৯
৫৯. *The official Donors' Guidebook,* মায়াপুর সেবা অফিস
৬০. ঐ
৬১. শ্রী সনাতন গোপাল দাস, *শ্রীমায়াপুর দর্শন*, পৃ. ৫০

উপসংহার

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করে মহান পণ্ডিত হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিদ্যার গর্ব জলাঞ্জলি দিয়ে মানবকল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। চৈতন্যদেব প্রেম ধর্মের প্রাণপুরুষ ছিলেন। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন। তিনি তাঁর প্রেমভক্তির বন্যায় জগতের মানুষকে প্লাবিত করেছেন। ভক্তি আন্দোলনের তিনিই পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার। তিনি আপামর জনগণের মধ্যে প্রেমভক্তি বিতরণের জন্য নিরুপাধি করুণাকারী চৈতন্যদেবরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি পরমহংস অমল জ্ঞানের শিক্ষক। চৈতন্যদেবের অপ্রাকৃত শিক্ষায় নিরুপাধিক জীবনের কর্মাবরণে কোন প্রশক্তি নেই। কিন্তু সুনির্মল শ্রদ্ধা জীবাত্মার সেবাবৃত্তির উন্মেষের কথা রয়েছে। নিজে প্রেমভক্তিধর্মের আচরণ করে জগৎ ও জীবকে আদর্শ শিক্ষা দান করে জগতের আচার্য অভিধায় অভিহিত হয়েছেন। চৈতন্যদেব বিনয়ে, ভক্তিতে, বৈরাগ্যে, পাণ্ডিত্যে, জীব সেবায়, আদর্শে ও নিষ্ঠায় অতুলনীয় ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত দর্শনের নাম হচ্ছে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন।' তাত্ত্বিক দিক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ' বলা হয়ে থাকে। ভেদাভেদের কারণ হচ্ছে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যেমন ভেদ রয়েছে তেমনি অভেদও রয়েছে। যেমন– অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ। অগ্নি থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি তেমনি ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম থেকে জীবের উদ্ভব হয়েছে। জীব পরব্রহ্মের অংশ, তাই অভেদ। অপরদিকে অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ শক্তি ও পরিমাণের দিক থেকে এক নয়। তদ্রূপ ব্রহ্মের শক্তি এবং জীবের শক্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ কারণে ভেদ হয়েছে। তাই একই সঙ্গে দুই বিপরীতমুখী ধর্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ একত্র রয়েছে, যার স্বরূপটি যুক্তি ও তর্কের এবং বিচারের বোধগম্য নয় বিধায় একে অচিন্তনীয় বলা হয়েছে। এ জন্যে শ্রীচৈতন্যদেবের এ দর্শনের নাম 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ।' তাঁর দর্শন অনুযায়ী পরম ব্রহ্ম বা কৃষ্ণ প্রাপ্তির একমাত্র পথ হচ্ছে ভক্তি। কেননা ভক্তির দ্বারা অপ্রাকৃত প্রেম লাভ করা যায় এবং প্রেমের মাধ্যমে তাঁর দর্শনও পাওয়া যায়।

চৈতন্যদেবের স্বরচিত *শিক্ষাষ্টকে* তাঁর জীবন ও দর্শনের সারগর্ভ হিসেবে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। চৈতন্যদেবের দর্শনের মূল ভিত্তি হচ্ছে বেদান্ত দর্শন এবং ভাষ্য গ্রন্থ হিসেবে *শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ*। চৈতন্যদেবের দার্শনিক শিক্ষা বিষয়ে সনাতন গোস্বামী *বৃহদ্ভাগবতামৃতম্* এবং রূপগোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ও *উজ্জ্বলনীলমণি* রচনা করেছেন। জীবগোস্বামী চৈতন্যদেবের দর্শনের উপর *ষট্সন্দর্ভ* প্রণয়ন করেছেন। এছাড়া তাঁর জীবন ও দর্শনের সারাৎসার গ্রন্থ হিসেবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী *চৈতন্যচরিতামৃত* রচনা করেছেন। তাঁর দর্শন অনুযায়ী পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে কৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। *ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে– ' এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' এছাড়া *ব্রহ্মসংহিতার* পঞ্চম অধ্যায়ের ১নং শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে– 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দো বিগ্রহঃ।' তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে কৃষ্ণের রূপ হচ্ছে সচ্চিদানন্দময়। তাই তাঁর দর্শন মতে উপাস্য হচ্ছেন দ্বিভুজ মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

চৈতন্যদেবের দর্শন অনুযায়ী পঞ্চরসের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনা করলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী Lord Caitanya His Life and Teachings গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন– 'We have tried to explain the science of devotional service in our book. The Necter of Devotion, based on the authority of Bhakti-rasāmṛta-sindhu by Śrīla-Rūpa Gosvāmī.

Transcendental devotional service has five stages of reciprocation:

1. The self realization stage just after liberation from meterial bondage is called the śantā, or neutral stage.

2. After that, when there is development of transcendental knowledge of the Lords internal opulences, the devotee engages himself in the dāsya stage.

3. By further development of the dāsya stage, a respectful fraternity with the Lord develops, and above that a feelings of friendship on equel terms becomes manifest, Both these stages are called, sākhya stage, or devotional service in friendship.

4. Above this is the stage of parental affection toward the Lord, and this is called vātsalya stage.

5. And above this is the stage of conjugal love, and this stage is called the highest stage of love of God. Although there is no difference in quality in any of the above stages. The last stage of conjugal love of God is called the mādhurya stage.'

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন দর্শন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি জগদুদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে তা পালন করেছিলেন। চৈতন্যদেবের ত্যাগের মহিমায় তাঁর ব্যবহারিক জীবন ও আদর্শ অত্যন্ত সরল এবং সাদাসিধে ছিল। তাঁর আদর্শের মধ্যে ছিল– ভদ্রতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিনয়, নম্রতা, অহিংসা, ক্ষমা, দয়া, বৈষম্যহীনতা, মহানুভবতা, জীবসেবা প্রভৃতি গুণ ও বৈশিষ্ট্য। দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সর্বজীবে সাম্য দর্শন। প্রতিটি জীবকে সেবা করা উচিত। সকল জীবের প্রতি মমত্ববোধ, সেবাপরায়ণতা, মনুষ্যত্বের মর্যাদা, পরোপকার, অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অপরের দুঃখ দূর করার চেতনা হৃদয়ে ধারণ করা উচিত। তিনি এই সকল আদর্শ ও নীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। কলিযুগের মানুষের মুক্তির বিষয়ে তিনি বলেছেন– একমাত্র নাম সংকীর্তনে জীবের মুক্তি হবে। এছাড়া অন্য কোন পথ নাই। যথা–

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণ

তিনি ধর্মান্ধ মধ্যযুগের মানুষের মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সমাজের মানুষের নিকট ত্রাণকর্তা রূপে ছিলেন। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে– তিনি নিষ্পেষিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত, পতিত, অবহেলিত হিন্দু ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ পুনর্গঠক ছিলেন।

সমগ্র জীবনে তিনি বাহ্যিক বিষয়ের পরিবর্তে অন্তর বিষয়ে শিক্ষার গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি শিক্ষাষ্টকের ১নং শ্লোকে বলেছেন– 'চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং।' অর্থাৎ– চিত্তরূপ দর্পণকে তিনি মার্জনা করতে বলেছেন। তাঁর শিক্ষার সারমর্ম হচ্ছে 'হরে কৃষ্ণ' এই দিব্য নাম সর্বদা জপ করলে হৃদয় শুদ্ধ হবে। তবেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যাবে এবং তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যভাগবতে* পাই–

"প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ ॥
ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥"

তিনি সকল প্রকার বিধিনিষেধ উঠিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, একমাত্র ঈশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণের মাধ্যমেই জগতের পরম কল্যাণ এবং পরম প্রাপ্তি ঘটবে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে বাংলার সামাজিক অবস্থা ছিল ভয়াবহ। ব্রাহ্মণ্যবাদের নির্যাতনে ও অত্যাচারে সমাজের নিম্ন বর্ণের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অনন্যোপায় হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। পতিত, চণ্ডাল, অস্পৃশ্যদের সমাজে কোনো প্রকারের অধিকার ছিলনা। ব্রাহ্মণ সমাজ ছিল উচ্চ শ্রেণির মানুষ। এই ব্রাহ্মণ্যবাদের জাতাকলের মধ্যে সমাজের মানুষ পিষ্ট হয়েছিল। চৈতন্যদেবের আর্বিভাব ছিল এইরূপ ধর্মান্ধযুগে। বর্বরতা, দুর্নীতি, হিংস্রতায় সমাজ তখন জর্জরিত হয়েছিল। জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণ বৈষম্যের বিষবাষ্পের কারণে সমাজে অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। মানবতা হয়েছিল বিপন্ন। চৈতন্যদেব সমাজের এই সকল বীভৎস্য দৃশ্য দর্শন করে তাঁর হৃদয় গভীর বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। তাই তিনি সমাজে পতিত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, অধিকার বঞ্চিত, সমাজচ্যুত, জাতিচ্যুত, চণ্ডাল-অস্পৃশ্যসহ নিম্ন বর্ণের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মুক্তির জন্য এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পার্ষদদের নিয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আন্দোলন সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি এইরূপ আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ থেকে জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্য দূর করে সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফলে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মুক্তির জন্য প্রাণের উচ্ছ্বাসে তাঁর প্রচারিত শান্তিময় প্রেমধর্মের পতাকাতলে সামিল হয়েছিল। এইভাবে চৈতন্যদেব তাঁর প্রেমভক্তি আন্দোলনের দ্বারা সমাজ সংস্কার করে সমাজের কল্যাণ সাধন করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন– 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।'

জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে এটি তাঁর কালজয়ী বাণী। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন– আমার ধর্মের মধ্যে জাত-পাতের কোন স্থান নেই। প্রতিটি মানুষের সসম্মানে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। সবাই পরম স্রষ্টার সন্তান। সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই চৈতন্যদেব সমাজ সংস্কার করে মানবকল্যাণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে *চৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে–

নিচ-জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত–হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥

তিনি ছাড়া সমাজে পতিত, অস্পৃশ্য, চণ্ডালদের মুক্তির জন্য এরূপ কথা কেউ বলেননি। তাঁর প্রেমভক্তি ধর্ম ছিল জাত-পাত বিচারের বিরোধী। তাঁর মতে চণ্ডাল ও অস্পৃশ্যরাও মানুষ। চৈতন্যদেবের এই প্রেমভক্তি আন্দোলন তৎকালীন সমাজের বহু লোক সমর্থন করেছিল এবং তারাও চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মে আসতে পেরেছিল। তিনি সমাজ থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদের কুসংস্কার দূর করার জন্য সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। চৈতন্যদেবের মানবমুক্তির আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষ সামিল হয়েছিল। চৈতন্যদেব সর্বজীবের কল্যাণের জন্য এবং আর্তের সেবা করার জন্য হরিনামকে মূল মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে সবাইকে পথ দেখিয়েছিলেন। ফলে জাত বর্ণের ভেদাভেদ ঘুচে গেল। চৈতন্যদেবের এরূপ আন্দোলনের ফলে নবদ্বীপ জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। তিনি শুধু প্রেমধর্মের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, বাঙালি জাতির ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরোক্ষ নিয়ন্ত্রকও ছিলেন।

তিনি নারী জাতির অধিকার এবং তাদের শিক্ষার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবী, অদ্বৈত পত্নী সীতা দেবী, শ্রীবাসের পত্নী মালিনী দেবী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী প্রভৃতি নারীরা ধর্ম গুরু হয়ে সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের গুরুত্ব ও অবদান অপরিসীম। তিনি ইসলাম ধর্মসহ অন্যান্য ধর্মকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। সাম্প্রদায়িকতা ও দলাদলি প্রগতির ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে তিনি মনে করতেন। চৈতন্যদেব সাম্যের নীতিতে ও উদারতার দ্বারা সমাজ সংস্কার করে নব মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চৈতন্যদেব সমাজ থেকে বর্বর ও নিষ্ঠুর জাতবর্ণ স্পর্শের ভেদাভেদ দূর করে সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ করেছেন। তিনি তাঁর ভক্তিপ্রেমধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য মন্দির নির্মাণ, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থ প্রচারের জন্য সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং বাংলায় প্রচারের জন্য নিত্যানন্দকে উড়িষ্যা থেকে প্রেরণ করেছিলেন। চৈতন্যদেবের যোগ্য নেতৃত্বে বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার হয়েছিল এবং বৈষ্ণব ধর্মের দর্শন, সাহিত্য, অলংকার, স্মৃতিগ্রন্থসহ প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল এবং তা প্রচারিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের এরূপ সমাজসংস্কার, সমাজকল্যাণ ও মানবতাবাদের কারণে বিশ্বের বহু মনীষী তাঁর ভূয়শী প্রশংসা করেছেন।

চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের ভিত্তি হচ্ছে মানবতাবাদ। তিনি বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির মুক্তির জন্য তাঁর দর্শন, শিক্ষা, আদর্শ ও প্রেমভক্তি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রচার করেছেন। তিনি মানব মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন এবং সমগ্র জীবন কঠোর সংগ্রাম করেছেন। এই বিশ্বজনীন চেতনা ও মুক্তির বাণী প্রচার হচ্ছে চৈতন্যদেবের মানবতাবাদ। চৈতন্যদেবের চেতনা ছিল সর্ব জীবে সাম্য দর্শন। চৈতন্যদেবের উদাত্ত আহ্বানে জাত-পাতের বিচার ভুলে প্রেমের টানে ধনী-দরিদ্র, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেই একত্রিত হয়েছিল। মানব ধর্ম ও সাম্যনীতির দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল।

চৈতন্যদেব একজন মানবতাবাদী দার্শনিক ও প্রেমিক ছিলেন। যবনরাও তাঁর সংস্পর্শে এসে শ্রেষ্ঠ প্রেমী ভক্তে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং সমাজে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের এই প্রেমধর্মরূপ মানবতাবাদ সকল ধর্ম ও মতবাদের ঊর্ধ্বে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সাম্যের মহামিলন ভূমিতে একত্রিত করেছিলেন। চৈতন্যদেব বৈষ্ণব আন্দোলনের মাধ্যমে মানবপ্রেমের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন । এজন্য মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের এ ভক্তি ও মুক্তির আন্দোলনকে রেনেসাঁস অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি ধর্মের যে সরল ও উদার নীতি, আচার ব্যবহার, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিনয় ধর্মী ভাব, নিষ্ঠা, মর্যাদাবোধ প্রভৃতি বাংলার হিন্দু-মুসলিম সমাজের উপর এর প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়েছিল। হিন্দু-মুসলিম সমাজের মানুষের চিত্তে অবচেতন মনে সঞ্চারিত হয়েছিল বৈষ্ণব ধর্মের প্রীতিকামিতা, সহিষ্ণুতা, ব্যক্তি মানুষের মর্যাদা, সংবেদনশীলতা, অভিন্নতাবোধ প্রভৃতি।

চৈতন্যদেবের মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে মহাপাপী ও দুর্দান্ত অত্যাচারী জগাই-মাধাইকে করুণা প্রদানের মাধ্যমে উদ্ধার করা। এছাড়া কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে বাসুদেব ব্রাহ্মণ সমাজ ও পরিবার থেকে পরিত্যক্ত হলে চৈতন্যদেব তাঁকে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্ত করে মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত চাপাল- গোপালের মুক্তির পথও প্রদর্শন করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের নারোজী ও ভীলপন্থী নামে দুই দস্যুকে উদ্ধার করে মানবতার প্রকাশ করেছেন। সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নামে দুই বেশ্যা চৈতন্যদেবের চরিত্র হননের চেষ্টা করলেও বরং তিনি এই দুই বেশ্যার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে করুণা করে উদ্ধার করেছেন। এছাড়া তিনি বহু মানুষকে পাপপঙ্কিল জীবন থেকে মুক্ত করে আলোর পথ দেখিয়েছিলেন।

চৈতন্যদেব শুদ্ধ-অশুদ্ধ ও পাপ-পুণ্যের বিচার না করে সবাইকে প্রেম দান করেছেন। জগৎ কল্যাণে চৈতন্যদেবের এই মহানুভবতা ও মহাবদান্যতা হচ্ছে মানবতাবাদ। তাই চৈতন্যদেবের জীবন দর্শন পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, চৈতন্যদেব জগৎ কল্যাণে দয়া ও প্রেমের মহাসাগর ছিলেন। তিনি জগৎ কল্যাণে শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী হয়ে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে সমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন। এটিই চৈতন্যদেবের সাম্যবাদ নীতি ও মানবতা।

চৈতন্যদেব প্রতিটি জীবের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করতেন। তাই জীবকে সম্মান ও ভালবাসতে হবে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা যাবে। তাই তিনি অর্থ-বিত্ত, জাতি-বর্ণ-বৈষম্যপূর্ণ কণ্টকাকীর্ণ সমাজ সংসারের

মধ্যে সকলকে আপন করে নিয়ে মনের মাধুরী দিয়ে বুকে টেনেছেন। তিনি প্রীতিধর্মে সাম্যবোধ সমাজে প্রদর্শন করেছেন। তাঁর এই সাম্যবাদ আদর্শের কারণে প্রতিটি মানুষ স্ব-স্ব মর্যাদার স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই যে চৈতন্যদেবের মানব জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তা সমগ্র বিশ্বে মানবতার ইতিহাসে কেউ কখনো করেননি। তাই চৈতন্যদেবের মানবতা ও উদারতার মহিমা তাঁর আদর্শ ও নীতির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

চৈতন্যদেবের মানবতাবাদের ক্ষেত্রে মৌলিক দর্শন হচ্ছে 'জীবে দয়া'। এই সরল নীতির মধ্যে মনুষ্যত্বের ও মানবতার গভীর অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মানুষের সামাজিক মর্যাদাবোধ, প্রাণের মূল্য ও মনুষ্যত্বের মহিমা। প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে বন্ধন তৈরি হয়। চৈতন্যদেব এই বাণীর প্রমূর্ত বিগ্রহ ছিলেন। চৈতন্যদেবের এই চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে নিম্ন জাতি-বর্ণের চেতনাসম্পন্ন বাঙালি হয়েছিল বিবেকবান, হৃদয়বান ও প্রীতিপ্রবণ। জীবের প্রতি প্রেমই হচ্ছে স্রষ্টার সন্তুষ্টির মাধ্যম। তাই স্রষ্টার প্রীতির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম যে জীবে প্রেম, সেটি চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির দ্বারা মানুষের উপলব্ধ হয়েছিল।

চৈতন্যদেবের ভক্তিভাব বিপ্লবের দ্বারা বাঙালির চিত্তে যে উদার মানবিকবোধের উন্মেষ ঘটেছিল, সে বিষয়ে ড. আহমদ শরীফ *সাহিত্যতত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্যে* বলেছেন– 'ষোল শতকের গোড়ার দিকে বাঙলায় নববৈষ্ণবমতের উদ্ভবে যে ভাব-বিপ্লব দেখা দিল, তার প্রভাবে গণমনের সংকীর্ণতা ও ক্রূর সাম্প্রদায়িকতা হ্রাস পেয়েছিল। উদার মানবিকবোধের উন্মেষে বাঙালীর চিত্তলোক প্রসারিত, রুচি বিকশিত এবং সহিষ্ণুতা ব্যাপক হয়েছিল। চৈতন্যোত্তরযুগের মঙ্গলপাঁচালীগুলোর দেবতার ও মানুষের মননে ও আচরণে তা প্রকটিত হয়েছিল।'

চৈতন্যদেবের এই ভক্তিভাব আন্দোলনে মানুষের মূল্যবোধের গুরুত্বের শিক্ষা ও আদর্শ ছিল। চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্মের নীতি ছিল মানবপ্রীতি, মানুষের মর্যাদা, সাম্য, ঈশ্বরপ্রেম, বৈরাগ্য, ক্ষমা, বিনয়, করুণা, মনুষ্যত্বের মহিমা, সকলের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ। এইজন্য তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ প্রাণপুরুষ ও সমাজরক্ষক হতে পেরেছিলেন।

বাঙালীর সমাজ, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং মানবতাবোধ বিকাশে চৈতন্যদেবের অবদান ও তাঁর জীবনকর্মকাল ষোড়শ শতকের বাঙলায় রেনেসাঁস সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ *সাহিত্যতত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্যে* বলেছেন–'বাঙালীর সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও মননের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব-মতের প্রভাব ও প্রেরণা ছিল গভীর ও ব্যাপক। এজন্যে ষোল শতককে বাঙলার রেনেসাঁর যুগ বলা হয়। বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত বিকাশ ও বাঙালীর মানবতাবোধ বৈষ্ণবান্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল। বাঙলা গীতি কবিতায় প্রেমের অনন্য অনুভূতির অনুপম বিকাশ, চরিত সাহিত্য সৃষ্টি, তত্ত্বালোচনার সূত্রপাত, কীর্তনের বিভিন্ন সুরের আবিষ্কার। সর্বোপরি মানুষের মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি- 'জীবে ব্রহ্ম ও নরে নারায়ণ দর্শন' এবং প্রীতিতত্ত্বে দীক্ষা বাঙলাভাষা ও বাঙালীর প্রতি চৈতন্য মতবাদের অমূল্য অবদান।'

চৌদ্দ-পনেরো শতকে নগর ও গ্রামগঞ্জের নিম্নবর্ণের ও নিম্নজাতের শ্রেণি পেশার অগণিত মানুষ যখন ব্রাহ্মণ্যবাদের উগ্র যাতাকলে পিষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছিল, সে সময়ে জাতি ও ধর্মের সংকট মুহূর্তে সমাজের ভাঙ্গন রোধ করার জন্য মানবতার মূর্ত প্রতীক চৈতন্যদেব তাঁর প্রবর্তিত প্রেমবাদ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন।

চৈতন্যদেবের অপার্থিব রূপ ও মোহিনী শক্তির সুরে তাঁর কণ্ঠে কৃষ্ণনাম কীর্তন শ্রবণ করে জ্ঞানী, তপস্বী, পণ্ডিত, মূর্খ, পতিত সকলেই একেবারে প্রেমে গদগদ হয়ে যেত। এ বিষয়ে ড. দীনেশচন্দ্র সেন *বৃহৎবঙ্গে* বলেছেন–'কৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া ভোলা মহেশ্বর অবধি যেরূপ শত শত দেবতারা অজ্ঞান হইয়া পিছনে পিছনে ছুটিয়াছিলেন, পরমা সুন্দরী কোন ষোড়শী রমণী রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইলে যেমন শত শত চক্ষু নির্নিমেষে তাহার প্রতি আবদ্ধ হয়– চৈতন্যের অশ্রুপ্লাবিত দুইটি চক্ষু ও কণ্ঠস্বরের অপার্থিব মোহিনী শক্তি বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য, সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী হইতে আরম্ভ করিয়া আবালবৃদ্ধ নরনারী সকলেরই মন সেইভাবে–রূপ সাগরের পাড়ে টানিয়া লইয়া যাইত। এত বিদ্যাবুদ্ধি, এত পাণ্ডিত্য ও এত ভক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যুগের প্রয়োজন সাধন করিতে পারিয়াছিলেন।'

চৈতন্যদেব অস্ত্র ধারণ করে মানুষকে শিক্ষাদান করেননি। তিনি প্রেমের দ্বারা মানবের আসুরিক প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেছেন। তিনি জাতিভেদরূপ বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন করে প্রেমের দ্বারা জগৎবাসীকে প্রেমবৃক্ষের ছায়াতলে শামিল করেছিলেন। ভারতবর্ষে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গঙ্গার পবিত্র ধারার ন্যায় হরিনাম সংকীর্তন দ্বারা প্রেমের প্লাবন ঘটিয়েছিলেন। সেই প্রেমরূপ প্লাবনে সকলে সমঅধিকারে অবগাহন করে আনন্দ লাভ করেছিল। এটি চৈতন্যদেবের মানবতা ও সাম্যবাদ নীতি।

শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ প্রচারে ইসকনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্কে ইসকন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ইসকন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন, শিক্ষা ও আদর্শ এবং সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বে প্রচার করা। সেই নিমিত্তে তিনি ইংরেজি ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং 'Back to Godhead' ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি এই গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো পঞ্চাশটিরও অধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই ট্রাস্ট মায়াপুর, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলস্, লন্ডন, সিডনী, রোম, হংকং ও প্যারিস-এ আছে।

ইসকন চৈতন্যদেবের শিক্ষা ও আদর্শকে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রচারের উদ্দেশ্যে ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। ইসকনের মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন, দর্শন ও শিক্ষা সম্পর্কিত গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শহরে, নগরে, গ্রামে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচার করা। সমগ্র বিশ্বে চৈতন্যদেবের আদর্শ প্রচার করার জন্য ৬৫০টিরও বেশি মন্দির, আশ্রম ও শাখা-প্রশাখা ইসকনের রয়েছে। বিশ্বে ১৫টিরও অধিক গুরুকুল বিদ্যালয় রয়েছে। ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুল রয়েছে। এছাড়া চৈতন্যদেবের আদর্শ প্রচারে ইসকনের

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম রয়েছে। যেমন– নাম সংকীর্তন, পদযাত্রা, প্যান্ডেল প্রোগ্রাম, সেমিনারের আয়োজন, গৌর পূর্ণিমার উৎসব উদ্‌যাপন, Food for Life, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রসাদ বিতরণ কার্যক্রম, কৃষিখামার, নামহট্ট কার্যক্রমসহ প্রভৃতি কার্যক্রম রয়েছে। এইভাবে ইসকন চৈতন্যদেবের আদর্শ প্রচারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সারা বিশ্বে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে চৈতন্যদেবের আদর্শ প্রচারে ইসকনের ভূমিকা অসামান্য।

ইসকনের সমগ্র বিশ্বের মহাকেন্দ্র হিসেবে পশ্চিম বঙ্গের মায়াপুরে সুবিশাল বৈদিক তাঁরা মণ্ডল মন্দিরের (Temple of the Vedic Planetoriam) নির্মাণ কাজ চলছে। ইসকন মায়াপুরে চৈতন্যদেবের আদর্শ ও শিক্ষা প্রদানের জন্য Mayapur Institute স্থাপন করেছে। এছাড়া বন্যার্তদের সেবাদান, দরিদ্র মানুষের অন্নদান কর্মসূচি, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, দরিদ্রদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য, Bhaktivedanta Academy for Culture and Education (BACE) সহ বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এই সকল বিভাগের সমন্বয়ে ইসকন চৈতন্যদেবের আদর্শ সমগ্র বিশ্বে প্রচার করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ইসকনের অবদান সর্বশ্রেষ্ঠ।

চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিসাধনা ছিল মূলত অন্তর সাধনা। কেননা তিনি অন্তর সাধনার কারণে সর্বদা দিব্যভাবে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করতেন। তিনি তাঁর রচিত *শিক্ষাষ্টকের* ৭ম শ্লোকে বর্ণনা করেছেন– ' শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে।' –এই শ্লোকের শিক্ষা নিজ জীবনে অনুকরণ করে সবাইকে শিক্ষাদান করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, চৈতন্যদেবের জীবনদর্শনের শিক্ষা সমাজের মানুষের মুক্তির আলোকবর্তিকা স্বরূপ। আদর্শে, নীতিতে, চরিত্রে, ত্যাগে, মহানুভবতায়, মনুষ্যত্বের বিকাশে, সমাজ গঠনে ও শান্তি স্থাপনে চৈতন্যদেবের শিক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও শিক্ষাকে জীবনে ধারণ করলে মানবের পরম কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে বিশ্বের মানুষ জড়জাগতিক ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি লাভ করেছে। বলতে গেলে সমগ্র পৃথিবী আজ হাতের মুঠোয়। জীবন যাপনের মান এবং চিন্তা ধারার ক্ষেত্রে মানুষের অনেক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবুও সমাজে প্রতিনিয়ত বর্বরতা, প্রতিহিংসা, নিষ্ঠুরতা, হত্যা, ধর্ষণ, সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি, দলাদলি, নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছালেও মানুষের মনুষ্যত্ব বোধ, আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা, চরিত্র, দয়া, ক্ষমা, করুণা, মহানুভবতা, পরোপকার, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা, বিশ্বাস দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন ও শিক্ষা প্রাসঙ্গিক। সমাজে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় চৈতন্যদেবের শিক্ষা অত্যন্ত অপরিহার্য। একটি সৎ, সুন্দর, আদর্শ ও শিক্ষিত সমাজ বিনির্মাণে চৈতন্যদেবের শিক্ষা ও আদর্শ অবশ্য গ্রহণযোগ্য। সবশেষে প্রত্যাশা যে, সমাজের মানুষ যদি চৈতন্যদেবের শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে জানতে পারে, তাহলে সামাজিক অবক্ষয় রোধে তা সহায়ক হবে এবং মানুষের মধ্যে মানবকল্যাণচেতনা জাগ্রত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, প্রকাশক-শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭ম সংস্করণ, ১৯৮১

২. ড. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদি পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ৮ম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৪২৩

৩. শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসে দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ১ম দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৮

৪. ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, (মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২য় সংস্করণ এবং জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ১ম প্রকাশ, আগস্ট, ২০১২

৫. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, অখণ্ড সংস্করণ, (২য় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১২

৬. ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ,২০১৮

৭. শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, *গৌড়ের ইতিহাস*, সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা মাহবুব সিদ্দিকী, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ১ম দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, মার্চ, ২০১৯

৮. ড. অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, সাহিত্য লোক, কলকাতা, ৫ম সংস্করণ, নভেম্বর, ২০১৮

৯. শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ, *চৈতন্যভাগবত*, শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, মায়াপুর, নদীয়া, ২য় সংস্করণ, ২৩ মার্চ, ২০১৬

১০. ড. সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, কার্তিক, ১৪২৪

১১. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, মোহম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১ম পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল, ১৯৯৫

১২. ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় নৃত্য*, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০১৭

১৩. ড. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, জুন, ২০১৬

১৪. ড. জগদীশনারায়ণ সরকার, *বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক* (মধ্যযুগ), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসৎ, কলকাতা, ৪র্থ মুদ্রণ, জুলাই, ২০১৯

১৫. শ্রীমদ্ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ, *শ্রীচৈতন্যভাগবত*, সংকীর্তন বিভাগ, ইস্কন, মায়াপুর, নদীয়া, ১ম সংস্করণ, ২০০৭

১৬. ড. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৯১/বি

১৭. ড. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ*, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ৫ম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১৮

১৮. অক্ষয় কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়*, ১ম খণ্ড, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ১ম দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৭

১৯. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানি, ঢাকা, সপ্তদশ সংস্করণ,জানুয়ারি, ২০১৭

২০. শ্রীভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৫

২১. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, আগস্ট, ২০১০

২২. অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের বাংলা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০১২

২৩. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ*, প্রকাশক সন্দিপন নাথ, সাধনা প্রকাশনী, কলকাতা, ৩য় প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১১

২৪. ড. বিমান বিহারী মজুমদার, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২য় প্রকাশ, এপ্রিল, ২০১৬

২৫. শ্রীল মুরারিগুপ্তের *শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্*, শ্রীল হরিদাস দাসকৃত, প্রকাশক- শ্রী দেবাশীষ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রকাশকাল ২০০৯

২৬. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা*, প্রকাশক- ভক্তিবেদান্ত বুক স্ট্রাস্ট, মায়াপুর নদীয়া, দ্বাদশ সংস্করণ, ২০১৩

২৭. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *শ্রীচৈত্যন্যচরিতামৃতের ভূমিকা*, প্রকাশক-সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪২২

২৮. ড. রাধাগোবিন্দ নাথ, *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, প্রকাশক-সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪২২

২৯. শ্রী অশোক কুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত *গৌরগণোদ্দেশদীপিকা*, প্রকাশক-স্বদেশ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

৩০. ত্রিদন্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, মায়াপুর, নদীয়া, ২য় সংস্করণ, ১৮ জুলাই, ২০১৫

৩১. শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর গোবিন্দদেব গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, চৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ, ১ম সংস্করণ- ৮ মার্চ, ১৯৯৩

৩২. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *চৈতন্যচরিতামৃত*, প্রকাশক, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, দ্বাদশ সংস্করণ, ২০১৬

৩৩. শ্রীকালীকিশোর বিদ্যারত্ন সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল*, প্রকাশক- বেণীমাধবশীল'স লাইব্রেরী, কলকাতা, জুলাই, ২০১৪

৩৪. শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল*, গৌড়ীর মঠ, বাগবাজার, কলকাতা, ২৮/১২/১৯৯১

৩৫. মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ গ্রন্থিত *শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত*, বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরি, কলকাতা, এপ্রিল-২০১৮, অখণ্ড সংস্করণ

৩৬. ড.হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, প্রকাশক- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন, ২০১১/এ

৩৭. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা*, প্রকাশক-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ- জুন, ২০১১

৩৮. রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি. কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ,আগস্ট ২০১৭

৩৯. পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত *বৃহন্নারদীয়পুরাণ*, নবভারত পাবলিসার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৯৬

৪০. ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, *চৈতন্যচরিতামৃত*, প্রকাশক-দেব সাহিত্য কুটীর, প্রা.লি. কলকাতা, ১৭ই মার্চ, ২০১৭

৪১. শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম*, সংস্কৃত বুক ডিপো. কলকাতা, ১ম প্রকাশ-জানুয়ারি, ২০১৭

৪২. ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, *গৌর-কথা*, তৃতীয় খণ্ড, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন, কলকাতা- রাজ সংস্করণ, ২৬শে জানুয়ারি, ২০১৩

৪৩. স্বামী সারদেশানন্দ সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-১৩ম পুনর্মুদ্রণ, জুলাই, ২০১৬

৪৪. শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী সম্পাদিত *শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ২১ মার্চ, ২০০৮

৪৫. ড. লায়েক আলি খান, *প্রসঙ্গঃ বৈষ্ণব সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১ম দে'জ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৭

৪৬. ড. মালবিকা বিশ্বাস ও ড. ময়না তালুকদার কর্তৃক সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদিত *পরেশ চন্দ্র মণ্ডল রচনা-সংকলন*, অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য গবেষণা কেন্দ্র, সংস্কৃত বিভাগ, ঢা. বি. ১ম প্রকাশ, জুন-২০২১

৪৭. ড. বিধানচন্দ্র বিশ্বাস, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ভারত, ১৩ম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৯

৪৮. শ্রী তারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী, *মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব* (নীলাচল লীলা), শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির, নদীয়া, ১ম প্রকাশ, জন্মাষ্টমী ২০১২

৪৯. শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ সম্পাদিত, *শ্রীশিক্ষাষ্টক*, মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, নদীয়া, ৮ম সংস্করণ, ১২ নভেম্বর ২০১৫

৫০. ড. তাপস বসু সম্পাদিত, *শ্রীচৈতন্য : একালের ভাবনা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪

৫১. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর নদীয়া, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৬

৫২. গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, *বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য*, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা, অরুণা প্রকাশন সংস্করণ, রথযাত্রা, ১৮ জুলাই, ২০১৫

৫৩. ক্ষিতিমোহন সেন, *জাতিভেদ*, প্রকাশক অপর্ণা বসাক, তথাগত, কলকাতা, তথাগত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২১

৫৪. দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার, *বাঙালি হিন্দুর জাত-জগৎ*, একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯

৫৫. ড. নরেশচন্দ্র জানা, *বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৬

৫৬. শ্রীনরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর, *শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর*, শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী সম্পাদিত, গৌড়ীয় মিশন, কলকাতা, ৫ম সংস্করণ, ১২ নভেম্বর, ২০১৫

৫৭. ড. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ৫ম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০২০

৫৮. সুকান্ত পাল ও সুব্রত রায় কর্তৃক সম্পাদিত, *নবজাগরণের প্রথম আলো শ্রীচৈতন্য*, প্রকাশক, কে.মিত্র, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, জুন, ২০১৪

৫৯. আনিসুজ্জামান প্রধান সম্পাদক ও সম্পদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১ম পুনর্মুদ্রণ, জুলাই, ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

৬০. ড. আহমদ শরীফ, *সাহিত্যতত্ত্ব ও বাঙলা সাহিত্য*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ৩য় প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ২০১৯
৬১. শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত*, রাজেন্দ্র লাইব্রেরি, কলকাতা
৬২. ডা. শম্ভুনাথ দাসাধিকারী সঙ্কলিত *কতিপয় গৌড়ীয় মহাজনের সংক্ষিপ্ত জীবনী*, মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ, নদীয়া, ২য় সংস্করণ, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১২
৬৩. শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, *শ্রীগোদ্রুম কল্পাটবী*, ভিক্টোরি ফ্লাগ পাবলিকেশনস্, মায়াপুর, ইসকন, নদীয়া, ২য় সংস্করণ, ১৬ই এপ্রিল, ২০১৯
৬৪. শ্রীমৎ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন সংকলিত *শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর*, মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ, নদীয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৮ মে, ২০১৯
৬৫. রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় সঙ্কলিত *চিত্রে নবদ্বীপ*, মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, নদীয়া, ৯ম সংস্করণ, ৪মে, ২০১৫
৬৬. ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীভক্তিজীবন হরিজন মহারাজ, *শ্রীশ্রী গৌর-পার্ষদ-চরিতাবলী*, গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬
৬৭. শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রণীত *শ্রীগৌড়ীয় মঠ*, মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, নদীয়া, ১ম সংস্করণ, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮
৬৮. শ্রীমৎ সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী মহারাজ, *প্রভুপাদ*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, ৯ম সংস্করণ, ২০১২
৬৯. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ*,ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মুম্বাই, ভারত, ১৫তম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৬
৭০. শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ, *করুণা-সিন্ধু*, বেদ ফাউণ্ডেশন, প্রভুপাদ মার্গ, উজ্জেইন, মধ্যপ্রদেশ, ১ম সংস্করণ-২০১৭
৭১. শ্রী শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী, *আমি কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হলাম*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, ৩য় সংস্করণ, ২০১১
৭২. শ্রীগৌর চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, *শ্রীমায়াপুর ও নবদ্বীপমণ্ডল গাইড*, প্রকাশক, নামহট্ট, ইসকন, মায়াপুর, ১ম সংস্করণ, ২০১০
৭৩. শ্রী সনাতন গোপাল দাস, *শ্রীমায়াপুর দর্শন*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, ইসকন, নদীয়া, ৫ম সংস্করণ-২০১৩,
৭৪. আনন্দবর্ধন দাস, *জীবনের প্রস্তুতি*, (SAFE) ইসকন, স্বামীবাগ, ঢাকা, পুনঃপ্রকাশ
৭৫. শ্রী সীতাপতি গোঁসাই দাস সংকলিত *তীর্থ সঙ্গী*, শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী সম্পাদিত, স্বামীবাগ আশ্রম, ইসকন, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুযারি ২০১৬
৭৬. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামীর শিষ্য ও প্রশিষ্য কর্তৃক সংগৃহীত *ভক্তসঙ্গে তীর্থ দর্শন*, প্রকাশক শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, ৩য় সংস্করণ, ২০১৫
৭৭. শ্রী পতিত উদ্ধারণ গৌর দাস ব্রহ্মচারী সংকলিত ও সম্পাদিত *গৌরমণ্ডল পরিক্রমা*, হরেকৃষ্ণ পাবলিকেশনস্, স্বামীবাগ আশ্রম, ঢাকা।
৭৮. শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, *শ্রীমদ্ভাগবত*, ১ম স্কন্ধ, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মুম্বাই, ভারত, ২০তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০১৯
৭৯. শ্রীমৎ গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজ কর্তৃক সংকলিত *শ্রীচৈতন্যের দয়া*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, নদীয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২
৮০. শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, *শ্রীশ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকং*, শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডেশ্বরী গ্রন্থালয়, মথুরা,ভারত,২য় প্রকাশ, গৌর পূর্ণিমা, ১৪২৫
৮১. শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসতীর্থ স্বামী মহারাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্ চ*, শ্রীচৈতন্য মঠ,মায়াপুর, নদীয়া, ৩য় সংস্করণ, ২রা জুলাই, ১৯৯২
৮২. শ্রীমৎ অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর রচিত *শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৬
৮৩. Dr. Dinesh Chandra Sen, *Chaitanya and his Companions*, Published by Aruna Prakashan, kolkata, 1st Aruna Prakashan edition, October 2011
৮৪. *SRI CAITANYA-CARITAMRTA* with the original Bengali text, roman transliteration, English equivalents, translation and elaborate purports by HIS DIVINE GRACE A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Published by Narmada Goswami for The Bhaktivedanta Book Trust, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai 400049 and Printed at Rekha Printers Pvt. Ltd. New Delhi-110020, First Printing in India, June 1998.

৮৫. *TEACHINGS OF LORD CAITANYA,* Edited by A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Published by Bhima Dasa for The Bhaktivedanta Book Trust, Mumbai and Printed at Repro India Limited, MIDC Industrial Area, Mahape, Navi Mumbai 400709, Fourth Printing, January 2006.

৮৬. A. C. Bhaktivedanta Swami, *Lord Caitanya: His life and Teachings,* published and printed by The Bhaktivedanta Book Trust, Hare krishna land, Juhu, Mumbai, 400049, India, 3rd Printings, August-2011

অভিধান

৮৭. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলক), *সংসদ বাংলা অভিধান*, দেবজ্যোতি দত্ত, কলকাতা, চতুর্বিংশতিতম মুদ্রণ, জুলাই ২০১৭

৮৮. নরেন বিশ্বাস, *বাংলা একাডেমী বাঙলা উচ্চারণ অভিধান*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৯, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৮৯. ড. দুলাল ভৌমিক, *বর্ণান্তর অভিধান*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, জুন ২০১৯

৯০. জামিল চৌধুরী সম্পাদিত *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণের তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮

৯১. শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক সংকলিত *শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১লা বৈশাখ, ১৪২১

৯২. শ্রীঅশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত বাংলা অভিধান*, সদেশ, কলকাতা, ২য় প্রকাশ, ১৪১১

৯৩. অশোক মুখোপাধ্যায়, *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*, দেবজ্যোতি দত্ত, কলকাতা, ৭ম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৯

৯৪. Govindagopala Mukhopadhyaya, *A New TRI-LINGUAL DICTIONARY,* SANSKRIT-BENGALI-ENGLISH Published by PILGRIMS PUBLISHING, Durga Kunda, Varanasi, India, Pilgrims Publishing, Corrected Reprint, 2022